হাদীস শাস্ত্রের
পরিভাষা পরিচিতি

মূলঃ শায়খ ডঃ মাহমুদ তাহহান,
মুহাদ্দীস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ),
শায়খ ওমর ইব্ন মুহাম্মদ বাইকুনি রাহিমাহুল্লাহ্,
শায়খ ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ সহ অন্যান্য।

অনুবাদ ও সংকলনে
সাজ্জাদ সালাদীন

মুখবন্ধ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيم ا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣) [الانعام: ١٥٣]

"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ গুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"।

শুধু তাই নয় আল্লাহ্ (سبحانه وتعالى) পবিত্র কুরআনে আরও বলেছেন, আজ তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে"। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কে জানিয়ে দেন, তিনি রাসূল (صلى الله عليه وسلم) - এর মৃত্যুর পূর্বেই দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে পূর্ণতা দান করার পর দীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ানোর কোন অবকাশ নাই। অথচ আজকাল আমাদের দেশে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিততে যে সকল জাল হাদীস ও ভুল ধারনা এবং যইফ ব্যাখ্যা প্রবেশ করেছে তা দূর করার লক্ষেই অমার এ গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহন করি। অতএব, আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার ভুল ধারনা দূর করে সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়ে উঠুক সেই প্রত্যাশা ও দোয়া কামনা করছি। আল্লাহ তা'আলা সেই দোয়া কুবল কুরন, আমীন।

অধিকন্তু এই গ্রন্থটি প্রণয়নে যেসব বিখ্যাত লেখকদের মূল আরবী এবং কিছু বিখ্যাত প্রখ্যাত আলেমদের অনুবাদকুত লেখা গ্রন্থের সহয়াতা নিয়েছি তা ফুটনোট আকারে গ্রন্থটিতে সংযোজন করেছি। তাছাড়া যেসব দ্বীনি ভাই ও বোন এই গ্রন্থটি প্রণয়নে উৎসাহ ও বিভিন্ন সময়ে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হে আল্লাহ আপনি তাঁদেরকে যাযাকাল্লাহ খায়ের দান করুন, আমীন।

সর্বশেষে আমি মানুষ। ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর একটি হাদীস না উল্লেখ করলেই নয়। তিনি বলেছেনঃ « كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ » 'প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।'[তিরমিযী - ২৪২৩; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ - ৩৫৩৫৭]। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রণয়নে। তারপরেও চোখের অগোচরে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আপনাদের চোখে ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করা হবে। অতএব, এই হাদীসের আলোকে পাঠকবৃন্দকে বলব যে, ছোটখাট ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করি।

সবশেষে সঠিক ইসলাম রক্ষার জন্য ও মুসলিম সমাজের কল্যানের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। হে আল্লাহ আপনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দ্বীনি খেদমতে আরও বেশি বেশি খেদমত করতে পারি তাঁর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ধন্যবাদান্তে,

সাজ্জাদ সালাদীন
ইসলামী গবেষক, লেখক ও দাঈ।

সূচীপত্র

ক্র: নং:	বিষয়বস্তু	পৃঃ নং
০১	প্রারম্ভিকা	
০২	ওহী (أوحى) এবং হাদীস (حَدِيث)	
০৩	ওহী নাযিল হওয়ার ধরন	
০৪	ওহীর প্রকারভেদ	
০৫	কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য	
০৬	কুরআন মজীদ	
০৭	কুরআনের উৎপত্তি	
০৮	পবিত্র কুরআনের সংজ্ঞা	
০৯	শুধু কুরআনের উপর আমল করা অসম্ভব	
১০	হাদীসের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআনের দলিল	
১১	কুরআনের বিধান ব্যাখ্যাকারী হাদীসের উদাহরণ	
১২	হাদীসের প্রামাণিকতার পক্ষে হাদীসের দলিল	
১৩	হাদীস অস্বীকার করার কতক অজুহাত	
১৪	হাদীস (حَدِيث)	
১৫	হাদীস (حَدِيث) ও সুন্নাহ (السـنة)	
১৬	হাদীস (حَدِيث) সংরক্ষণ ও বর্ণনা করার ফযীলত	
১৭	হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক মানদন্ড	

১৮	হাদীসের প্রকারভেদ	
১৯	হাদীস (حَدِيث) শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	
২০	সাহাবী (صَحَابِىٌّ)	
২১	তাবিয়ীন (تَابِعِيْنَ)	
২২	তাবে’ তাবিয়ীন (تَابِعِيْنَ تَابِعُ)	
২৩	রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ)	
২৪	রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ) বিল মা’না	
২৫	রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ) বিল লবজিহি	
২৬	মুনকার ও রিওয়ায়েত	
২৭	রাবী (رَاوِىْ)	
২৮	আসমাউর রিজাল (الرجـال اسـماء)	
২৯	দিরায়াত	
৩০	মরবী আনহু	
৩১	সনদ (سَنَدٌ)	
৩২	সনদ (سَنَدٌ) ও মতন (مَتْنٌ)	
৩৩	রিজাল	
৩৪	আসমাউর রিজাল (الرجـال اسـماء)	

৩৫	আদল বা আদিল	
৩৬	আদালত	
৩৭	যবত (ضَبْطٌ) ও যাবিত (ضَابِطٌ)	
৩৮	সিক্বাহ্ (ثِقَةٌ)	
৩৯	আসহাবে সুফফা	
৪০	মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ)	
৪১	শায়খ (شَيْخٌ)	
৪২	হাফিয (حـــافظ)	
৪৩	হুজ্জাত (حجة)	
৪৪	হাকিম (حـاكم)	
৪৫	শায়খাইন (شَيْخَيْنِ)	
৪৬	সিহাহ্ সিত্তা (سِتَّةٌ صِحَّاحٌ)/ কুতুবে সিত্তা	
৪৭	সিহাহ সিত্তা (سِتَّةٌ صِحَّاحٌ) বলা কতদূর সঠিক?	
৪৮	সহীহাইন	
৪৯	সুনানে আরবায়া	
৫০	মুত্তাফাকুন্ আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)	
৫১	সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে	

৫২	হাদীসের কিতাবের বিভাগ	
৫৩	জামে (جَامِعٌ)	
৫৪	সুনান বা মুসান্নাফ	
৫৫	মুসনাদ (مُسْنَدٌ)	
৫৬	মু'জাম (مُعْجَمٌ)	
৫৭	রিসালা (رِسَالَةٌ)	
৫৮	হাদীসের কিতাবের স্তর	
৫৯	খবর (خَبَرٌ)	
৬০	সুন্নাহ (السـنة)	
৬১	হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ	
৬২	রিওয়ায়েত বা সনদ অনুসারে হাদীস -এর প্রকারভেদ	
৬৩	মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِر)	
৬৪	আহাদ (اَحَادٌ)	
৬৫	বিভিন্ন প্রকার হাদীস	
৬৬	মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ)	
৬৭	মুনকাতে (مُنْقَطِعٌ)	
৬৮	মুদাল্লাস (مُدَلَّسٌ)	

৬৯	মুদ্বতারাব	
৭০	মুদরাজ (مُدْرَجٌ)	
৭১	মুসনাদ (مُسْنَدٌ)	
৭২	মাহফুয ও শায	
৭৩	মা'রূফ ও মুনকার	
৭৪	মুয়াল্লাল	
৭৫	মুতাবি ও শাহিদ	
৭৬	রাবীদের যোগ্যতা অনুসারে হাদীসের শ্রেণীবিভাগ	
৭৭	সহীহ হাদীস (حديث صحيح)	
৭৮	হাসান ((حسن)	
৭৯	যঈফ (ضعيف)	
৮০	মাউযু (موضوع) হাদীস বা বানোয়াট বা জাল হাদীস	
৮১	যঈফ ও জাল হাদীসের সূত্রপাত	
৮২	যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি	
৮৩	হাদীস জাল করার কারন ও উদ্দেশ্য	
৮৪	ইতিহাসের কিছু বিখ্যাত হাদীস জালকারী	
৮৫	জাল হাদীসের লক্ষণ	

৮৬	কয়েকটি মাওযু হাদীস বা জাল হাদীসের উদাহরন	
৮৭	'মাউজু' (موضوع) বা হাদীস জাল করনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা	
৮৮	যঈফ ও জাল হাদীস এবং মুসলিম সমাজে তার কুপ্রভাব	
৮৯	'মাউজু' বা জাল হাদীসের প্রকারভেদ	
৯০	'ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে –এ সংক্রান্ত সংশয় নিরসন	
৯১	যঈফ (ضعيف) হাদীস আমল করা প্রসঙ্গে	
৯২	যঈফ (ضعيف) হাদীসের উপর আমল কি গ্রহণযোগ্য?	
৯৩	সহীহ হাদীস বনাম যঈফ হাদীস	
৯৪	হাদীসে কুদসী (الحديث القُدسي)	
৯৫	কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য	
৯৬	হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নব্বীর পার্থক্য	
৯৭	হাদীসে কুদসীর উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ	
৯৮	হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন	
৯৯	সাহাবীদের পর থেকে হাদীস গ্রন্থায়িত হওয়া পর্যন্ত সময়ে হাদীস গ্রহনে আলেমদের সাবধানতা	
১০০	উপসংহার	
১০১	পরিশিষ্ট – ১ – সহায়ক গ্রন্থসমূহের তালিকা	

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিকা

إِنَّ الْحَمْدُ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, যে দ্বীনে মানুষের পক্ষ থেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হয় না। সালাত ও সালাম তাঁরই রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহর দ্বীনের রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছেন, কোথাও কোন কার্পণ্য করেননি। দ্বীন হিসাবে যা কিছু এসেছে তিনি তা উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, যারা ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর আদর্শ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ পালনে সকলের চেয়ে অগ্রগামী। ইসলামী জীবন বিধান তত্ত্ব ও তথ্যগতভাবে দুটো মৌলিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি হচ্ছে

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। অপরটি হচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস। পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছে ইসলামের মূল কাঠামো আর রাসূলের হাদীস সেই কাঠামোর উপর গড়ে তুলেছে একটি পূর্নাঙ্গ ইমারত। তাই ইসলামী শরিয়াতে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। প্রকৃতপক্ষে হাদীস হচ্ছে কুরআনেরই ব্যাখ্যাস্বরুপ। এজন্য ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসের গুরুত্বও অনাস্বীকার্য। অতএব, একজন মুসলিমের বিশ্বাস হল- "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বার্তাবাহক (রাসূল)।

সুতরাং বার্তাবাহককে বিশ্বাস করা মানে প্রেরিত বার্তাকে বিশ্বাস করা। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব বার্তা নিয়ে এসেছেন তা দু ধরণের- এক ধরণের বার্তা জিব্রাইল (আঃ) পড়ে শুনাতেন; তা হল কুরআন। আর এক ধরনের বার্তা পড়ে শুনানো হত না; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে বের হত; তা হল হাদীস। কেননা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ তথা হাদীস ইসলামের জ্ঞানের দ্বিতীয় মূল উৎস। হাদীস না থাকলে ইসলামের অনেক বিষয় সঠিকভাবে যেমন বুঝা যেত না তেমনই অনেক মূল আমলও সঠিক ভাবে করা যেত না। হাদীসের ব্যাপারে ‘সহীহ হাদীস কথাটি শোনে নাই এমন মুসলমান পৃথিবীতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে সহীহ হাদীস বলতে প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে কী বুঝানো হয়েছে, এ কথাটি সঠিকভাবে

জানে এমন মুসলমানের সংখ্যাও ভীষণ কম। আর ‘সহীহ হাদীসের প্রচলিত অর্থটি অধিকাংশ মুসলমানের জানা না থাকার কারণে মুসলমান জাতির যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। সহীহ হাদীস বলতে প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে কী বুঝায় বিষয়টি সঠিকভাবে না জানা পর্যন্ত, আমি নিজেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি বলে আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তাই হাদীস সম্বন্ধে মানব মনে সংশয় সৃষ্টি করা নয় বরং হাদীসের ভাণ্ডার থেকে ভুল হাদীস বাদ দিয়ে নির্ভুল হাদীস গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ও হাদীস যাচাইয়ের সহজ পন্থা উপস্থাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতে জাতির ব্যাপক কল্যাণ করাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও শ্বাশত জীবন বিধান। এতে মানব কল্যাণের যাবতীয় দিক বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের মূল উৎস হল আল্লাহর 'ওহী' তথা পবিত্র কোরআন ও হাদীস। আল্লাহ তায়ালা নিজেই যিক্‌র তথা ওহী-কে হেফাযত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, "আমিই উপদেশ (সম্বলিত কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।" (সূরা আল হিজর, আয়াত ৯)। এই ঘোষণা পূর্বেকার কোন আসমানী কিতাব সম্পর্কে তিনি দেননি। ফলে সেগুলির কোন অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই। অনেকের ধারণা 'যিক্‌র' বলে আল্লাহ কেবল কোরআনের

হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীসের নেননি। একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অনত্র বলেন, "(আজ) তোমার কাছেও কিতাব নাযিল করেছি, যাতে করে যে (শিক্ষা) মানুষদের জন্যে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তুমি তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো, যেন তারা (নিজেরাও একটু) চিন্তা ভাবনা করে"[1]। আর কোরআনের ব্যাখ্যাই হল হাদীস। যা রসূল (সাঃ) নিজ ইচ্ছা মোতাবেক বলতেন না, যতক্ষণ না তাঁর কাছে 'ওহী' নাযিল হত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

"আর তিনি মনগড়া কথা বলে না।"

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়[2]।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "জেনে রেখ! আমি কোরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু"[3]। সে বস্তুটি নিঃসন্দেহে 'হাদীস', যার অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার

---

[1] সূরা আন নাহল, আয়াত ৪৪

[2] সূরা নাজম ৫৩, আয়াত নং - ৩-৪

[3] আবূ দাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩

হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে"[4]। হযরত হাস্সান বিন আতিয়্যাহ বলেন, "জিব্রাইল (আঃ) সুন্নাহ (হাদীসের অপর নাম) নিয়েও নবীজির কাছে অবতরণ করতেন যেভাবে তিনি কুরআন নিয়ে অবতরণ করতেন।" সুতরাং সুন্নাহর প্রতি সকল মুসলিমের ঈমান আনা অপরিহার্য।" ইসলামের শত্রুরা অতি প্রাচীন কাল থেকে ইসলামী জ্ঞানের প্রধান দুটি উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত করার জন্য যুগে যুগে অনেক প্রয়াশ চালিয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টায় তারা কখনো সফল হয়নি। যখনি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ইসলামী জ্ঞানের বাহক আলেম সমাজ সত্যকে মুসলমানদের সামনে দিবালোকের মত নিটোল সচ্ছভাবে তুলে ধরেছেন এবং বাতিল সব মত ও পথ থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। তাদের সেসব লেখনীকে পুঁজি করে তাদের অনুসরণে হাদীসের মর্যাদা এবং হাদীসশাস্ত্রের গ্রন্থায়ন, সংকলন ও হাদীস সংকলনে আলেমদের সতর্কতার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ প্রবন্ধে তুলে ধরছি যেন সাধারণ মুসলিমরা এ ধরণের বিপজ্জনক ও গোমরাহীর পথ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেন।

[4] সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৬৫

ওহী (أوحى) এবং হাদীস (حَدِيث)

আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী, ওহী বা প্রত্যাদেশ (revelation) প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যেসব বিষয় জানতে পারেনা বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা সে সকল বিষয় ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এছাড়া মানুষ বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে যে সকল বিষয় ভাল বা মন্দ বলে বুঝতে পারে সে সকল বিষয়েও ভাল-মন্দের পর্যায়, গুরুত্ব, পালনের উপায় ইত্যাদি তিনি ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের সংরক্ষণ ও তার অনুসরণ ব্যতীত মানব জাতি ও মানব সভ্যতার সংরক্ষণ সম্ভব নয়। স্বার্থের সংঘাত, হানাহানি ও স্বার্থপরতা দূর করে প্রকৃত ভালবাসা, সেবা ও মানবীয় মূল্যবোধগুলির বিকাশ করতে ওহীর জ্ঞানের উপরই নির্ভর করতে হবে। বিশ্বাস, সততা, পাপ, পূণ্য, স্রষ্টা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে ওহীর বাইরে মানবীয় বিবেক, অভিজ্ঞতা বা গবেষণার আলোকে যা কিছু বলা হয় সবই বিতর্ক, সংঘাত ও বিভক্তি বৃদ্ধি করে। কারণ এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সত্য কখনোই ওহী ছাড়া মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জানা যায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা

করলে আমরা দেখতে পাই যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বিকৃতি বা বিলুপ্তির কারণেই বিভিন্ন জাতি বিভ্রান্ত হয়েছে।

মূলতঃ কুরআন হাদীসের বর্ণনা ও বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ দুটিঃ

১. অবহেলা, মুখস্ত না রাখা বা অসংরক্ষণের ফলে ওহীলব্ধ জ্ঞান বা গ্রন্থ হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

২. মানবীয় কথাকে ওহীর নামে চালানো বা ওহীর সাথে মানবীয় কথা বা জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো[5]।

প্রথম পর্যায়ে ওহীর জ্ঞান একেবারে হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহী নামে কিছু জ্ঞান সংরক্ষিত থাকে, যার মধ্যে মানবীয় জ্ঞান ভিত্তিক কথাও সংরক্ষিত থাকে। কোন কথাটি ওহী বা কোন কথাটি মানবীয় তা জানার বা পৃথক করার কোনো উপায় থাকেনা। ফলে 'ওহী' নামে সংরক্ষিত গ্রন্থ বা জ্ঞান মূল্যহীন হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী অধিকাংশ জাতি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ওহীর জ্ঞানকে বিকৃত করেছে। ইহুদী, খ্রীস্টান ও অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীদের নিকট

---

[5] ডঃ খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ ১১-১৫

‘ধর্মগ্রন্থ’, Divine Scripture ইত্যাদি নামে কিছু গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। যেগুলির মধ্যে অগণিত মানবীয় কথা, বর্ণনা ও মতামত সংমিশ্রিত রয়েছে। ওহী ও মানবীয় কথাকে পৃথক করার কোনো পথ নেই এবং সেগুলো থেকে ওহীর শিক্ষা নির্ভেজালভাবে উদ্ধার করার কোনো পথ নেই। ‘ওহী’ (أوحى) অর্থ ইশারা করা, কিছু লিখে পাঠানো, কোন কথা সহ লোক পাঠানো, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কোন লোককে কিছু জানিয়ে দেয়া[6]। ওহী প্রসঙ্গে শায়খ আবুদুল্লাহ শারকাভী বলেছেন- ‘ওহী’ অর্থ জানাইয়া দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় ওহী হল- ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নবীগণকে কোন বিষয় বলে দেয়া বা ফেরেশতা পাঠান কিংবা স্বপ্ন যোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে জানিয়ে দেয়া। এই শব্দটি ‘আদেশ দান’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়[7]।

ওহী (أوحى) নাযিল হওয়ার ধরন

রাসুলে করীম (সঃ) এর নিকট বিভিন্ন ভাবে ওহী নাযিল হত। ওহী নাযিল হওয়ার ধরনগুলো নিম্নরূপ আলোচনা করা হলোঃ-

১। **সত্য স্বপ্নঃ** নবুয়ত লাভের প্রথম পর্যায়ে নবী করীম (সঃ) স্বপ্ন দেখতে পেতেন এবং তার এ স্বপ্ন বাস্তবে হুবহু মিলে যেতো। এই

---

[6] হাদীসের পরিচয়, যিলহজ আলী, সুহৃদ প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং – ২৫

[7] হাদীস সংকলনের ইতিহাস - মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং - ৫১

স্বপ্নগুলো ছিল অত্যন্ত ভালো। এখানে সহীহুল বুখারীর হাদীসটি উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ. قَالَ " مَا أَنَا بِقَارِئٍ ". قَالَ " فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} ". فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ " زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ". فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ " لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ". فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ ـ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ـ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا

تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ ". قَالَ نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ.

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (রহঃ) .... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা' গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ---- এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রাঃ) - র কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ "আমি বললাম, 'আমি পড়িনা'। তিনি বলেনঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে

বললেন, ‘পড়ুন’। আমি বললামঃ আমিতো পড়ি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ ‘পড়ুন’। আমি জবাব দিলাম, ‘আমিতো পাড়ি না’ – রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন। তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, “পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন আর আপনার রব্ মহামহিমান্বিত।” (৯৬: ১-৩)। তারপর এ আয়াত নিয়ে ররাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা এর কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।’ তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম, কখখনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কখখনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন ‘আবদুল আসাদ ইব্ন ‘আবদুল ‘উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ‘ঈসায়’ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি

ইবরানী ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্‌র তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ্ মূসা (আঃ) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ তাঁরা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে[8]।

২। **দিল বা মনের পটে উদ্রেক হওয়াঃ** রাসূল (সাঃ) এ সম্মন্ধে বলেছেন-"জিবরাঈল ফেরেশতা আমার মনের পটে এই কথা ফুঁকে

[8] সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ৩

দিলেন যে নির্দিষ্ট রিযিক পূর্ণ রূপে গ্রহণ করার ও নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালপূর্ণ হওয়ার আগে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"[9]।

৩। ঘন্টা ধ্বনির মত শব্দে ওহী নাযিল হওয়াঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ـ رضى الله عنه ـ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ـ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ ـ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ". قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রহঃ)........ 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলে। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি

---

[9] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মওলানা আব্দুর রহীম, পৃঃ ৫০

প্রচন্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত। (তথ্যসূত্রঃ সহীহুল বুখারী, ১ম খন্ড, অধ্যায় ১, হাদীস নং ২, ওহীর সূচনা অধ্যায়)[10]।

৪। **ব্যক্তি বেশেঃ** এ প্রসংগে রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "কখনও ফেরেশতা কোন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে আমার নিকট আসেন, তিনি আমার সাথে কথা বলেন এবং যা বলেন তা আমি ঠিকভাবে আয়ত্ত করে নেই"[11]। সুতরাং, ব্যক্তি বেশে জিবরাঈল (আঃ) বেশির ভাগ সময় হযরত দাহিয়া কালবী নামক সাহাবীর রূপ ধরে আসতেন। ফেরেশতা কেন দাহিয়া কালবীর রূপ ধারণ করতেন এর কারণ বলতে গিয়ে আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী লিখেছেন-"অন্যান্য সাহাবীদের পরিবর্তে বিশেষভাবে দাহিয়া কালবীর রূপ ধারণ করে ফেরেশতার আগমন করার কারণ এই যে, তিনিই সে সময়ের লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন"[12]। হাদীসে জিবরাঈল এর শ্রেষ্ঠতম উদাহরন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ

---

[10] সহীহুল বুখারী, ১ম খন্ড, অধ্যায় ১, হাদীস নং ২, ওহীর সূচনা অধ্যায়

[11] সহীহুল বুখারী, ১ম খন্ড, ১ম পৃঃ

[12] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং – ৫৪।

قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ " . ثُمَّ تَلاَ صلى الله عليه وسلم { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} " . قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ " . فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ "

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের মজলিসে হাজির হলেন। তার পরনের পোশাক ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তার মধ্যে সফরের কোন আলামত দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতেও পারছিল না। তিনি এসেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে

বসলেন এবং নিজের দুই হাটু তাঁর দুই হাটুর সাথে মিলিয়ে এবং তাঁর দুই হাত নিজের দুই উরুর উপর রেখে বললেনঃ "হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "ইসলাম হচ্ছে তুমি সাক্ষ্য দেবে যে,আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমজান মাসের সাওম পালন করবে এবং হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে।" আগন্তক বললেনঃ "আপনি ঠিক বলেছেন।"

(উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) তাঁর এ আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম, তিনি নবীর কাছে প্রশ্ন করছেন আবার তাঁর জবাব তিনি নিজেই সত্যায়ন করছেন। আগন্তুক ব্যক্তিটি আবার বললেনঃ "আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "ইমান হল আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি তোমার বিশ্বাস স্থাপন করা।" আগন্তক বললেন, "আপনি সত্যই বলেছেন।" আগন্তক ব্যক্তিটি আবার বললেনঃ "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাকে নাও দেখতে পাও তবে মনে কর যে তিনি

তোমাকে দেখছেন।" আগন্তক আবার বললেনঃ "আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি জানেন না।" আগন্তক বললেনঃ "তাহলে আমাকে এর আলামত সম্পর্কে বলুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "ক্রীতদাসীরা তাদের মনিবকে প্রসব করবে এবং তুমি খালি পা ও নগ্নদেহ গরীব মেষ রাখালদেরকে সুউচ্চ দালান কোঠা নির্মাণ করতে দেখবে এবং তা নিয়ে গর্ব করতে দেখবে।" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ "অতপর আগন্তক চলে গেলেন এবং আমি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে কাটালাম।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ "হে উমর! তুমি কি জান, প্রশ্নকারী কে"? আমি বললামঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল-ই অধিক জানেন।" তিনি বললেনঃ "তিনি ছিলেন জিবরাঈল, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন"[13]।

৫। **জিবরাঈল (আঃ) এর নিজস্ব আকৃতিতেঃ** এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন- ‘‘আমি পথ চলছিলাম হঠাৎ উর্ধ্বদিক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম সেই ফেরেশতা যিনি ইতোপূর্বে হেরার গুহায় আমার নিকট এসেছিলেম, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে

[13] কিতাবুল ঈমান অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ১ :: হাদীস ৪

একটি আসনে উপবিষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সূরা মুদাসসির নাযিল করেন।” হাদীসটি নিম্নরূপঃ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ ـ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ، فَقَالَ ـ فِي حَدِيثِهِ " بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا، مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ} إِلَى قَوْلِهِ {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} فَحَمِيَ الْوَحْىُ وَتَتَابَعَ ". تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ. وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ " بَوَادِرُهُ ".

ইব্‌ন শিহাব (রাঃ) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আনসারী (রাঃ) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, ‘আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।’ তারপর আল্লাহ্‌ তা’আলা নাযিল করলেন, “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।”

(৭৪: ১-৪) এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রহঃ) ও আবূ সালেহ্ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইব্ন রাদ্দাদ (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬। পর্দার অন্তরালঃ পর্দার অন্তরাল থেকে রাসূলে করীম (সঃ) এর সাথে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কথা বলা এবং ওহী নাযিল করা- এই প্রকার ওহী নাযিলের ব্যাপারে কোন মধ্যস্থতাকারী অর্থাৎ ফেরেশতার দরকার হয় না। আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তাঁর রাসূলকে পর্দার অন্তরাল থেকে ওহী নাযিল করেন। এ প্রসংগে পবিত্র কোরআন এ বলা হয়েছে- "আল্লাহ কোন লোকের সাথে কথা বলেন না, তবে তিনি ওহী নাযিল করেন কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে কথা বলেন।" (সুরা আশশুরা, ৫১)। সুতরাং, ওহী সম্মন্ধে আলোচনা করার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আসলে হাদীসও কি ওহী? এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম তার হাদীস সংকলনের ইতিহাসের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- "আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবীর প্রতি যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। আল্লাহ প্রেরিত ওহী প্রধানত দুই প্রকারের- প্রথম প্রকারের ওহীকে বলে ওহীয়ে মাতলু - সাধারণ পঠিতব্য ওহী, যাকে ওহীয়ে জ্বলীও বলে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ওহীকে 'ওহীয়ে গায়রে মাতলু' বলে। এটা সাধারণত তেলাওয়াত করা হয় না। যার অপর নাম 'ওহীয়ে খফ'

প্রচ্ছন্ন ওহী। যা হতে জ্ঞান লাভ করার সুত্র এবং এ সুত্রে লব্ধ জ্ঞান উভয়ই বুঝানো হয়।” আমরা জানি কোরআনের পরই হাদীসের স্থান।আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন- “হে নবী ! আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই আয়াতে উল্লেখিত আল-কিতাব অর্থ কোরআন মজীদ এবং হিকমত অর্থ সুন্নাত বা হাদীসে রাসূল (এবং এ উভয় জিনিসই আল্লহর নিকট হতে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ”)। এখন নিশ্চয়ই বুঝা গেল হাদীসও এক প্রকার ওহী।

ওহী’র প্রকারভেদ

বস্তুতঃ আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর নিকট যে ওহী পাঠাতেন তা ছিল দু প্রকারের। প্রথম প্রকার ওহী কুরআন, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো শব্দ ও অর্থসহ আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করতেন, সাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন। দ্বিতীয় প্রকার ওহীর মূল অর্থ, ‘জ্ঞান’ বা ‘প্রজ্ঞা’ আল্লাহ তাঁর উপর নাযিল করতেন। তিনি নিজের ভাষায় তা সাহাবীদেরকে বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন এবং কখনো কখনো লিখাতেন। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রকার ওহীকে ‘কিতাব’ বা গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে ‘হিকমাহ’ বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল।"[14]।

সুতরাং, এই পুস্তক বা কিতাব হলো কুরআন করীম, যা হুবহু ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। আর হিকমাহ বা প্রজ্ঞা হলো ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান যা হাদীস নামে সংকলিত হয়েছে। কাজেই ইসলামে ওহী দুই প্রকারঃ কুরআন ও হাদীস। ইসলামের এই দুই মূল উৎসকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানকে হুবহু নির্ভেজালভাবে সংরক্ষণের জন্য একদিকে কুরআন ও হাদীসকে হুবহু শাব্দিকভাবে মুখস্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনো কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে[15]। যেসব কথা আল্লাহ ও তাঁর

---

[14] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৬৪ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা বাকারা: ১২৯, ১৫১, ২৩১ আয়াত; সূরা নিসা: ১১৩ আয়াত; সূরা আহযাব ৩৪ আয়াত; সূরা জুমুআহ ২ আয়াত

[15] হাদীসের নামে জালিয়াতি - ডঃ আব্দুল্লাহ খন্দকার জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং – ১৯

রাসূলের নামে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত নয় সেসব কথা বলা বা প্রচার করা বা হাদীস নামে চালিয়ে দেয়া মানেই রাসূলের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করা আর এর পরিণাম জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَكْذِبُوا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

আলী ইবনুল জা'দ (রহঃ) ... 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বলেছেনঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে[16]

কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য

আল কুরআনের উৎস যেমন আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত ওহী তেমনি হাদীসের উৎস ওহীয়ে ইলাহী। যেমনঃ আল্লাহ বলেনঃ

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

---

[16] ইলম বা জ্ঞান অধ্যায় :: সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদীস ১০৮

আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করেছেন[17]। এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর তরফ থেকে অবতারিত কিতাব ও হিকমত কি? তার ব্যাখ্যার বিশিষ্ট তাবিয়ী হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, কিতাব হচ্ছে আল কুরআন এবং হিকমত হলো আস্ সুন্নাহ বা হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও বলেনঃ তোমরা জেনে রাখ, আমাকে কুরআনের সাথে এর মত আরেকটি বিষয়ও দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ, দারিমী, ইবনে মাজাহ্)।

প্রখ্যাত তাবিয়ী হাসান ইবনে আতিয়াহ বলেন, জিবরাঈল (আঃ) সুন্নাহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এরূপ অবতীর্ণ হতেন যেমন তিনি কুরআন নিয়ে তাঁর উপর নাযিল হতেন। এ প্রসঙ্গে আরও একজন প্রখ্যাত বিদ্বান হাফেয ইবনে কাসীর বলেছেনঃ সুন্নাহ্ তাঁর উপরে এরূপ নাযিল হত যেমন কুরআন নাযিল হত। কিন্তু হাদীস (জিবরাঈল মারফত) তিলাওয়াত করা হত না যেমন কুরআন তেলওয়াত করা হত। এ সমস্ত বর্ননা প্রমান করে কুরআনের উৎস যেমন আল্লাহর ওহী তেমনি হাদীসে-রাসূলের উৎস ওহীয়ে ইলাহী[18]। সুতরাং, কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহীর উৎস হতে উৎসারিত হলেও এতদুভয়ের মধ্যে নানা দিক দিয়া পার্থক্য

---

[17] সূরা নিসা, আয়াত – ১১৩

[18] রাহে আমাল – আল্লামা জলীল আহসান নদভী (রহঃ), অনুবাদ – প্রফেসর ডঃ এ, বি, এম সিদ্দিকুর রহমান, পৃষ্ঠা নং – ৩৫ – ৩৬।

বিদ্যমান। এর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

কুরআন মজীদ এক অপূর্ব মু'জিযা। এটি কেবল শব্দ, ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়েই মু'জিযা নয়; এর বিষয়বস্তু, আলোচন্য বিষয়ের ব্যাপকতা, প্রসারতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা এবং এর উপস্থাপিত মানব কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাও এক অপূর্ব ও চরম বিস্ময়কর মু'জিযা। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে কুরআন মজীদ, এটির অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কুরআন মজীদ কালজয়ী, সর্বপ্রকার পরিবর্তণ, পরিবর্ধন ও সংশোধন-সংযোজন হতে চিরসুরক্ষিত এবং বিনা অযুত তা স্পর্শ ও পাঠ করা হারাম। নামাযে এটি সুনির্দিষ্টভাবে পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু হাদীসসমূহ কুরআনের ন্যায় কোন মু'জিযা নয় বরং হাদীসের মূল কথাটিই শুধ ওহীর মাধ্যমে হযরতের স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়পটে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিজ ভাষায় তা জনসমক্ষে পেশ করেছন। এজন্য এর ভাষা' মতলু' নয়; হাদীসের ভাষা ও শব্দের তিলাওয়ারত করা বাধ্যতামূল নয় বরং এর মূল বক্তব্য ও ভাবধারা অনুসরণ করার জন্যই শরীয়াতে নির্দেশ দান করা হয়েছে। এই কারণেই এটিকে 'ওহীয়ে গায়ের মতলু' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু কুরআন মজীদের ভাব-শব্দ সব কিছুই আল্লাহর, আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। তাই এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী

লিখেছেন, “ওহীয়ে ‘মতলূ’ হচ্ছে কুরআন মজীদ। অপর প্রকার ওহী রাসূলে করীম (সাঃ) হচ্ছে (বর্ণনাকারীদের সূত্রে) বর্ণিত। ৩আল্লামা মুহাম্মদুরল মাদানী লিখেছেন, “কুরআন হাদীসের পারস্পরিক কার্থক্য ছয়টি দিক দিয়া বিবেচ্য। প্রথম, কুরআন অলৌকি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মু’জিযা’ হাদীস তা নয়।

দ্বিতীয়, কুরআন পাঠ না হলে নামায বিশুদ্ধ হয় না, হাদীস সেরূপ নয়।

তৃতীয়, কুরআন ও এর সামান্য অংশও কেউ অস্বীকার করলে সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যায়, কিন্তু বিশেষ কারণের ভিত্তিতে বিশেষ কোন হাদীস মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে কাফির হতে হয় না।

চুতর্থ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের মাঝখানে জিব্রাঈরের মধ্যস্থতা, অপরিহার্য; হাদীসের জন্য এটি জরুরী নয়।

পঞ্চম, কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও কথা আল্লাহর নিজস্ব, হাদীসের শব্দ ও ভায়া রাসূলের নিজের এবং

ষষ্ঠ, কুরআন অযু ও পবিত্রতার সাথে স্পর্শ করা কর্তব্য, বিনা অযুতে স্পর্শ করা যায় না। হাদীস সম্পর্কে এরূপ কোন নির্দেশ নেই। অন্য কথায় চিঠি ও মৌখিক পয়গামের মধ্যে যে পার্থক্য, কুরআন ও হাদীসের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বলা যায়।

লোক মারফত মৌখিক পয়গম প্রেরণের ক্ষেত্রে মূল কথাটিই মুখ্য, ভাষা বা শব্দের তারতম্যে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু চিঠির ব্যাপারটি এরূপ নয়।

প্রথমত এটি চিঠি প্রেরকের নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী রচিত হয় এবং দ্বিতীয়ত এটিতে নিজ মত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণ ভাব প্রকাশক ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু মৌখিক কথা প্রেরণ শব্দ ও ভাষার সেই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

কুরআন ও হাদীরেস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যদিও এইরূপ পার্থক্য রয়েছে- কুরআনকে মনে করা যায় আল্লাহর নিজ লিখিত চিঠি আর হাদীস হচ্ছে আল্লাহর মৌখিক পয়গাম; কিন্তু সেই সেঙ্গ এই কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহরর এই ‘চিঠি’ ও ‘মৌখিক পয়গাম’ উভয়েরই মুখপাত্র হচ্ছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

এই কারণে তাঁর নিকট হতে আল্লাহর লিখিত চিঠি (কুরআন) গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৌখিক পয়গাম (হাদীস) - ও জেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক। আল্লাহর প্রেরিত এই দুটি জিনিসই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি গ্রহণ করলে মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হতে বাধ্য। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি যখন কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমাদের নিকট এর কুরআন সমর্থিত হওয়ারই সংবাদ প্রকাশ

করি। ইবনে যুবায়র বলেছেনঃ আমার নিকট যে হাদীসই পৌঁছেছে আমি আল্লাহর কিতাবে এর সমর্থন ও এটির সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি। শরীয়াতের ইমামগণের সর্বসম্মত মত হলঃ সমগ্র সুন্নাত ও হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা[19]।

যাই হোক, কুরআন মাজীদ ও হাদীস সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ-

কুরআন মাজীদঃ (আরবী: القرآن আল্-কুর্'আন্) ইসলামী ইতিহাস অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড অংশে এটি ইসলামের নবী মুহাম্মাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। আয়াত বা পঙক্তি সংখ্যা ৬,২৩৬ টি। এটি মূল আরবী ভাষায় অবর্তীর্ণ হয়। মুসলিম চিন্তাধারা অনুসারে কুরআন ধারাবাহিকভাবে অবর্তীর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং গ্রন্থ অবতরণের এই ধারা ইসলামের প্রথম বাণীবাহক আদম থেকে শুরু হয়। কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যার সাথে বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মীয়গ্রন্থের বেশ মিল রয়েছে, অবশ্য অমিলও কম নয়। তবে কুরআনে কোনও ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা নেই।

---

[19] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী।

ইসলামী ভাষ্যমতে কুরআন অপরিবর্তনীয় এবং এ সম্পর্কে মুসলিমরা কুরআনের যে আয়াতের কথা উল্লেখ করে থাকে তা হলঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“আমি সয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক”[20]।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এই বাণী, যার বাহককে তোমরা পাগল বলছো, আমিই তা অবতীর্ণ করেছি, তিনি নিজে তা তৈরী করেননি। তাই এ গালি তাঁকে দেয়া হয়নি বরং আমাকে দেয়া হয়েছে। আর তোমরা যে এ বাণীর কিছু ক্ষতি করতে পারবে তা ভেবো না। এটি সরাসরি আমার হেফাজতে রয়েছে। তোমাদের চেষ্টায় একে বিলুপ্ত করা যাবে না। তোমরা একে ধামাচাপা দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। তোমাদের আপত্তি ও নিন্দাবাদের ফলে এর মর্যাদাও কমে যাবে না। তোমরা ঠেকাতে চাইলেও এর দাওয়াতকে ঠেকাতে পারবে না। একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগও তোমরা কেউ কোনদিন পাবে না[21]।

---

[20] সূরা হিজর, আয়াত নং – ৯

[21] সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমূল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা

কুরআনের উৎপত্তি

আরবী ব্যাকরণে কুরআন শব্দটি মাসদার তথা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি قرأ ক্বরা'আ ক্রিয়া পদ থেকে এসেছে যার অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। এই ক্রিয়াপদটিকেই কুরআন নামের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়[22]। এই শব্দটির মিটার বা "মাসদার" (الوزن) হচ্ছে غفران তথা "গুফরান"। এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত ভাব, অধ্যবসায় বা কর্ম সম্পাদনার মধ্যে একাগ্রতা।

উদাহরণস্বরুপ, غفر নামক ক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে "ক্ষমা করা"; কিন্তু এর আরেকটি মাসদার রয়েছে যার যা হলো غفران, এই মাসদারটি মূল অর্থের সাথে একত্রিত করলে দাঁড়ায় ক্ষমা করার কর্মে বিশেষ একাগ্রতা বা অতি তৎপর বা অতিরিক্ত ভাব। সেদিক থেকে কুরআন অর্থ কেবল পাঠ করা বা আবৃত্তি করা নয় বরং আরেকটি অর্থ হচ্ছে একাগ্র ভঙ্গীতে পাঠ বা আবৃত্তি করা।

কুরআনের মধ্যেও এই অর্থেই কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের সূরা আল-কিয়ামাহ্ (৭৫ নং সূরা) ১৮ নং আয়াতে এই শব্দটি উল্লেখিত আছেঃ

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

---

[22] BYU Studies, vol. 40, number 4, 2001. Page 52

অতঃপর, আমি যখন তা পাঠ করি (ক্বুরা'নাহু), তখন আপনি সেই পাঠের (কুরআ'নাহ্) অনুসরণ করুন[23]। অবশ্য এ নিয়ে সংশয় রয়েছে যে, এই শব্দটি আসলেই আরবি ভাষার মূল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে নাকি সিরিয়াক থেকে এসেছে। এই সংশয়টি প্রথম উত্থাপন করেন জার্মান সেমিটিক বিশেষজ্ঞ থিওডর নোলদেকে। তিনি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে Geschichte des Qorâns (কুরআনের ইতিহাস) নামীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে আরবী কুরআন শব্দটি সিরিয়াক ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ্য পদ ܩܪܝܢܐqeryānâ (কেরিয়ানা) থেকে এসে থাকতে পারে। সিরিয়াক ভাষার এই শব্দটি আবার সিরিয়াক ক্রিয়াপদ ܩܪܐ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা[24]। নোলদেকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে - "পাঠ কর" -এর মতো একটি ক্রিয়াপদ প্রাক-সেমিটীয় হতে পারে না, আমরা ধারণা করতে পারি শব্দটি আরবিতে প্রবেশ করেছে, খুব সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের কোনো ভাষা থেকে... যেহেতু সিরিয়াক ভাষায় קרא নামক ক্রিয়া এবং "কেরিয়ানা" নামীয় একটি বিশেষ্যও রয়েছে যার অর্থ ἀνάγνωσις (পাঠ করা) এবং ἀνάγνωσμα (ভাষণ) উভয়টিই হতে পারে, এবং উপর্যুক্ত সকল

---

[23] সূরা আল-কিয়ামাহ্ (৭৫ নং সূরা) ১৮ নং আয়াত

[24] Payne Smith, Jessie (Ed.) (1903). *A compendious Syriac dictionary founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith*. Oxford University Press, reprinted in 1998 by Eisenbraums. ISBN 1-57506-032-9. Page 516, 519

ধারণার কারণেই এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যে, কুরআন আরবি ভাষার নিজসৃষ্ট কোনো শব্দ নয় যার অর্থ একই রকম হতে পারে, বরং এটি সিরিয়াক ভাষা থেকে ধার করা শব্দ হতে পারে যা ful'ān ধরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকবে[25]। এ সম্পর্কে সবচেয়ে আধুনিক মতগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রিস্টোফ লুক্সেনবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত মত[26]। লুক্সেনবার্গের মতে কুরআন প্রকৃতপক্ষে একটি সিরিয়াক লেকশনারী ছিলো।

পবিত্র কুরআনের সংজ্ঞা

মুসলমানদের মতে এটি আল্লাহর বানী বা বক্তব্য, যা ইসলামের নবী ও রাসূল মুহাম্মদের উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। তাদের মতে এটি একটি মু'জিযা বা অলৌকিক গ্রন্থ যা মানব জাতির পথনির্দেশক। মুসলমানদের বিশ্বাস, কুরআনে মানব জীবনের সকল

---

[25] Now read a word such as culture "can not be the Primal Semites, we may assume that it has migrated into Arabia, and qeryānā although probably from the North ... Now the Syrian קרא next to the verb, the noun, in ἀνάγνωσις the double meaning (reading, reading aloud) and ἀνάγνωσμα (reading, reading), it gains in connection with the same Erörteten, the presumption of Wahrscheinlichkkeit that the term non-Arab Qoran is a development from the equivalent infinitives, but a borrowing from that Syria's words at the same time align with the type Fulan. "Noldeke

[26] Christoph Luxenberg (2004) -- *Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache.* Berlin: Verlag Hans Schiler. 20054 ISBN 3-89930-028-9. Page 81-84.

সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং এটি পূর্নাংগ জীবন বিধান[27]। বস্তুতঃ কুরআন কারীম মানব জাতির কাছে প্রেরিত মহান আল্লাহর সর্বশেষ বাণী। এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) - এর বয়স যখন ৪০ বৎসর তখন থেকে আল্লাহ তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে কুরআন প্রেরণ করতে শুরু করেন। পরবর্তী ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মত কুরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ২৩ বৎসরে তা পরিপূর্ণরূপে অবতারিত হয়। আল্লাহর নিকট থেকে প্রধান ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিতেন তা মুখস্থ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য। এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর জীবদ্দশায় পৃথক পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অসংখ্য সাহাবী তা মুখস্থ করে নেন। তাঁর সময় থেকেই তিনি ও সাহাবীগণ সাধারণ সালাতে এবং বিশেষত রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও খতম করতেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ পাঠ করতেন। অনেক সাহাবীই ৩ থেকে ৭ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ একটু বেশি সময় ধরে

[27] আল-ইহকাম, আল-আমিদি

কমবেশি এক মাসের মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাতে কুরআন খতম করতেন। এছাড়া নিজের কাছে সংরক্ষিত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখে দেখে দিবসে ও রাত্রিতে তা পাঠ করা ছিল সাহাবীগণের প্রিয়তম ইবাদত ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি ও আনন্দের কর্ম। এভাবে মূলত মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্থ রেখে ও নিয়মিত রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদে) খতমের মাধ্যমেই কুরআনকে অবিকল আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর ওফাতের পরের বৎসর খলীফা আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সময়ে লিখিত পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে সংকলন করান। পরবর্তীকালে খলীফা উসমান (রাঃ) তাঁর শাসনামলে নতুন মুসলিম প্রজন্মের মানুষদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করণের সুবিধার্থে আবূ বকর (রাঃ) কর্তৃক পুস্তকাকারে সংকলিত কুরআনটির বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। এভাবে সকল মুসলিমের প্রাত্যহিক পাঠের প্রিয়তম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন কারীম পরিপূর্ণ ও অবিকৃতভাবে অগণিত মানুষের হৃদয়পটে এবং পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হয়। যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর উপর অবতারিত হয়েছে আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনিভাবে অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল যুগেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পরিপূর্ণ মুখস্থ করে রেখেছেন। এ কুরআনই মানব

জাতির পথের দিশারী এবং সকল কল্যাণের উৎস। এতে রয়েছে সকল উপদেশ, শিক্ষা ও সকল আত্মিক ও মানসিক অসুস্থতার মহৌষধ।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য কুরআন কেন্দ্রিক ঈমান, আকীদা ও জীবন গঠন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে ‘আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান’ ও ‘কুরআনের প্রতি ঈমান’ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব। কুরআনই প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস, ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা আক্ষরিকভাবে ও সরলভাবে বিশ্বাস করাই ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। কোন্ বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, কিভাবে বিশ্বাস করতে হবে, কিসে বিশ্বাস নষ্ট হবে, কিসে কুফরী হবে, কিসে শিরক হবে, কিভাবে ও কি কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ঈমান লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত হয়েছিল, কিভাবে বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, কিভাবে ঈমানদার ব্যক্তি জীবনযাপন করবেন, ইত্যাদি বিষয়ই হলো, কুরআন কারীমের মূল শিক্ষা।

আল-কুরআনই ইসলামী আকীদার প্রধান ও মূল উৎস। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত থেকে আক্ষরিক, সরল ও স্বাভাবিক যে অর্থ বুঝা যায় তাই আকীদার মূল উৎস, কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা নামে পরিচিতি পরবর্তী যুগগুলির আলিমগণের মতামত

আকীদার উৎস নয়। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সহজ ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন এবং তা বুঝা সহজ করেছেন বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

সাধারণভাবে কুরআন কারীম নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে। এছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হলে তাও ওহীর ব্যাখ্যা বলে গণ্য। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ব্যাখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদাণ করা হয়। পরবর্তী যুগের আলিমগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে যা কিছু বলেছেন তা আলিমগণের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, রায় বা মতামত হিসেবে পর্যালোচনার গুরুত্ব লাভ করে, কিন্তু কখনোই তা ওহীর সমতুল্য বা সম্পূরক নয় এবং তা আকীদার ভিত্তি নয়।

শুধু কুরআনের উপর আমল করা অসম্ভব

গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয় যে, শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করে শরীয়তের বিধি-বিধান বুঝা ও পালন করা সম্ভব নয়। কারণ কুরআনের অনেক মূলনীতি রয়েছে, যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আবার অনেক আয়াত রয়েছে দুর্বোধ্য, যার তাফসীর ও স্পষ্টকরণ জরুরী। তাই কুরআন বুঝা ও তার থেকে হুকুম বের করা হাদীস ব্যতীত সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে হাদীস না হলে কুরআনের অনেক বিধান অজানা থেকে যেত, বরং কুরআনের উপর আমল করা দুঃসাধ্য

হত। ইমাম ইব্‌ন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “কুরআনের কোথায় রয়েছে জোহর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, এভাবে রুকু করতে হবে, এভাবে সিজদা করতে হবে, এভাবে কিরাত পাঠ করতে হবে ও এভাবে সালাম ফিরাতে হবে; আবার সিয়ামে কি ত্যাগ করতে হবে; স্বর্ণ, রূপা, বকরি, উট ও গরুর যাকাতের নিয়ম কি, তার সংখ্যা ও পরিমাণ কত; হজের মাসায়েল যেমন ওকুফে আরাফা কোন সময়, মুজদালিফা ও আরাফাতে সালাতের নিয়ম কি, পাথর নিক্ষেপ কিভাবে, ইহরামের নিয়ম কি, ইহরাম অবস্থায় কি করব; চোরের হাত কোথা থেকে কাঁটা হবে; মাহরাম হওয়ার জন্য দুধ পানের বয়স কত; কোন বস্তু ও কোন প্রাণী হারাম; যবেহ ও কুরবানির পদ্ধতি কি; হদ কায়েমের নিয়ম কি; কিভাবে তালাক পতিত হয়; বেচাকেনার নিয়ম, সুদের বিস্তারিত বর্ণনা; বিচার, ফয়সালা ও দাবি-দাওয়ার সুরাহা ইত্যাদি। অনুরূপ কসম করা, মাল জমা সঞ্চিত করা, উন্নয়ন ও আবাদ করা ইত্যাদি ফিকাহের অধ্যায়গুলো কুরআনের কোথায় রয়েছে? বরং যদি কুরআন ও আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে তার উপর আমল করা। এসব বিষয় জানার একমাত্র উপায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। এ ছাড়া উম্মতের ইজমার সংখ্যা খুব কম, অতএব হাদীসে ফিরে যাওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই। যদি কোন ব্যক্তি বলে: কুরআনে যা পাই

একমাত্র তাই গ্রহণ করব, অন্য কিছু নয়, তাহলে সবার ঐক্যমত্যে সে কাফের"। মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখিরকে বলা হয়েছিল: আমাদেরকে কুরআন ব্যতীত কিছু বলবেন না, তিনি বলেন: আল্লাহর কসম আমরাও তাই চাই, কিন্তু কুরআন সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিক জানেন কে?[28] ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল: "তোমরা আমাদেরকে শুধু হাদীস বল, অথচ তার কোন প্রমাণ আমরা কুরআনে পাই না", ইমরান রেগে বললেন: তুমি আহমক, তুমি কি কুরআনের কোথাও পেয়েছি জোহর চার রাকাত, তাতে আস্তে কিরাত পড়তে হবে? অতঃপর তিনি সালাত ও যাকাত ইত্যাদির কথা বলেন। তিনি বলেন: তুমি এসব বিষয় কুরআনে বিস্তারিত পেয়েছ, নিশ্চয় পাওনি, এসব বিষয় কুরআন অস্পষ্ট রেখেছে, কিন্তু হাদীস তার ব্যাখ্যা দিয়েছে"। প্রকৃতপক্ষে হাদীস থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তার উৎস কুরআনুল কারীম ও তার মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা নিজ ঘোষণায় কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই হাদীস আঁকড়ে ধরার অর্থ কুরআন আঁকড়ে ধরা, হাদীস ত্যাগ করার অর্থ কুরআন ত্যাগ করা। সাহাবায়ে কেরাম ও আদর্শ পূর্বসূরিগণ তাই বুঝেছেন। একদা আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

---

[28] অর্থাৎ আমরা কুরআনই চাই, কিন্তু আমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক কুরআন জানেন, তাই কুরআন বুঝার জন্যই তার হাদীস গ্রহণ করতে হবে।

«لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله».

“আল্লাহর লানত হোক সেসব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়; যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে, এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতকারী”। এ কথা বনু আসাদ বংশের জনৈক মহিলা শুনে, যার নাম উম্মে ইয়াকুব, সে ইবনে মাসউদের নিকট এসে বলে: আমি শুনেছি আপনি অমুককে অমুককে লানত করেছেন? তিনি বললেন: আমি কেন তাকে লানত করব না, যাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন, এবং যার কথা আল্লাহর কুরআনে রয়েছে! সে বলল: আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু আপনি যা বলেন তা তো পাই নি? তিনি বললেন: তুমি কুরআন পড়লে অবশ্যই পাইতে, তুমি কি পড়নিঃ

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ٧﴾ [الحشر: ٧]

“আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যার থেকে তোমাদের নিষেধ করে তার থেকে বিরত থাক”।[29] সে বলল:

[29] সূরা আল-হাশর: (৭)

অবশ্যই, তিনি বললেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন"।[30]

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ও তার উপর আমল করা ওয়াজিব, এবং আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে হাদীস কুরআনের সমমর্যাদার। হাদীস থেকে বিমুখ হওয়া প্রকৃতপক্ষে কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাফরমানি করা।

অতএব গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরা।

হাদীসের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআনের দলিল

১. কুরআনুল কারীমের কতক আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ওয়াজিব, তার বিরোধিতা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূলের আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

---

[30] বুখারী: (৪৮৮৬)

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩) [النساء : ٥٩]

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর"।[31]

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের ও তার রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদানের জন্য (وأطيعوا) ক্রিয়াটি পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, রাসূলের আনুগত্য করা এককভাবে ফরয, তার নির্দেশকে কুরআনের সামনে রেখে যাচাই করার প্রয়োজন নেই, বরং সর্বাবস্থায় তার নির্দেশ মানা ওয়াজিব, কুরআনে থাক বা নাক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣ [محمد : ٣٣]

---

[31] সূরা নিসা: (৫৯)

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না”।[32] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠ [النساء : ٨٠]

“যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করি নি”।[33] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

(وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧) [الحشر: ٧]

“রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর”।[34] এ থেকে প্রমাণিত হয় হাদীস দলিল ও ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ এক উৎস।

---

[32] সূরা মুহাম্মদ: (৩৩)

[33] সূরা আন-নিসা: (৮০)

[34] সূরা আল-হাশর: (৭)

২. কতক আয়াতে ঈমানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য, তার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তার আদেশ-নিষেধকে মেনে নেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦) [الاحزاب : ٣٦]

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"।[35] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥) [النساء : ٦٥]

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন

[35] সূরা আহযাব: (৩৬)

দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়"।[36] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

(إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١) [النور : ٥١]

"মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম"।[37] এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা মেনে নেয়া ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ঈমানের অংশ।

৩. কুরআনুল কারীমের কতক আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস আল্লাহর পক্ষ থেকে একপ্রকার ওহী, তিনি নিজের পক্ষ থেকে শরীয়তের বিষয়ে কিছু বলেন নি। তাই তার হারাম করা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

---

[36] সূরা আন-নিসা: (৬৫)

[37] সূরা আন-নুর: (৫১)

﴿ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ ٤٦ فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ ٤٧ ﴾ [الحاقة: ٤٤، ٤٧]

"যদি সে আমার নামে কোন মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিণ্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা করার থাকত না"।[38] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩﴾

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযইয়া দেয়"।[39] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ

---

[38] সূরা আল-হাক্কাহ: (৪৪-৪৭)

[39] সূরা আত-তাওবাহ: (২৯)

وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ١٥٧) [الاعراف: ١٥٦]

"যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে"।[40]

এসব আয়াত প্রমাণ করে যে, হাদীস আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী, তাই কুরআনের ন্যায় হাদীসও দলিল।

৪. কতক আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যা দানকারী এবং তিনি উম্মতকে হিকমত শিক্ষা দেন, যেমন তিনি শিক্ষা দেন কুরআন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

(بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤) [النحل: ٤٤]

---

[40] সূরা আল-আরাফ: (১৫৭)

"এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে"।[41] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

(وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤) [النحل: ٦٤]

"আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে"।[42]

(وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ١١٣) [النساء : ١١٣]

"আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত"।[43] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

(وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ ٣٤) [الاحزاب : ٣٤]

---

[41] সূরা আন-নাহাল: (৪৪)

[42] সূরা আন-নাহাল: (৬৪)

[43] সূরা নিসা: (১১৩)

"আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো।[44] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤ ﴾ [ال عمران: ١٦٤]

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল"।[45] আলেমগণ বলেছেনঃ এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। ইমাম শাফে'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে কিতাব উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ কুরআন। আমি কুরআনের এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট, তিনি বলেছেন: হিকমত অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। এখানে কুরআন উল্লেখ করে তার পশ্চাতে হিকমত উল্লেখ করা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[44] সূরা আহযাব: (৩৪)

[45] সূরা আলে-ইমরান: (১৬৪)

মুমিনদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এখানে হিকমত অর্থ হাদীস ভিন্ন অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও হাদীস এ দু'টি বস্তুই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ ভালো জানেন। দ্বিতীয়ত এখানে যেরূপ কুরআনের পাশাপাশি হিকমত রয়েছে, সেরূপ আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্য মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু ফরয বলা বৈধ নয় ..."।[46]

৫. কুরআনে যেসব ইবাদত ও আহকাম অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হাদীস তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর সালাত ফরয করেছেন, কিন্তু তিনি তার সময়, রোকন ও রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সালাত ও প্রশিক্ষণ দ্বারা মুসলিমদের তার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ

«صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري.

[46] আর-রেসালা: (৭৮)

“তোমরা সালাত আদায় কর, যেমন আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ”।[47] আল্লাহ তা‘আলা হাজ্জ ফরয করেছেন, কিন্তু তার মাসায়েল বর্ণনা করেন নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাসায়েল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» رواه مسلم.

“তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজের মাসায়েল শিখে নাও”।[48] আল্লাহ তা‘আলা যাকাত ফরয করেছেন, কিন্তু কোন্ সম্পদ, কি পরিমাণ ফসল ও কোন্ জাতীয় ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ফরয হবে, তার বর্ণনা দেন নি, অনুরূপ তার প্রত্যেকটির নিসাবও বর্ণনা করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব হাদীস ব্যতীত কুরআন বুঝা অসম্ভব।

৬. কুরআনে বর্ণিত অনেক সাধারণ নীতিকে হাদীস খাস করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

---

[47] বুখারী: (৫৫৭৬)

[48] মুসলিম (১২৯৭)

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ١١ ﴾ [النساء : ١١]

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ”।[49]

উত্তরাধিকার বা মিরাসের ক্ষেত্রে এখানে কুরআন একটি সাধারণ নীতির বর্ণনা দিয়েছে, যা প্রত্যেক মাতা-পিতা ও তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু হাদীস খাস করে দিয়েছে যে, পিতা নবী হলে তার সম্পদের মধ্যে মিরাস প্রতিষ্ঠিত হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» رواه مسلم.

“আমরা নবীদের জামাত, আমাদের কেউ উত্তরাধিকার হয় না, আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ সদকা”।[50] আর উত্তরাধিকারী থেকে হত্যাকারীকে বাদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«لا يرث القاتل»، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني.

---

[49] সূরা নিসা: (১১)

[50] মুসলিম।

"হত্যাকারী উত্তরাধিকার হবে না"।[51] অতএব কুরআনের সাধারণ নীতি শামিল করলেও হাদীসের কারণে নবীদের সম্পদে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সন্তান হত্যাকারী হলে পিতার সম্পদের মিরাস পাবে না।

৭. কুরআনে বর্ণিত অনেক অনির্দিষ্ট বিধানকে হাদীস নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

(وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا ٣٨) [المائدة: ٣٨]

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও"।[52] এখানে হাত কাটার স্থান নির্দিষ্ট করা হয়নি, হাতের কব্জি, বাহু ও ভুজ সবার উপর (يد) শব্দের প্রয়োগ হয়। কিন্তু হাদীস তা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, কব্জি থেকে হাত কাঁটা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল তাই ছিলঃ

«أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف» .رواه الدار قطني.

---

[51] তিরমিযী ও ইমাম আহমদ প্রমুখগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আলবানি তা সহিহ বলেছেন।

[52] সূরা আল-মায়েদা: (৩৮)

"জনৈক চোরকে উপস্থিত করা হলে তার হাত কব্জি থেকে কর্তন করা হয়"।[53]

৮. কুরআনে বর্ণিত বিধানকে হাদীস কখনো শক্তিশালী করেছে, কখনো তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ, এসব ইবাদতের বর্ণনা যদিও কুরআনে রয়েছে, তথাপি হাদীস তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

কুরআনের বিধান ব্যাখ্যাকারী হাদীসের উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

(لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ٢٩) [النساء : ٢٩]

"তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা"।[54] এ আয়াত প্রমাণ করে পরস্পর সম্মতিতে হলে সব ধরণের ব্যবসা বৈধ ও হালাল। কিন্তু হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[53] দারা কুতনি; সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, নং ১৭২৪৮।

[54] সূরা নিসা: (২৯)

ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করে এসে দেখেন, কৃষকরা গাছের ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, অথচ ক্রেতা ফলের পরিমাণ ও ভাল-মন্দ জানতে পারে না। যখন ফল কাঁটার মৌসুম হয়, তখন গাছে ফল না থাকলে বা কোন কারণে ধ্বংস হলে উভয়ের মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে অধিক ঠাণ্ডা, বা ফল বিনষ্টকারী গাছের রোগ বা পোকার আক্রমণের কারণে ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে এরূপ ঘটনা ঘটে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় বেচাকেনা হারাম করে দেন, যতক্ষণ না ফলের আসল আকৃতি বের হয়, এবং যতক্ষণ না ক্রেতা ফলের আসল প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হয়। তিনি বলেনঃ

«أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟» رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি আল্লাহ গাছে ফল না দেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্পদ ভক্ষণ করবে”?[55]

৯. হাদীসে অনেক হুকুম রয়েছে, কুরআনে যার উল্লেখ নয়। যেমন গৃহ পালিত গাধা ও নখ বিশিষ্ট পাঞ্জা দ্বারা শিকারকারী হিংস প্রাণী

[55] বুখারী, ২১৯৮; মুসলিম, ১৫৫৫।

খাওয়া হারাম, অনুরূপ ফুফু ও খালার সাথে কোন নারীকে বিয়ে করা হারাম। এসব বিধান কুরআনে নেই, তাই কুরআনের পাশাপাশি হাদীস গ্রহণ না করলে ইসলাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

হাদীসের প্রামাণিকতার পক্ষে হাদীসের দলিল

অসংখ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, হাদীস ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলিল ও তার উপর আমল করা ওয়াজিব। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছিঃ

কতক হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারিত কুরআন ও গায়রে কুরআন সব ওহীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি যা বলেছেন, বা যার স্বীকৃতি দিয়েছেন তা আল্লাহর নির্দেশে দিয়েছেন। তাই হাদীসের উপর আমল করার অর্থ কুরআনের উপর আমল করা, রাসূলের আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা; আর রাসূলের নাফরমানি করার অর্থ আল্লাহর নাফরমানি করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما

وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما حرم الله» رواه ابن ماجة

“সেদিনে বেশী দূরে নয়, কোন ব্যক্তি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আমার কোন হাদীস বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মাঝে কিতাবই যথেষ্ট, তাতে যা হালাল পাব, তা হালাল মানব এবং তাতে যা হারাম পাব, তা হারাম মানব। জেনে রেখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর হারাম করার ন্যায়”।[56]

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছেঃ

«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه».

“জেনে রেখ, আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ (হাদীস) দেয়া হয়েছে। জেনে রেখ, সেদিন দূরে নয়, কোন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি তার চেয়ারে বসে বলবেঃ তোমরা এ কুরআনকে আঁকড়ে ধর, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল জান এবং তাতে যা

[56] ইবনে মাজাহ, ১২।

হারাম পাবে তা হারাম জান"।[57] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক বাণীতে বলেনঃ

«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق». رواه البخاري

"আমার এবং আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার কওমের নিকট এসে বলল: হে আমার কওম, আমার দু'চোখে আমি শত্রু বাহিনী দেখেছি, নিশ্চয় আমি স্পষ্ট সতর্ককারী, অতএব নিরাপত্তা অবলম্বন কর।

অতঃপর তার কওমের এক দল তার অনুসরণ করল, ফলে তারা বের হয়ে পড়ল ও তাদের অজান্তে জনপদ প্রস্থান করল, তারা নাজাত পেল। আর তার কওমের অপর দল তাকে মিথ্যারোপ করল, ফলে তারা নিজেদের জায়গায় ভোর করল, সকালে শত্রু বাহিনী তাদের উপর হামলা করে তাদের ধ্বংস ও সমূলে নিঃশেষ করে দিল। এ হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার আনুগত্য করল ও আমি

[57] আবু দাউদ, ৪৬০৪।

যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল; এবং ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার নাফরমানি করল ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা মিথ্যারোপ করল"।[58] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত মারফূ হাদীসে এসেছে:

«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله .... ».

"যে আমার অনুসরণ করল সে আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যে আমার নাফরমানি করল সে আল্লাহর নাফরমানি করল ..."[59] অপর হাদীসে এসেছেঃ

«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى».

"আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করেছে। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন: যে আমার অনুসরণ করল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার নাফরমানি করল সে অস্বীকার করল"।[60] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক হাদীসে হাদীস আঁকড়ে ধরা,

---

[58] বুখারী, ৭২৮৩।

[59] বুখারী: (২৭৫২)

[60] বুখারী: (৬৭৬৪)

হজের বিধান ও ইসলামের নিদর্শনগুলো শিক্ষা করা, হাদীস শ্রবণ করা ও সংরক্ষণ করা এবং যে শোনেনি তাকে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তার উপর মিথ্যা বলা থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». رواه البيهقي وغيره

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তুকে রেখে দিয়েছি, তার পরবর্তীতে তোমরা গোমরাহ হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত। এ দু'টি বস্তু পৃথক হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট উপস্থিত হয়"।[61] তিনি আরো বলেছেনঃ

«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ». رواه أبو داود

"অতএব তোমরা আমার সুন্নত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নত আঁকড়ে ধর। খুব শক্তভাবে তা আঁকড়ে ধর ও মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধর"।[62] তিনি অন্যত্র বলেনঃ

---

[61] বায়হাকি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[62] আবু দাউদ ৪৬০৭।

«صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه البخاري

“সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ”।[63] অন্যত্র বলেনঃ

«خذوا عني مناسككم». رواه النسائي

“আমার থেকে তোমরা তোমাদের হজের বিধানগুলো গ্রহণ কর”।[64] অন্যত্র বলেনঃ

«نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ...». رواه الترمذي وغيره

“আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুন, যে আমার কথা শুনল, অতঃপর তা আত্মস্থ ও হিফাজত করল এবং তা পৌঁছে দিল। কখনো ফিকাহ (হাদীস) বহনকারী ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট পৌঁছায়...”।[65] অন্যত্র তিনি বলেনঃ

«إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

---

[63] বুখারী, ৬৩১।

[64] নাসাঈ, ৩০৬২।

[65] তিরমিযী, ২৬৫৬।

“আমার উপর মিথ্যা রচনা করা অন্য কারো উপর মিথ্যা রচনা করার মত নয়, যে আমার উপর স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।[66]

তিনি অন্যত্র বলেনঃ

«لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ». رواه الترمذي. وقال حسن صحيح.

“তোমাদের কেউ অবশ্যই চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখবে, যার নিকট আমার কোন বিষয় আসবে, যার আমি নির্দেশ দিয়েছি অথবা যা থেকে আমি নিষেধ করেছি; অতঃপর সে বলবে: আমরা জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাব, তারই অনুসরণ করব”।[67]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে যে ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন, তা এখন বাস্তব দেখা যাচ্ছে। কেউ সম্পূর্ণ হাদীসকে অস্বীকার করছে, কেউ তার অংশ বিশেষকে অস্বীকার করছে।

---

[66] বুখারী, ১০৭।

[67] তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: হাসান ও সহিহ।

হাদীস অস্বীকার করার কতক অজুহাত

প্রথম অজুহাত: একশ্রেণী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা হাদীসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের নিকট কুরআন ব্যতীত কোন কিছুর উপর আমল করা যাবে না। সন্দেহ নেই হাদীস অস্বীকারকারী এ শ্রেণীর লোক কাফের ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। কারণ এর মাধ্যমে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে। তারা বিশ্বাস করেনি তিনি সন্দেহাতীত ও সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল, যা কুরআন ও তার আয়াতকে অস্বীকার করার শামিল। এ মত পোষণকারী কয়েকটি দলঃ

এক. কট্টর রাফেযী তথা শিয়া সম্প্রদায়: তাদের নিকট সাহাবিরা সবাই কাফের, ফলে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না।

দুই. আহলে কুরআন অথবা কুরআনী সম্প্রদায়: তাদের সৃষ্টি ভারতে। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আহমদ খান ও আব্দুল্লাহ বকর আলাভি।

তিন. পাশ্চাত্য চিন্তা ধারায় প্রভাবিত কতক বুদ্ধিজীবী হাদীস অস্বীকার করেন, অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করেন।

দ্বিতীয় অজুহাত: একশ্রেণীর লোক সব হাদীসকে নয়, বরং শুধু খবরে ওয়াহেদ অস্বীকার করেন। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা উদ্দেশ্য এক সনদে বা এক সূত্রে বর্ণিত হাদীস। কয়েকটি বিদআতি দল এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুতাযিলা সম্প্রদায় এবং আবুল হাসান আশআরি ও আবুল মানসুর মাতুরিদির অনুসারীগণ। তারা আকিদার বিষয়ে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ করেন না, যদিও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়। তাদের দাবি একাধিক সনদ ব্যতীত আমরা হাদীস গ্রহণ করব না। **এ জাতীয় লোকের সংশয় নিরসন ও অজুহাতের কতক উত্তর -**

এক. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ٦) [الحجرات: ٦]

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও"।[68]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং একজন ফাসেকের সংবাদ প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন। এর অর্থ আমরা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করব।

---

[68] সূরা হুজুরাত: (৬)

দুই. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিমরা মসজিদে কুবায় ফজর সালাত আদায় করতে ছিলেন, একজন সংবাদ দাতা এসে বলল, কেবলা কাবার দিকে ঘুরে গেছে, ইতোপূর্বে যা বায়তুল মাকদিসের দিকে ছিল। তারা তার সংবাদ শুনে সালাতেই কেবলার দিকে ঘুরে যান। যদি একজনের সংবাদ তাদের নিকট দলিল ও আমলযোগ্য না হত, তাহলে অবশ্যই তারা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বাক্ষীরূপে চাইত। কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ তার সংবাদ গ্রহণ করে প্রমাণ করেন, খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা জরুরী।

তিন. আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ ٦٧ ﴾ [المائدة: ٦٧]

"হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও"।[69] এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উপর নাযিলকৃত রিসালাত পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তিনি মাত্র একজন ব্যক্তি। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহাবীদের প্রেরণ করতেন। এ ক্ষেত্রে একস্থানে একজন দায়ী প্রেরণ করা সাধারণ নীতিতে পরিণত হয়েছিল, লোকেরা প্রেরিত দায়ীর সংবাদ গ্রহণ করত, তাকে আল্লাহ ও

---

[69] সূরা আল-মায়েদা: (৬৭)

তাদের মাঝে আমানতদার জ্ঞান করত। দেখুন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তুমি তাদেরকে ইসলাম ও তাওহীদের দিকে আহ্বান কর। তিনি ছিলেন একা।

চার. যখন মদ হারাম করে আয়াত নাযিল হল, তখন তার প্রচারকারী ছিল মাত্র একজন। মদিনার লোকেরা তার সংবাদ শ্রবণ করে তাদের মদের পাত্রগুলো ভেঙে ফেলে। তারা বলেনি আমরা একজনের সংবাদ গ্রহণ করব না।

তৃতীয় অজুহাত: এক শ্রেণীর লোক বিবেক সমর্থন করে না তাই হাদীস ত্যাগ করেন। হাদীস ত্যাগ করার এ ফেতনা প্রথম যুগের বিদআতিদের থেকে সূচনা হয়, যেমন মুতাযেলা ও তাদের অনুসারী আশায়েরা প্রমুখ কয়েকটি সম্প্রদায়। তারা বিবেক সমর্থন না করার অজুহাতে অনেক হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে যেসব হাদীসে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে, যেমন আল্লাহর সিফাত ও ঐসব বিষয় যা আমরা চোখে দেখি না। আশ্চর্য যা গায়েবি বিষয়, বা যা বিবেকের ঊর্ধ্বে তারা বিবেক দ্বারা কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে! আমাদের বুঝে আসে না। ঐ ফেতনা পর্যায়ক্রমে আমাদের যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, যখন বিবেককে খুব প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, দৃশ্য ব্যতীত অদৃশ্যকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের

বিষয় মুসলিম পরিচয়দানকারী এসব লোক কুরআন ও হাদীসের বাইরে বিবেককে প্রাধান্য দেয়ার নতুন এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে।

হাদীস (حَدِيث):

হাদীস (حَدِيث) আরবী শব্দ। এর বহুবচন (أَحَادِيث) হাদীস (حَدِيث) শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে নতুন, নবীন, আধুনিক, নব্য, সাম্প্রতিক। আরবী অভিধান ও কোরআনের ব্যবহার অনুযায়ী 'হাদীস' শব্দের অর্থ- কথা, বাণী [speech, word (s)], বার্তা, সংবাদ, বিষয়, খবর (خَبَرٌ) ও ব্যাপার ইত্যাদি। [তথ্যসূত্রঃ আরবী - বাংলা অভিধান, ডঃ ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৮০; আল মাওরিদ, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) মুনির বাআলবাকী][70]।

حَدِيْثٌ (হাদীস) শব্দটি একবচন, এর বহুবচন حُدِثَانُ (হুদিসানুন) বা اَحَادِيْثُ (আহাদীসু) বা حُدَاثَاءُ (হুদাসাউ)। যার লুগাতী বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কথা, বাণী, সংবাদ, ব্যাপার, বিষয়, পুরাতন সংবাদ ইত্যাদি। আর 'ইসতিলাহী' বা পারিভাষিক অর্থে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা অন্যের কোন কথা বা কাজের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে সুন্নাহ্ বা

---

[70] আরবী - বাংলা অভিধান, ডঃ ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৮০; আল মাওরিদ, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) মুনির বাআলবাকী

হাদীস বলে। অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণবলীকে হাদীস বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

আর (হে নবী) অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা আল-কালাম, ৬৮/৪)। 'হাদীস' (حَدِيث) শুধুমাত্র একটি আভিধানিক শব্দ নয়। মূলতঃ 'হাদীস' (حَدِيث) শব্দটি ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) - এর কথা, কাজের বিবরণ কিংবা কথা, কাজের সমর্থন এবং অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত, ইসলামী পরিভাষায় তাই-ই 'হাদীস' নামে অভিহিত। অর্থাৎ-

اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله (فتح الملهم-6/1

রাসূল (সাঃ) এর কথা, কর্ম এবং অবস্থাকে বলা হয় হাদীস। [ফাতহুল মুলহিম-১/৬]।

حديث (হাদীস) এর আভিধানিক অর্থ নতুন। আল্লাহর কালাম 'কাদিম' বা অনাদির বিপরীত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে হাদীস বলা হয়, কারণ তার বাণী অপেক্ষাকৃত নতুন

সংবাদকে হাদীস বলা হয়, কারণ সংবাদ অপেক্ষাকৃত নতুন। মুখের কথাও হাদীস, কারণ এগুলো নতুন নতুন অস্তিত্ব লাভ করে। এ হিসেবে কুরআনুল কারিমকে হাদীস বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤۡمِنُونَ ٦

“অতএব তারা আল্লাহ ও তার আয়াতের পর আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে”? [সূরা আল-জাসিয়াহ: (৬)]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেনঃ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম (হাদীস) বাণী সম্বলিত সামঞ্জস্য পূর্ণ একটি কিতাব যা পুনরাবৃত্তি হয়, যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের গা এতে শিউরে ওঠে তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে প্রতি বিনম্র হয়ে যায়; এটিই আল্লাহর হেদায়াত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হেদায়াত দান করেন আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই[71]। বস্তুতঃ কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগই হাদীস বা সুন্নাত। কুরআনের

---

[71] সূরা আয-যুমার, ৩৯/২৩

পাশাপাশি অতিরিক্ত যে ওহীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে প্রদান করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি কুরআনের বিভিন্ন বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। কুরআন ও হাদীসই আমাদের সকল জ্ঞানের ও কর্মের মূল উৎস।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেনঃ

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَداً، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলোঃ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর হাদীস বা সুন্নাত"[72]।

হাদীস (حديث) শব্দটিও আরবী । যার আভিধানিক অর্থ নিম্নরুপঃ

১. الكلام তথা বাণী। যেমন - ومن اصدق من الله حديثا অর্থাৎ আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্য কথা (বাণী) আর কার হবে?

---

[72] হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ১/১৭১, নং ৩১৮/৩১। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। আরো দেখুন: আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৩

২. তথা সংবাদ। যেমন- هل اتك حديث الجنود فوعون و ثمود অর্থাৎ আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পৌছেছে কি? ফেরআউন ও ছামুদের?

৩. তথা নতুন। যেমন বলা হয় - هذا امر حديث অর্থাৎ এটা নতুন বিষয়।

৪. তথা কাহিনী। যেমন - هل اتك حديث موسى অর্থাৎ হযরত মুসা আ. এর কাহিনী কি আপনার কাছে পৌছেনি?

৫. তথা স্বপ্ন। যেমন - و علمتنى من تاويل الاحاديث অর্থাৎ আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় হাদীস শব্দটি দ্বারা যে সকল বিষয়গুলো পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ-

- কথা
- বাণী
- বক্তব্য
- খোশ-গল্প
- উপন্যাস
- উপকথা
- প্রচার করা

- নতুন
- আধুনিক

এছাড়াও রাসূল (সা.) হাদীস শব্দটি দ্বারা যা বুঝিয়েছেন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে, যে কিয়ামতের দিন রাসূল (সা.) এর শাফায়াত লাভে ধন্য হবে?' [উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন-

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلاَّ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ.

অর্থঃ আমার মনে হয় এ বিষয় (হাদীস) সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউই জিজ্ঞাসা করেনি। কারণ, আমার কথা (হাদীস) শুনার জন্যে তোমাকে সর্বাধিক আগ্রহান্বিত দেখা যায়। (সহীহুল বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে রাসূল (সাঃ), একটি তথ্য এবং তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া কথা, বক্তব্য বা বাণীকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এখানে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা, বক্তব্য বা বাণীর হুবহু তথা অর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যথাযথ ভাবসহ বর্ণনা করা রূপকে হাদীস বলেছেন। তাহলে দেখা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহ হাদীস শব্দটি দ্বারা যখন কারো কথা, বক্তব্য বা বাণী

বুঝিয়েছে তখন ঐ কথা, বক্তব্য বা বাণীর হুবহু রূপকে বুঝিয়েছে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) এর হাদীস বলতে বুঝায় রাসূল (সাঃ) এর কথা, বক্তব্য বা বাণীর হুবহু, নির্ভুল বা শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উল্লেখ করা রূপকে বুঝায়। আর যেহেতু কোন ব্যক্তি তার বক্তব্যকে কাজ বা সমর্থনের মাধ্যমেও প্রকাশ করতে পারেন তাই রাসূল (সাঃ) এর কাজ বা সমর্থনের হুবহু বা নির্ভুল রূপকেও হাদীস বলা যাবে।

হাদীস শাস্ত্রে যে অর্থে হাদীস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টি সকল মুসলমানের ভাল করে জানা ও বুঝা দরকার। পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের জন্যেও তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শাস্ত্রে হাদীস শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে নেয়া হয়েছে। আর এর অর্থ ধরা হয়েছে - রাসূল (সাঃ) এর পরের ৪ (চার) স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে-তাবেয়ী) ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের, রাসূল (সাঃ) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নিজ বুঝের, স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা বক্তব্য। অথবা ঐ সকল ব্যক্তি কর্তৃক তার পূর্বের স্তরের ব্যক্তির কথা, কাজ বা সমর্থনের হুবহু তথা অর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উপস্থাপন করা বক্তব্য। কিন্তু কারো কথা, কাজ বা সমর্থন হুবহু উপস্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। তাই

হাদীস শাস্ত্রে হুবহু উপস্থাপিত হওয়া হাদীসের সংখ্যা ভীষণ কম বা হাতে গনা কয়েকটি।

হাদীস শাস্ত্রের হাদীস শব্দের সংজ্ঞার মারাত্মক দুর্বলতা হাদীস শাস্ত্রের হাদীস শব্দের মারাত্মক দুটি দুর্বলতা হল-

ক. ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি নিষ্ঠাবান মুসলিম, দুর্বল মুসলিম বা মুনাফিক হতে পারে এবং

খ. নিজ বুঝকে স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করার সুযোগ থাকায়- মুনাফিক ব্যক্তির নিজ বানানো কথা রাসূল (সাঃ) এর কথা বলে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ থাকা,

মু'মিন ব্যক্তির নিজ বুঝ ও উপস্থাপনে দুর্বলতা থাকার কারণে রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের ভুল উপস্থাপনের সম্ভাবনা থাকে। রাসূল (সা.) এর কথা হুবহু তথা অর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উপস্থাপন করার পদ্ধতিতে এ দুর্বলতা থাকে না।

হাদীসের পারিভাষিক অর্থঃ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণগান ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে হাদীস বলা হয়। (তথ্যসূত্রঃ হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি, সানাউল্লাহ

নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং – ৭৫)[73]। অতএব, ইসলামী পরিভাষায় মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি্ ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। এক কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি্ ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা কাজ ও অনুমোদন এবং চারিত্রিক গুনাবলী, সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সবই হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। পক্ষান্তরে, সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় আ-সা-র (اثار) এবং তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'ফতোয়া'[74]।

কারণ কুরআন ও হাদীসের মূলকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহাদের এই সব কাজ সম্পন্ন হইত। এই তিন প্রকারের হাদীসের আরও তিনটি স্বতন্ত্র পারিভাষিক নাম রয়েছে; যথাঃ রাসূলের কথা, কাঝ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় মারফূ; সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় মওকুফ এবং তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে মাকতু হাদীস বলা হয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, হাদীস বিশারদগণ হাদীস বুঝাতে যেয়ে কখনো কখনো আরও তিনটি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। তা হলোঃ- (১) আসর (اثار) (২) খবর (خَبَرُ) এবং (৩) সুন্নাহ্ (السنة)। নিম্নে এ তিনটি পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলোঃ-

---

[73] হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি, সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং – ৭৫

[74] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৩

আসর (اثار) : আরবী “আলিফ (ا), সা (ث) এবং রা (ر) বর্ণ এর সমন্বয়ে গঠিত।

আসর (اثار) শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসের এমন চিহ্ন যা তার অস্তিত্বের প্রমান দেয়। এর বহুবচন আ-সা-র। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্ এর রহমতের চিহ্নের প্রতি লক্ষ কর। (সূরা রূম, আয়াত নং – ৬০)। তাই কোন জিনিসের চিহ্নের বাকী অংশকেও আসার বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার কাছে এর আগের কোন বই অথবা কোন জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ নিয়ে এস। আসর এর পরিভাষা চার রকম পাওয়া যায়।

এক – আসার হচ্ছে হাদীসের সমার্থবোধক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা, কাজ ও চুপ থাকার সমষ্টির নাম আসর। তবে সাধারনতঃ এ পরিভাষাটি সম্বন্ধবাচকে ব্যবহৃত হয়। তাই আ-সা-র এর সাথে রাসূল কিংবা সাহা-বাহ্ যোগ করে আ-সা-রু’র রসূল ও আ-সা-রু’স সাহা-বাহ্ বলা হয়। এজন্য মুহাদ্দিসকে আসারীও বলা হয়।

দুই – সাহাবী এবং তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে আসার বলা হয়।

তিন – খোরাসা-নেব ফকীহ্ গণ কেবলমাত্র সাহাবীদের হাদীসকেই আসার বলেন।

চার – আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী আলফারেসী বলেন, আসারটি ফকীহদের পরিভাষা। তারা এটিকে সালাফ বা পূর্ববর্তী আলেমদের বানী সম্পর্কে ব্যবহার করতেন।

আল্লামা নদভী এ প্রসঙ্গে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের হাদীসকে আসর নাম দেয়াটা হাদীস বিশারদদের পছন্দীয় অভিমত এবং এটা পূর্ববর্তী অধিকাংশ বিদ্বানদেরও পরিভাষা। এ কারনেই ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আ-সা-র সম্বলিত গ্রন্থের নাম রেখেছেন তাহযীবুল আ-সা-র। যদিও এ গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এতে উল্লেখিত সাহাবীদের হাদীসগুলো আনুসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত।

খবর এর আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থঃ আরবী খা (خَ), বা (بَ), রা (رُ) হরফের সমষ্টি খবর (خَبَرُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ হিসেবে কোন জিনিস আনা। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ তোমরা যা করছ তার খবর আল্লাহ্ জানেন। যা বর্ননা করা হয় এবং যা কথায় প্রকাশ করা হয় তাকে খবর (خَبَرُ) বলা হয়। (এক খবর হাদীসেরই সমার্থবোধক)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথাবার্তা, কাজকর্ম ও অনুমোদনকেই খবর (خَبَرُ) বলা হয়।

আবার কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যা এসেছে তা খবর (خَبَرُ)। এ জন্যই ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনাবলী চর্চাকারীকে আখবারী বা ঐতিহাসিক বলা হয়।

কারো মতে, খবর হাদীস থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। তাই প্রত্যেকটি হাদীসই খবর কিন্তু প্রত্যেকটি খবর হাদীস নয় (ঐ)। কারন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যা এসেছে তা কেবল হাদীস। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্যান্যদের তরফ থেকে যা আসে তা খবর (خَبَرُ)।

বস্তুতঃ খবরের উৎস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কোন মুসলিম বা অমুসলিমও হতে পারে। কিন্তু হাদীসের উৎস কোন অমুসলিম হতেই পারে না। ইমাম ইবনে জরীর, হাফিয ইবনে কাসীর, ইমাম বুখারী ও হাফিয যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস ও আখবারী দুটোই। কিন্তু জুর্জী যাইদান ও গোল্ড যেহার প্রমুখ ইসলামবিদ খৃষ্টান ও ইহুদী বিদ্বানগণ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক। তাঁরা মুহাদ্দিস মোটেই নন। সুতরাং, সাহাবায়ে কিরামের আমলকেও সুন্নাহ্ বলা হয়। কারন তাঁরা কেউই সুন্নাহ্ ছাড়া মনগড়া বিষয়ের উপর আমল করতেন না[75]।

---

[75] রাহে আমাল – আল্লামা জলীল আহসান নদভী (রহঃ), অনুবাদঃ প্রফেসর ডঃ এ, বি, এম, সিদ্দিকুর রহমান, ভূঁইয়া প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং – ৩৪ – ৩৫ দ্রষ্টব্য

হাদীস (حَدِيث) ও সুন্নাহ (السنة)

হাদীসে 'হাদীস' (حَدِيث) শব্দটির ব্যবহার যেমন রয়েছে তেমনি সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহারও রয়েছে। হাদীস শব্দের ব্যবহারের উদাহরণ হলঃ

(الْكَذَّابِيْن أَحَدُ فَهُوَ كَذِبٌ أَنَّهُ يُرَى حَدِيْثٍ بِـ عَنِّي حَدَّثَ مَنْ)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন একটা বাণীকে আমার বাণী বলে প্রচার করে; অথচ প্রচারকালে তার সন্দেহ হয়-এটা রাসূলের নামে মিথ্যা কথা, তারপরও প্রচার করে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।" [সহীহ মুসলিমের ভূমিকা (১/৮)]। আর সুন্নাহ শব্দের ব্যবহারের উদাহরণ হলঃ

(المهـــديين الراشــــدين الخلفـــاء وســنة ســــنتي بــ عليكـــم)

অর্থঃ "তোমাদের উপর আমার সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ অনুসরণ করা অপরিহার্য।" [মুসনাদে আহমদ ৪/১২৬, সুনানু আবু দাউদ ৫/১৩, তিরমিজী ৫/৪৪]। তবে সুন্নাহ শব্দটির অর্থের পরিসর আরো ব্যাপক। সুন্নাহ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদনকে যেমন বুঝানো হয়, তেমনি তাঁর সাহাবাদের কথা কাজ, অনুমোদনকেও বুঝায়। যেমন পূর্বের হাদীসটিতে খলিফাদের সুন্নাহকে আঁকড়ে

ধরতে বলা হয়েছে। অতএব, রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ . فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "

আহমদ ইবন হাম্বল (رحيمه الله) ... হাজার ইবন হাজার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা ইরবায ইবন সারিয়া (رضي الله عنه) - এর নিকট গমন করি, যার শানে এ আয়াত নাযিল হয়, তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেনঃ আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাই না। রাবী বলেনঃ আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম

করি এবং বলি, “আমরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনার খিদমতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু সংগ্রহের জন্য এসেছি।” তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) আমাদের সঙ্গে সালাত আদায়ের পর, আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়। আমাদের মধ্যে একজন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু অছীয়ত করুন। তখন তিনি (صلى الله عليه وسلم) বলেন, আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী। [সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৭][76]।

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

[76] সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৭

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আল্লাহর (হাদীস) বাণী অপেক্ষায় কার কথা অধিক সত্যবাদী হতে পারে? (সূরা আন-নিসা, ৪/৮৭)। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিতভাবে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখ, এটাই কল্যানকর এবং শ্রেষ্ঠতর সমাধান। [সূরা নিসাঃ ৫৯]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেছেনঃ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে চিরদিন অবস্থান করবে।" [সূরা জীনঃ ২৩]। অতএব, রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য শাস্তির বিধান সাব্যস্ত থাকায় প্রমাণিত হলো যে, সুন্নাহ অবশ্যই

আল-কুরআনের মতই হুজ্জত (দলিল)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।" [সূরা হাশরঃ আয়াত নং - ৭]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাবঃ ২১]।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতটি হাদীসেও এসেছে। নিম্নে হাদীসটি উপস্থাপন করা হলোঃ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»

:: সুনানু ইবনে মাজাহ্ :: হাদীস ১ [রাসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) - এর সুন্নতের বিবরন অধ্যায়][77] আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রাক'আত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো। তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ। ২। তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানীঃ ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪; সহীহাহ ৮৫০। অতএব, একজন মুমিনের ঈমানের অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে, এ হাদীস তা বুঝার এক মানদণ্ড। এ সত্যিকার মুমিনদেরকে ঈমানের অমৃত স্বাদ পেতে হলে হাদীসে রাসূলের তিনটি শর্ত প্রণিধানযোগ্য-

একঃ আল্লাহর রবুবিয়াতের ওপর অটল আস্থা ও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া।

দুইঃ দ্বীন হিসেবে ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করা এবং সমস্ত পৃথিবীর চাকচিক্যপূর্ণ মিথ্যা ও মানবগড়া সকল মত ও পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। মুহাম্মদ

[77] সুনানু ইবনে মাজাহ্ - হাদীস ১ [রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরন অধ্যায়]

(صلى الله عليه وسلم) এর রিসালতের সাক্ষ্য দান ও সমস্ত মহান ব্যক্তি এমনকি পূর্বের নবীদেরকে ও তাঁর মোকাবেলায় পেশ করার সুযোগ নেই বরং তা হবে ধৃষ্টতার নামান্তর।

তিনঃ জীবনের প্রতিটি কদমে তার সুন্নাতকে এভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে জন্মান্ধ যেমন করে চক্ষুষ্মানের লাঠি শক্তহাতে ধরে পথ চলে।

হে প্রভু! আপনাকে একমাত্র রব, মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) কে শেষ ও চূড়ান্ত রাসূল এবং ইসলামকে শুধু আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হিসেবে আমাদের জন্যে যথেষ্ট বানাও। এ ক্ষেত্রে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। যেমনঃ "হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালাকে রব, ইসলামকে জীবনবিধান ও মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) - কে রাসূল হিসেবে শুধু ঈমান আনেনি বরং মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন ও সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। অতএব, জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বাতিল আদর্শ পরিত্যাগ করতে হবে। অন্ধ-অনুকরণ, অন্ধ-বিশ্বাস ও বিদআত - কুসংস্কার বর্জন করে ইত্তেবায়ে রাসূল অর্থাৎ রাসূল (صلى الله عليه وسلم) ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের অনুসরণ করতে হবে। রাসূল (صلى الله عليه وسلم) জুম'আর খুতবায়ে ঘোষণা করেছেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) .مسلم

উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথনির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (صلى الله عليه وسلم) এর পথনির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন করা, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। (মুসলিম : ৮৬৭)[78]। রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণ বলতে বুঝায় দালালাতুল কুরআন (কুরআনের নস) মুতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব কাজ করেছেন ও তিনি নিজে যা সুন্নত করেছেন সে সব কাজ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ " .

[78] মুসলিম : ৮৬৭

আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) .... মিকদাম ইবন মা'দীকরাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ ".

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (রহঃ) .... আবূ রাফি (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদের মাঝে কাউকে এরূপ পাব না, যে তার খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে থাকে। যদি তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ আসে, তখন সে বলেঃ আমি তো এ জানি না। বরং আমি আল্লাহ্র কিতাবে যে নির্দেশ পেয়েছি, তার অনুসরণ[79]।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ ".

[79] সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৫

মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (রঃ) .... আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই তা পরিত্যাজ্য। রাবী ঈসা (রঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ আমরা যা করিনি, যদি এমন কাজ কেউ করে, তাবে তা পরিত্যাজ্য। আলোচ্য হাদীসে নবী (সাঃ) অহংকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা নিজেদের আরাম-আয়েশে জন্য এরূপ বলবে এবং হাদীসের নির্দেশ পরিত্যাগ কর কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করবে। এরা সত্যকারের মুসলিম নয়। বরং প্রকৃত মুসলমান তারা - যারা কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুসরণ করবে। (অনুবাদক)][80]। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (صلى الله عليه وسلم) বলেছেনঃ-

كُلُّهُمْ فى النَّارِ إلاَّ مِلّةٌ واحِدَةٌ ما أنا عَلَيْهِ وَأصْحَابيْ (الترمذي حسن

আর্থাৎ, একমাত্র আমি এবং আমার সাহাবীদের মতের (মিল্লাতের) অনুসারী দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে। (তথ্যসূত্রঃ তিরমিযী, হাসান)। মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে?

---

[80] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল ইল্ম। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়া (১০/৩৫৪।)

অথচ এখন সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে গেছে। (সূরা ইয়াসিন, ৩৬/৭৭-৭৯)।

خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বীর্য থেকে অথচ এখন সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে গেছে। (সূরা আন-নাহল, ১৬/৪)

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে হাদীস (حَدِيث) :

আল-কুরআনে হাদীস শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ-

১. কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর কথা, বক্তব্য বা বাণী অর্থেঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا

অর্থঃ তারা এই বক্তব্যের (হাদীসের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তুমি [রাসূল (সাঃ)] হয়তো নিজেকে ভীষণভাবে চিন্তাকিষ্ট করে তুলব। (সূরা কাহাফ/১৮ : ৬)। ব্যাখ্যঃ এখানে কুরআনের আয়াত তথা কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর বক্তব্যকে হাদীস বলা হয়েছে।

أَفَبِهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ

অর্থঃ এ কথা (হাদীস) কি তোমাদের (ভুল ধারণার) উপর প্রলেপ দেয় না? (সূরা ওয়াকিয়াহ/৫৬ : ৮১)।

ব্যাখ্যাঃ এখানেও কুরআনের আয়াত তথা কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর কথা বা বক্তব্যকে হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ

অর্থঃ তাহলে এসব কথায় (হাদীস) তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? (সূরা নজম : ৫৯)। ব্যাখ্যাঃ এখানেও কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর কথা বা বাণীকে ‘হাদীস’ বলা হয়েছে।

২. নবীর কথা অর্থেঃ

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا

অর্থঃ এবং নবী যখন তাঁর এক স্ত্রীর নিকট গোপনে একটি কথা (হাদীস) বললেন। (সূরা তাহরীম/৬৬ : ৩)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে নবীর বলা কথাকে হাদীস বলা হয়েছে।

৩. সাধারণ মানুষের কথা, বক্তব্য বা বাণী অর্থে

فَبِأَيِّ حَدِيْثٍم بَّعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ

অর্থঃ অতঃপর এটি বাদে অন্য কার কথাকে (হাদীস) তারা বিশ্বাস করবে? (সূরা আরাফ/৭ : ১৮৫, মুরসালাত/৭৭ : ৫০)।

ব্যাখ্যাঃ এ দুই স্থানে আল্লাহ বা রাসূল (সাঃ) এর কথা, বক্তব্য বা বাণী বাদে অন্য কারো কথা, বক্তব্য বা বাণীকে হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. নতুন কথা, সংবাদ বা খবর অর্থেঃ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسَى

অর্থঃ মুসার খবর (হাদীস) তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? (সূরা ত্বাহা/২০ : ৯, সূরা আন-নাযিয়াত/৭৯ : ১৫)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করা খবর কে হাদীস বলা হয়েছে।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُوْدِ

অর্থঃ তোমার নিকট সেই সৈনিকদের খবর (হাদীস) পৌঁছেছে কি? (সূরা বুরুজ/৮৫:১৭)

ব্যাখ্যাঃ এখানেও কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করা বিশেষ একটি খবরকে হাদীস বলা হয়েছে।

৫. বর্ণনা করা, প্রকাশ করা অর্থেঃ

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থঃ তোমার রবের নিয়ামতের কথা বর্ণনা (হাদীস) করতে থাক। (সূরা দুহা/৯৩ : ১১)

৬. স্বপ্নকালীন কথাবার্তা অর্থেঃ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيثِ

অর্থঃ স্বপ্নের (হাদীস) কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিখিয়েছো। (সূরা ইউসুফ/১২ : ১০১)।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আল-কুরআনে আল্লাহ, নবী-রাসূল ও সাধারণ মানুষের কথা, বক্তব্য ও বাণী এবং বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, সংবাদ (খবর), নতুন কথা, স্বপ্নকালীন কথাবার্তা ইত্যাদি অর্থে হাদীস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা, বক্তব্য বা বাণীর হুবহু (অর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উল্লেখিত) রূপ তথা নির্ভুল রূপ। তাহলে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, কুরআন যেখানে হাদীস শব্দ দ্বারা কারো কথা, বক্তব্য বা বাণী বুঝিয়েছে সেখানে ঐ কথা, বক্তব্য বা বাণীর হুবহু তথা নির্ভুল রূপকে বুঝিয়েছে। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী হাদীস শব্দের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে কারো কথা, বক্তব্য বা বাণীর হুবহু, নির্ভুল বা অর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যথাযথ ভাবসহ উল্লিখিত রূপ।

হাদীস সম্পর্কে আলেমদের অভিমতঃ

হাদীসের প্রসিদ্ধতম সংজ্ঞা হল,

اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله (فتح الملهم-6/1

রাসূল (সাঃ) এর কথা, কর্ম এবং অবস্থাকে বলা হয় হাদীস। (ফাতহুল মুলহিম-১/৬)। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) লিখেন-

وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَدِيثُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفِعْلَهُمْ وَتَقْرِيرَهُمْ.

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন- হাদীস এটি আম শব্দ। এর মাঝে রাসূল সাঃ এর কথা এবং সাহাবী এবং তাবেয়ীদের কথা এবং তাদের কর্ম ও তাকরীর তথা কোন কিছু দেখে চুপ থাকা বিষয়ও শামিল। (তাদরীবুর রাবী-৬)[81]। তাহলে আল্লামা তীবী (রহঃ) এর মতে হাদীস হল ৯টি বস্তুর সমন্বয় তথা-

১- রাসূল (সাঃ) এর কথা।

২- রাসূল (সাঃ) এর কর্ম।

৩- রাসূল (সাঃ) এর তাকরীর।

৪- সাহাবী (রাঃ) এর কথা।

৫- সাহাবী (রাঃ) এর কর্ম।

৬- সাহাবী (রাঃ) এর তাকরীর।

---

[81] তাদরীবুর রাবী-৬

৭- তাবেয়ীগণ (রহঃ) এর কথা।

৮- তাবেয়ীগণ (রহঃ) এর কর্ম।

৯- তাবেয়ীগণ (রহঃ) এর তাকরীর।

আল্লামা তীবী (রহঃ) এর মতে ৯ প্রকারকেই হাদীস বলেছেন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)।[82] আল্লামা হাফেজ সাখাবী (রহঃ) বলেন-

والحديث لغة ضد القد يم واصطلا حاماضيف الى النبى ﷺ قولا له اوفعلا له اوتقرير اوصفة حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام

অর্থঃ আভিধানিক অর্থে হাদীস শব্দটি কাদীম তথা অবিনশ্বরের বিপরীত আর পরিভাষায় বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই তার বক্তব্য হোক বা কর্ম বা অনুমোদন অথবা গুণ এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থির সবই হাদীস। সহীহ বুখারীতে বিশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ **عمدة القارى** এর মধ্যে হাদীস সম্বন্ধে রয়েছেঃ

علم الحديث هو علم يعرف به اقوال النبى ﷺ وافعاله واخواله -

[82] দেখুন- وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ: الْخَبَرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ، فَيُطْلَقَانِ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ. {তাদরীবুর রাবী-৬}

অর্থঃ ইলমে হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞান যার সাহায্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানতে পারা যায়। হাদীস' শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগব ইসফাহানী লিখেছেনঃ

اَلْحَدِيثُ: وَاَلْحدِيْثُ كَوْنُ اَلشَّئِ بَعَدَ اَنْ لَّمْ تَكُنْ عِرضَاً كَانَ تَوْ اَوْجَدْ هَرًّا وكُلُّ كَلاَمٍ يَبْلُغُ الْاِنْسَانَ مِنْ جَهَةِ الْسَّمْعِ اَوِ الْوَحِىْ فِىْ يَقْظَتِهِ اَوْ مَنَامِهِ حَدِيْثٌ-

'হাদীস' আর 'হুদুস' বলতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রীয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোন কথা পৌঁছায়, তাকেই হাদীস বলে। অন্যত্র তিনি লিখেছেনঃ

شَئَّ يُلْقَى فِىْ رَوْعٍ اَحَدٍ مِنْ جِهَةِ الْملأَ

উচ্চতর জগত হতে একজনের অন্তর্লোকে যা কিছু উদ্রিক্ত হয় তাই হাদীস[83]। কতিপয় হাদীসবিশারদ বলেন,

معرفة ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى صحابى او الى من دونه ممن يقتدى بهم فى الدين قولا او فعلا او صفة او تقريرا .

[83] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম নামক, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং -২০।

অর্থাৎ নবী (সাঃ) এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানা তেমনিভাবে কোন সাহাবী বা তার পরবর্তী এমন কারও বাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, দ্বীনের ব্যাপারে যিনি অনুসরণযোগ্য, এসবগুলোই ইলমুল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। ফিকহ বিদদের নিকট হাদীস হলঃ

– اقوال رسول الله ﷺ وافعاله

অর্থঃ হাদীস হলো আল্লাহর রাসূলের কথা ও কাজসমূহ।

'ইলমুর রিওয়াইয়াহ' ও 'ইলমুদ দিরাইয়াহ'- কে **"علم مصطلح الحديث"** বা শুধু **"مصطلح الحديث"** বলা হয়।

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে 'ইলমুর রিওয়াইয়াহ' ও 'ইলমুদ দিরাইয়াহ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সে শাস্ত্রকে 'ইলমু মুসতালাহিল হাদীস' বলা হয়। তবে সাধারণত 'ইলমুদ দিরাইয়াহ'কে 'ইলমু মুসতালাহিল হাদীস' বলা হয়। 'মুসতালাহুল হাদীসের' অপর নাম **"علم علوم الحديث"** 'ইলমু উলুমিল হাদীস' বা **"علم أصول الحديث"** 'ইলমু উসুলিল হাদীস' বা শুধু **"علم الحديث"** 'ইলমুল হাদীস'[84]। মূলতঃ

[84] হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় পরিচিতি, সানাউল্লাহ নজির আহমদ, পৃষ্ঠা নং – ৫৭

علوم الحديث একটি আরবী পরিভাষা যা দুটি শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে। একটি হল علوم আর অপরটি হলো الحديث

علوم শব্দটি বহুবন। একবচনে علم অর্থ নিম্নরুপঃ

১. জানা,

২, জ্ঞান লাভ করা,

৩. বুঝা,

৪. বিশ্বাস করা,

৫. প্রজ্ঞা,

৬. শাস্ত্র ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় (علم الحديث) অর্থ হাদীসের জ্ঞান বা হাদীস শাস্ত্র। ইলমে হাদীস (علم الحديث) দুই প্রকার। যথা- (ক) বর্ণনা সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদীস, (খ) অর্থ ও ভাবসংক্রান্ত ইলমে হাদীস।

(ক) বর্ণনা সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদীসঃ যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে রাসূল (সাঃ) এর কথা ও কাজের বর্ণনা এবং বর্ণনাগুলোর মূলপাঠ ও

মূলপাঠের শব্দ লেখন রীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে বর্ণনা সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদীস বলে।

(খ) অর্থ ও ভাবসংক্রান্ত ইলমে হাদীসঃ আর যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে বর্ণনার বাস্তবতা, শর্তাবলী, প্রকারভেদ, বর্ণনাকারীর অবস্থা, বর্ণনাকারীর শর্ত সমূহ, বর্ণনার প্রকারগুলো এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে অর্থ ও ভাবসংক্রান্ত ইলমে হাদীস বলে। [(কাওয়াইদুত তাহদীস-১/২৮, তাদরীবুর রাবী-১/২৬,২৭, আন-নুকাত-১/২২৫, উসূলুল হাদীস-১/২০, ইত্তেহাফুল মাহারা- ২৪,২৫, কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদীস-২৩, দরসে তিরমীযী- ১/২২-২৩)][85]।

ইলমুল হাদীস প্রধানত দুই প্রকার -

১. ইলমুর রিওয়াইয়াহ হাদীস ("علم الرواية")

২. ইলমুদ দিরাইয়াহ হাদীস ("علم الدراية")

১. ইলমুর রিওয়াইয়াহ হাদীস এর পরিচয়ঃ

هو علم يشتمل على نقل احواله صلى الله عليه وسلم قولا و فعلا او تقريرا او صفة

[85] (কাওয়াইদুত তাহদীস-১/২৮, তাদরীবুর রাবী-১/২৬,২৭, আন-নুকাত-১/২২৫, উসূলুল হাদীস-১/২০, ইত্তেহাফুল মাহারা- ২৪,২৫, কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদীস- ২৩, দরসে তিরমীযী- ১/২২-২৩)

যে শাস্ত্রে রাসুল (সাঃ) এর আহওয়াল তথা সামগ্রিক অবস্থা বা জীবনপ্রণালী বর্ণনা করা হয়; চাই তার বাণী হোক বা কর্ম কিংবা অনুমোদন কিংবা কোন গুণ, তাই ইলমুর রিওয়াইয়া'র হাদীস। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইলমুর রিওয়াইয়া'র হাদীসের সূচনা করেন। অতঃপর প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে তার পরিসর বর্ধিত হয়। এ ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

«بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً»

"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও"।[86]

অন্যত্র রাসূল (সাঃ) আরও বলেনঃ

«لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»

"তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়"।[87]

অন্যত্র তিনি বলেনঃ

«تَسْمَعُونَ مِنِّى، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ»

---

[86] বুখারী: (৬/৪৯৬), হাদীস নং: (৩৪৬১), হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[87] বুখারী: (১/১৯৯), হাদীস নং: (১০৫), হাদীসটি আবু বাকরাহ নুফাই ইব্‌ন হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

"তোমরা আমার নিকট শ্রবণ কর, তোমাদের থেকে শ্রবণ করা হবে এবং যারা তোমাদের থেকে শ্রবণ করে তাদের থেকেও শ্রবণ করা হবে"।[88]

২. ইলমুদ দিরাইয়াহ হাদীস এর পরিচয়ঃ

هو علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن من صحة وحسن و ضعف و رفع و وقف و قطع و علو و نزول و كيفية التحمل و الاداء و صفات الرجال و ما اشبه ذلك.

অর্থাৎ এম কতক নিয়মাবলী জানা, যার দ্বারা সহীহ, হাসান, জয়ীফ, মারফু, মাওকুফ, মাকতু, উচ্চসনদ, নিম্ন সনদ- এর দিক দিয়ে সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায়, হাদীস শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রদানের অবস্থা জানা যায় এবং হাদীসের রাবীদের গুণাবলি ও এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাই ইলমুদ দিরাইয়াহ হাদীস।

মোট কথা, কোন হাদীস সম্পর্কে জানা যে, এটি কোন কোন কিতাবে কি কি সনদে এবং কি কি শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এরপর এর অর্থ বুঝা ও এর থেকে বিভিন্ন বিধান চয়ন করা, এসবই হল ইলমু রিওয়াতিল হাদীস। অপরদিকে কোন হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা যে এটি কোন পর্যায়ের হাদীস, সহীহ না হাসান,

[88] আবু দাউদ: (৩/৩২১), হাদীস নং: (৩৬৫৯), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে সহী সনদে বর্ণিত।

মাকবুল না মারদুদ, সনদের রাবীদের অবস্থা কিরুপ, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ইলমু দিরায়াতুল হাদীস এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণভাবে উলুমুল হাদীস বলতে ইলমু দিরায়াতুল হাদীসকে বুঝানো হয়ে থাকে।

উলুমুল হাদীস এর আলোচ্য বিষয়ঃ

السند والمتن من حيث القبول والرد

অর্থাৎ গ্রহণ ও বর্জণের দিক দিক থেকে হাদীসের সনদ ও মতন নিয়ে আলোচনা কর।

উলুমুল হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. গায়রে সহীহ থেকে সহীহ হাদীস জানা এবং

২. হাদীসের পারস্পরিক স্তর জানা।

ইলমে হাদীসের গুরুত্বঃ ইমাম আবু আমর ওসমান ইবনু আবদীর রহমান- ৬৪৩ হিঃ (রাহঃ) বলেন, ইলমে হাদীস একটি শ্রেষ্ঠতম ও অতি কল্যাণকর শাস্ত্র। যাকে উচ্চতর বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই ভালবাসেন। গবেষক, আলেম ও বুদ্ধিমানরাই এর সাথে মনোনিবেশ করেন। এটি এমন একটি ইলম, যাতে অধিকাংশ ইলম সন্নিবেশিত। বিশেষতঃ

ইলমে ফিক্বহ, যা ইলমের নয়নতারা স্বরূপ। তাও এই ইলমের অন্তর্ভুক্ত। আগেকার যুগে ইলমে হাদীসের চর্চা ছিল ব্যাপক। তৎকালীন মুহাদ্দিসীনদের মর্যাদায় তা ছিল সর্বোচ্চ। তখন তার দরস ছিল জীবন্ত এবং তার পাঠশালা ছিল প্রাণবন্ত। ইলমে হাদীসের দরসের গুঞ্জনে পরিবেশ ছিল মুখরিত[89]।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) ১৫০ হিঃ বলেন, যদি সুন্নাহ না থাকত, তাহলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতে পারত না[90]। আর ইলমে হাদীস হল, সঠিক সুন্নাহর নির্ণয়ক।

ইমাম আওযায়ী (রাহঃ) বলেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিক দিয়ে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস কুরআন মাজীদের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে কুরআনই হাদীসের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী[91]। যে হাদীসের প্রতি কুরআনের মুখাপেক্ষীতা বেশি, সে হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হল সহীহ হাদীস।

সিহ্যাতে হাদীস নির্ভর করে, হাদীসের মূলপাঠ ও সূত্র বিশুদ্ধ হওয়ার ওপর। আর তা যে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়, তা হল ইলমুল হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র। অতএব, ইলমূল হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

[89] মুকাদ্দাতু ইবনি সসালাহ - ০৯

[90] মীযানুশ শারানী-৫১

[91] আত-তালীকুস সাহীহ-১/৩

বর্তমান যুগে ইলমে হাদীস চর্চা সময়ের দাবীঃ তৎকালীন যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে ইলমে হাদীসের চর্চা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বর্তমান সময়ে এমন কতগুলো সমস্যা প্রকট ধারণ করছে যার সুষ্ঠু সমাধান ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভ্রান্তি নিরসনে ইলমে হাদীসের বিকল্প নেই। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়, চিন্তাশীল প্রেরণায়, কলম ও মুখের ভাষায় তাদের মোকাবালা করতে ইলমে হাদীসের যথেষ্ট সঠিক জ্ঞান অর্জন করা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবী।

বর্তমান যুগে ইলমে হাদীস চর্চার অবস্থাঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যেখানে ইলমে হাদীসের চর্চা করা সময়ের অপরিহার্য দাবী, সেখানে তার চর্চা হয়ে গেল ঐচ্ছিক বিষয়। কেননা এ যুগের সিংহভাগ তালিবে ইলম 'আসমাউর রিজাল', হাদীসের দুর্লভ ও দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ সম্পর্কে অনবগত। হাদীস তাদের মৌখিকভাবে পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদ্দরুণ পড়ার এই রীতিতে ভাষাগত ত্রুটি ও উচ্চারণগত ভুল ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যাঁ, এখনো ইলমে হাদীসের একটি শাখা অবশিষ্ট আছে। যদিও তা হাদীসের সকল অধ্যায়ের ক্ষেত্রে নয়; বরং মতভেদ রয়েছে এমন মাসায়েলের ক্ষেত্রে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো যে, আজকাল জনসম্মুখে ভ্রান্ত, বানোয়াট ও জাল হাদীসের বর্ণনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ জনসভা কিংবা বিশেষ মজলিস হোক সর্বত্র এমন

ভঙ্গিমায় জাল হাদীস উপস্থাপন করা হয়, যেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস। অথচ রাসূল কারিম (সাঃ) ইরশাদ করেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَكْذِبُوا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

আলী ইবনুল জা‘দ (রহঃ) ... ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বলেছেনঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে[92]। বর্তমানে আমরা সহীহ হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহ অধ্যয়নের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। হাদীসের সাথে আমাদের সম্পর্ক এতটুকু যে, যে কোনো বক্তার ওয়াজ-নসীহতে বা বাজারি কোনো পুস্তিকায় কোনো হাদীস পেলেই হল, আমরা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাই; অথচ হাদীসের ইলম অর্জন করার মাধ্যম যদি এটিই হয়, তাহলে নিজেদের অজান্তেই মানুষ হাদীসের নামে জাল ও মিথ্যা বর্ণনার ধোঁকায় পড়ে চরম ভ্রান্তির শিকার হবে। আরো আফসোসের বিষয় এই যে, একই বিষয়ের ওপর যদি এক দিকে রাসূলুল্লাহ

---

[92] ইলম বা জ্ঞান অধ্যায় :: সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদীস ১০৮

(সাঃ) এর হাদীস বিদ্যমান থাকে, অপরদিকে জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনাও থাকে, তখনো দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের মুখে ঐ বিষয়ের জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতই প্রসিদ্ধ। আর তার বিপরীতে সহীহ হাদীস থেকে তারা সম্পূর্ণ বে-খবর! আর মানুষ এহেন পরিস্থিতির শিকার তখনই হয়, যখন সে ইলমে হাদীস বা হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে উদাসীন হয় এবং তার চর্চা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আমাদের উচিত, ইলমে হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনুধাবন করে তাঁর চর্চায় সময় ব্যয় করা।

ইলমে হাদীসের কয়েকটি শাখা প্রশাখাঃ উল্লিখিত আলোচনায় ইলমে হাদীসের গুরুত্ব সূর্যের ন্যায় প্রমাণিত। তাই, তার কতিপয় শাখা প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে উক্ত শাস্ত্রের পান্ডিত্য লাভ করা একান্ত জরুরী মনে করি। অতএব, নিম্নে তার পাঁচটি শাখা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল- (১) আসমায়ে সনদ শুদ্ধ করণ, (২) হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা বিশ্লেষণ, (৩) হাদীসের শাব্দিক শুদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ, (৪) হাদীস সহীহ-জয়ীফের বিষয়ে হুকুম নির্ণয় করা, (৫) রাবী ও তার আদাবের জ্ঞান লাভ করা। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি ইলমে হাদীসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর চতুর্থ বিষয় ইলমে হাদীসের ওপরই নির্ভর। পঞ্চম বিষয় ইলমে হাদীসের মূল বিষয় না হলেও এটাই হাদীসের নির্যাস ও ফলাফল। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায়

বলা যায় যে, হাদীস (حديث) বলতে সাধারনতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয় এবং হাদীস (حديث) বলে যা জানা যায় তা সত্যিই রাসুল (সাঃ) এর কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। ব্যাপক অর্থে সাহাবী (صحابى) দের কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়ীদের কথা কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস (حديث) বলে। কিন্তু সাহাবা, তাবেয়ী (تابعى) দের ন্যায় তাবে তাবেয়ীনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণও যে কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাতে সন্দেহ নেই। অতএব, সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস বলা হয়। অবশ্য পরে উসুলে হাদীসে তাঁদের কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম দেয়া হয়েছে 'আসার' এবং হাদীসে মওকুফ' এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম দেয়া হয়েছে 'ফতোয়া'। যেহেতু রাসূলে করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণের কথা কাজ ও সমর্থন একই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রচলিত, সেই জন্য মোটামুটিভাবে সবগুলিকেই 'হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তবুও শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এই সবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা- নবী করীম (সাঃ) - এর কথা কাজ ও

অনুমোদনকে বলা হয় 'হাদীস'। হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, মৌন সম্মতি এবং তাঁর শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হাদীস বলে।"

হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনা করার ফযীলত

হাদীস সংরক্ষণ করা বর্ণনা করা অত্যন্ত ফযীলতময়। কারণ এর মাধ্যমে প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কালামের হেফাযত করা হয়। আর এরকম ব্যক্তির ব্যাপারে প্রিয়নবী বলেছেনঃ

نضرالله امرأسمع مقالتى فوعاهاواداها كماسمع فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هوافقه منه -

অর্থঃ আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে সতেজ, ও সমুজ্জ্বল রাখুন, যে আমার কথাগুলো শুনেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অপরজনের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে। (আবু দাউদ)। এই হাদীস আমাদের নিকট তুলে ধরে হাদীস বর্ণনা করার গৌরব ও সম্মান। এজন্যে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, যে ব্যক্তি মূলত অর্থেই হাদীস সন্ধানী হয় তার চেহারা সজীব বা নূরানী হয়ে ফুটে উঠবে। শুধু ফযীলত নয়, আল্লাহর রাসূল দোআ করেছেন হাদীস

বর্ণনাকারীদের জন্য এবং তাদেরকে নিজের উত্তরসূরী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ

اللهم ارهم خلفائى قالو يارسوالله ومن خلفائك قال الذين يرؤون الاحاديث ويعلمونــها الناس -

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমার উত্তরসূরীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উত্তরসূরী কারা? তিনি বলেন, তারাই যারা আমার হাদীস বর্ণনা করে ও মানুষের নিকট শিক্ষা দেয়। হাদীস বর্ণনাকারীরা আরো একটি উপায়ে লাভবান হতে পারে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, “নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তারাই আমার নিকটবর্তী হবে যারা অধিক হারে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে।” (তিরমিযী)।

এই হাদীসটি ইবনে হিব্বান ও তার হাদীসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন এই হাদীস এর ফায়েজ ও বরকত লাভ করবে নিশ্চিতভাবে মুহাদ্দিসানে কেরাম ও হাদীসের শায়খগণ। কারণ তারাই তো অধিক হারে হাদীস পড়ে, লিখে। যতবার হাদীস লিখবে বা পড়বে ততবার তিনি প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ সালাম পড়বেন ও লিখবেন। এর ফলে রোজ কিয়ামতে সহজেই তারা প্রিয়নবীর নিকটবর্তী হতে পারবেন।

হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক মানদন্ড

হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল, নিখাদ ও বিশুদ্ধ রাখার জন্যে ইসলামী চিন্তাবিদ ও হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকজন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও গবেষনার ফলে হাদীস যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা ও সমালোচনা যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতির উৎপত্তি হয় তাকে علم ا لجر ح و ا لتعد يل বা সমালোচনা ও সামঞ্জস্য বিষয়ক জ্ঞান বলে। এই বিশেষ পদ্ধতির পরিচয় সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ এটি একটি বিজ্ঞান যাতে বিশেষ শব্দাবলীতে রাবীদের সমালোচনা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। আমরা দেখতে পাই শব্দগত দিক থেকে হাদীসের দুটি অংশ। প্রথম অংশটি সনদ। আর দ্বিতীয় অংশটি মতন। সনদের (হাদীস বর্ননাকারীদের পরস্পরা নামসমূহ) যাচাই-বাছাই ও সমালোচনা করা হয় সামঞ্জস্য বিষয়ক জ্ঞান পদ্ধতির মাধ্যমে। কেননা হাদীস বর্ননাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনচরিত সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞাত হওয়া জরুরী। আর এই জ্ঞান হওয়াকে হাদীসের নীতিশাস্ত্রনুযায়ী লোকদের (রাবীদের) নাম পরিচয় বিষয়ক জ্ঞান বলা হয়। الحطة فى ذكر ا لصحا ح ا لستة গ্রন্থে এই জ্ঞানের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ হাদীসে উল্লেখিত সাহাবা, তাবেয়ী ও রাবীদের সম্পর্কীত ইলম। এই ইলম হলো হাদীসের অর্ধেক জ্ঞান। علم ا لجر ح و ا لتعد يل পদ্ধতির মাধ্যমে সনদে উল্লেখিত রাবীদের জীবন চরিত্রের যে দিকগুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখা হয় তা এইঃ

(১) রাবী কি ধরনের লোক?

(২) রাবীর চারিত্রিক দোষ-গুন কেমন?

(৩) রাবীর ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান কতটুকু আয়ত্ত?

(৪) রাবীর উপলব্ধি ও বোধশক্তি কতটুকু প্রখর ও উন্নত?

(৫) স্মরন শক্তি ও প্রতিভা কেমন?

(৬) রাবীর আকিদা বিশ্বাস, চিন্তা-গবেষনা ও মতবাদ নির্ভুল কি না?

(৭) রাবীর সমস্ত কর্মকান্ড ইসলামী বিধান মুতাবিক কি না?

(৮) সততা ও ন্যায় নিষ্ঠা রাবীর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য কি না?

(৯) সততা ও ন্যায় নিষ্ঠা রাবীর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য কি না?

(১০) কখনো মিথ্যা কলার অভ্যাস ছিল না তো?

(১১) রাবী সৎ চরিত্রবান, চরিত্রহীনতা তাকে কখনো স্পর্শ করে নি?

(১২) রাবী কোথায় হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও শিক্ষা করেছেন?

(১৩) রাবী কার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন?

(১৪) রাবী সত্যিই কি ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীস শিখেছিল?

(১৫) রাবীর তখন বয়স কত ছিল, কোথায়, কিভাবে, কখন তিনি হাদীস শিখলেন?

হাদীস যাচাই-বাছাই ও সমালোচনা করার এই পদ্ধতি সম্পর্কে অমুসলিম সমালোচকগণের কেউ এর কটাক্ষ করেছেন। আবার অনেকে এর বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যারা কটাক্ষ করেছেন তারা হাদীস সংকলনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সঠিকরূপে জ্ঞাত না হতেই এমন সব কথাবার্তা বলেছেন যার ফলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে হাদীসের নির্ভরতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। প্রখ্যাত পাশ্চাত্যবাদী ডঃ স্প্রিঙ্গার হাদীস যাচাই পদ্ধতির বাস্তবতা স্বীকার করে বলেছেনঃ মুসলমানদের আসমাউর রিজালের মতো বিরাট ও সুশৃঙ্খল চরিত্র বিভাজন পৃথিবীর অপর কোনো জাতির সৃষ্টি করতে অতীতে পারে নি আর বর্তমানেও নেই। এই তথ্যভিত্তিক শাস্ত্রের কারনেই পাঁচ লক্ষ হাদীস বর্ননাকারী (রাবী) জীবন চরিত অত্যন্ত নিখুঁত ও সবিস্তারে আজও লোকেরা জানতে পারে[93]। ইমাম শাফেঈ এ শাস্ত্রের গুরুত্বারোপ করে বলেছেনঃ সনদ সম্পর্কীত জ্ঞান ব্যতীত হাদীস সন্ধানকারী ব্যক্তি অন্ধকারে কাষ্ঠ আহরনকারীর মতো। সে কাষ্ঠের বোঝা বহন করে অথচ বোঝার

[93] হাদীস সংকলনের ইতিহাস – মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং – ৬৩৪ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে এমন একটি বিষধর সাপ আছে যে তাকে তার অজান্তে দংশন করে থাকে।

উপরে উল্লেখিত আলোচনায় রিজাল পদ্ধতির মাধ্যমে হাদীসের প্রথম অংশ সনদ বা রেওয়াতের যাচাই-বাছাই ও সমালোচনা পরিস্ফুট হয়েছে। হাদীসের দ্বিতীয় এবং মূল অংশ মতন – এর বিশুদ্ধতা ও যাচাই – বাছাই করা অপরিহার্য। অর্থাৎ ইসলামী চিন্তাবিদ এবং হাদীস শাস্ত্রের গৌরব মুহাদ্দিসও উসুলবিদগণ মতনকেও যুক্তি – তর্ক ও বাস্তবতার আলোকে যাচাই – বাছাই করা হয়। আর এরূপ যাচাই – বাছাই করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। যেমনঃ ইফকের ঘটনার সাথে কিছু সংখ্যক মুসলমানও সন্দেহ প্রবন হয়ে পড়লে তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

"তোমরা যখন সে কথা শুনতে পেলে তখন তোমরা (শুনেই) কেন বললেন যে, এ ধরনের কথা বলা আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। আল্লাহ মহান! এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা ও বিরাট দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়"[94]। অর্থাৎ সংবাদ শনেই তাৎক্ষনিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন না করে শ্রুত সংবাদ সম্পর্কে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করার সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে এই

[94] সূরা নূর, আয়াত নং - ১৬

আয়াতে। মূল হাদীসটি সাধারন জ্ঞান বাস্তবতা, কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী কি না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিবেচনার মানদন্ডে উত্তীর্ণ কি না তা দেখা দরকার। মিরাজের ঘটনা সাধারনের বোধগম্য না হলেও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের পরিপন্থী নয়। অধিকন্তু ঘটনাটির বিবরণ কুরআনে উল্লেখ আছে এবং মিরাজের হাদীস ২৫ জন সাহাবী ও শত তাবেয়ী হতে বর্ণিত। সুতরাং হাদীসটি সত্য ও বিশুদ্ধ হাদীসরূপে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণীয়। ইবনুল জাওযী ও মোল্লা আল কারী হানাফী (রহঃ) দেরায়াতগত (বুদ্ধিভিত্তিক বিশ্লেষন) প্রক্রিয়ার যে বিষয়গুলির ওপর হাদীসের যাচাই – বাছাই ও নিরীক্ষা করেছেন তা নিম্নরূপঃ

(১) যে হাদীস ভাষাগত অলংকারের দূষিত তা হাদীস নয়। কেননা রাসূল (সাঃ) ছিলেন আরবী সাহিত্যে সুপন্ডিত ও সুসাহিত্যিক।

(২) সাধারন জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবর্জীত হাদীস।

(৩) যে হাদীস শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট নীতি ও উসুলের বিপরীত।

(৪) যে হাদীস বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত।

(৫) যে হাদীস প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত।

(৬) যে হাদীস ইজমায়ে হাদীসের বিপরীত।

(৭) যে হাদীস লঘু অপরাধে গুরুদন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৮) যে হাদীসের সামান্য আমল বিরাট পুরস্কারের ঘোষনা রয়েছে।

(৯) যে হদীসের বক্তব্য মূলতঃ অর্থহীন। যেমন যাবেহ ছাড়া কদু না খাওয়া।

(১০) যে হাদীস রাবী সাক্ষাৎ লাভ করে নি এমন লোক থেকে বর্ননা করেন। অন্যদিকে এ হাদীস অপর কোনো রাবীও তার নিকট থেকে বর্ননা করেনি।

(১১) হাদীসের বিষয়বস্তু এমন যে সম্পর্কে অবহিত হওয়া সকল মুসলমানদের কর্তব্য অথচ বর্ণিত হাদীসটি রাবী ছাড়া আর কেউ অবগত নহে। যেমন রাসূল (সাঃ) কর্তৃক লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে হযরত আলী (রাঃ) এর গাদীরেখুমে খলীফা হওয়ার ঘোষনা করা।

(১২) যে হাদীস এমন কথা রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে অনেক লোক জানতে পারতো অথচ ঐ রাবী ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়।

(১৩) যে হাদীসের বর্ননা অতিরঞ্জিত।

(১৪) যে হাদীসের কথা নবীগণের কথার অনুরূপ নয়।

(১৫) যে হাদীসের অসাম্ভবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমান বিদ্যমান। যেমন উজ বিন ওনক সম্পর্কীয় হাদীস। (৩ হাজার হাত, ৭০ হাত লম্বা লোক)।

(১৬) কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরার অতিরঞ্জিত ফযিলতের আমল সম্পর্কীয় হাদীস ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, হাদীস সহীহ ও গায়রে সহীহ হওয়ার উল্লেখিত দুটি পন্থা রেওয়ায়েতগত (আসমাউর রিজাল) ও দেরায়েতগত অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত ও বুদ্ধিবৃত্তিক। এ দু'পন্থায় হাদীস উত্তীর্ণ হলে হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য হবে।

হাদীসের প্রকারভেদঃ

বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে হাদীস কয়েক প্রকারের রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন হাদীস তিন প্রকারের। কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত যেসব বিষয়ে নবী করীম (সাঃ) নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ দান করেছেন তা প্রথম প্রকারের হাদীস। কুরআন মজীদে মোটামুটি ও অবিস্তৃতভাবে অনেক আইন ও বিধানের উল্লেখ রয়েছে, রাসূলে করীম (সাঃ) তার বিস্তৃত রূপ পেশ করেছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেক সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বিষয়কে তিনি মুসলিমদের সম্মুখে নিজ ভাষায় বিস্তারিত ও সুস্পষ্টরূপে তুলে

ধরেছেন। এটি দ্বিতীয় প্রকারের হাদীস। আর তৃতীয় প্রকারের হচ্ছে সেসব হাদীস, যাতে রাসূলে করীম (সাঃ) কুরআনে অনুল্লিখিত অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এই তিন প্রকারের হাদীস যেহেতু আল্লাহর নিকট হতে রাসূলে করীমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞানের আকর, সে কারণে এটি সবই কুরআনের মতই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য। [কিতাবুর রিসালা-ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)]। এই পর্যায়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর আলোচনার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত ও হাদীস-গ্রন্হসমূহে সংকলিত হাদীসসমূহ শরীয়াতী হুকুম গ্রহণের দৃষ্টিতে দুই প্রকারের। রিসালাতের বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলে করীম (সাঃ) যত কথাই বলেছেন, তা প্রথম প্রকারের। ‘রাসূল যা দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক’- সূরা হাশর, ৭নং আয়াতটিতে এ প্রকারের হাদীস সম্পর্কেই আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। পরকাল ও মালাকুতী জগতের আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন, তাও এই প্রকারের হাদীস। এই হাদীসসমূহ ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান হতে নিঃসৃত। শরীয়াতের বিধি-বিধান, ইবাদতের নিয়ম-প্রণালী এবং সমাজ ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা ও এর পালনের জন্য উৎসাহ দান সম্পর্কিত হাদীসসমূহও এই পর্যায়ের। তবে এটি কিছু অংশ সরাসরি ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং কিছু অংশ স্বয়ং নবী করীমের ইজতিহাদ। অবশ্য নবী করীম (সাঃ) - এর রায় কখনো ভুলের

উপর স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। তাঁর ইজতিহাদ আল্লাহর হুকুমের উপরই ভিত্তিশীল হবে, এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা প্রায়ই এমন হত যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে শরীয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানিয়ে দিতেন; শরীয়াত প্রণয়ন, তার সহজতা বিধান ও আদেশ-নিষেধ নির্ধারণের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতেন; নবী ওহীসূত্রে জানা এই আইন ও নিয়ম অনুযায়ী ওহীর সূত্রে লব্ধ উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাখ্যা দান করতেন। যেসব যুক্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় বিষয় বিনা শর্তে পেশ করেছেন, যার কোন সময় বা সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নেই – যেমন উন্নত ও খারাপ চরিত্র-এটিও রিসালাতের দায়িত্ব পালন পর্যায়ের এবং এর অধিকাংশই ওহীর উৎস হতে গৃহীত। তা এই অর্থে যে, আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলকে সমাজ ও জনকল্যাণের নিয়ম-কানুন জানিয়ে দিয়েছেন, নবী সে নিয়ম-কানুন হতে যুক্তি বা দলিল গ্রহণ করেছেন এবং তাকে মূলনীতি হিসাবে পেশ করেছেন। আমলসমূহের ফযীলত, আমলকারীদের গুণ ও প্রশংসামূলক হাদীসও এই পর্যায়ে গণ্য। আমার মতে এর আধিকাংশই ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত, আর কিছু অংশ তাঁর ইজতিহাদের ফসল। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীস রিসালাতের দায়িত্ব পালন পর্যায়ের নহে।

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি একজন মানুষ মাত্র, অতএব তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমি যখন কোন জিনিসের আদেশ করি, তখন তা তোমরা গ্রহণ করিও- পালন কর। আর যদি আমার

নিজের মতে কোন কাজের আদেশ করি তবে মনে রাখ, আমি একজন মানুষ মাত্র। এ বাণীতে রাসূলে করীম (সাঃ) দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসের কথাই বুঝিয়েছেন। মদীনার মুসলমানদিগকে অত্যাধিক ফসল লাভের আশায় পুরুষ খোরমা গাছের ডাল স্ত্রী খোরমা গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে দেখে নবী করীম (সাঃ) 'তা না করলে কোন ক্ষতি হবে না' বলে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ তোমরা এটি না করলে সম্ভবত ভালই হত। কিন্তু এটি না করার দরুন পরবর্তী বছর অত্যন্ত কম পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। তখন নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ 'আমি একটা ধারণা পোষণ করতাম, এবং তাই তোমাদেরকে বলেছিলাম (ধারণার ভূল হলে) তোমরা সেজন্য দোষ ধর না। কিন্তু আমি যখন আল্লাহর তরফ হতে কোন কিছু বর্ণনা করি, তখন তোমরা তা অবশ্যই গ্রহণ করবে। কেননা আমি আল্লাহর সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলি না'। [এই কয়টি হাদীসই মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে]। চিকিৎসা ও দ্রব্যগুণ ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সাঃ) যা কিছু বলেছেন, তাও এই পর্যায়ের। তিনি বলেছেনঃ হালকা সাদা কপোল বিশিষ্ট গাঢ় কৃষ্ণ ঘোড়া তোমরা অবশ্যই রাখবে। এটি রাসূলের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে বলা কথা। রাসূল (সাঃ) অভ্যাসবশত যা করতেন - ইবাদত হিসাবে নয় কিংবা যা ঘটনাবশত করেছেন - ইচ্ছামূলকভাবে নয়, তার কোন শরীয়াতী ভিত্তি নাই। হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) - এর

নিকট একদল লোক হাদীস শ্রবণের ইচ্ছ প্রকাশ করলে তিনি বলেছেনঃ ‘আমি রাসূলের প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত তখন আমাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন, আমি গিয়ে তা লিখে রাখতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, আমরা যখন দুনিয়ার বিষয় আলোচনা করতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে দুনিয়ার কথা বলতেন। আর যখন পরকালের কথা বলতাম, তিনিও আমাদের সাথে পরকালের কথা বলতেন। আমরা যখন খানাপিনার কথা বলতাম তিনিও আমাদের সাথে তাই বলতেন। এখন আমি কি তোমদেরকে রাসূলের এইসব হাদীস বলব? এ কথাটি এ প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত রাসূলের সময়কালীন আংশিক কল্যাণের জন্য অনেক ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছিল। সমস্ত মানুষের জন্য তা কোন চিরন্তীন বিধান ছিল না। এর দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন কোন বাদশাহ এক সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করে এর কোন নিদর্শন ঠিক করে দেয়। এই দৃষ্টিতে হযরত উমর ফারূক (রাঃ) বলেছেনঃ রমল করার আমাদের কি প্রয়োজন? এটি আমরা এমন এক শ্রেণীর লোকদেরকে দেখাবার জন্য পূর্বে করিতাম, যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, ‘রমল’ করার অন্য কারণও থাকতে পারে এবং এটি কিছুতেই পরিত্যাজ্য নয়। যুদ্ধের বিশেষ পদ্ধতি এবং বিচার ফয়সালার বিশেষ রীতিনীতি ও ধরণ-

ধারণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহও এই পর্যায়ের গণ্য[95]। যথাযথভাবে সত্য প্রমাণিত হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। খেজুর গাছ সম্পর্কিত আরব দেশের প্রচলিত নিয়ম সম্পর্কে রাসূলের নিষেধবাণীও এই পর্যায়েরই কথা ছিল। ইমাম নববী এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ বিশেষজ্ঞদের মতে নবীর এই কথা কোন বিষয়ে সংবাদ দানের পর্যায়ভুক্ত ছিল না; বরং এটি তাঁর একটি ধারণামাত্র ছিল। যেমন এই প্রসঙ্গের হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা এটিও বলেছেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে নবী করীমের মত ও ধারণা আন্যান্য মানুষের মত ও ধারণার মতই।

কাজেই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া - অবাস্তব প্রমাণিত হওয়া- কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং এতে কোন ক্রটি বা দোষের কারণ নাই[96]।

রাসূলের ইজতিহাদ সম্পর্কে এই কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, যেসব বিষয়ে ওহী নাযিল হয় নাই, সে বিষয়ে রাসূলে করীম (সাঃ) ইজতিহাদ করেছেন। এই ইজতিহাদ যদি নির্ভূল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হতে দিয়াছেন; আর যদি তাতে মানবীয় কোন ভূল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ সে বিষয়ে রাসূলকে

[95] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত

[96] নববী, শরহে মুসলিম ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা

জানিয়ে দিয়াছেন ও সতর্ক করে দিয়াছেন। কাজেই রাসূলের ইজতিহাদও সুন্নাতের পর্যায়ে গণ্য। হাদীসে এ সব ইজতিহাদের বিবরণ রয়েছে।

অতএব হাদীস ও রাসূলের ইজতিহাদে কোন মৌলিক পার্থক্য বা বিরোধ নাই। কিন্তু দ্বীন ও শরীঅত সম্পর্কিত ব্যাপারে- আকীদা, ইবাদত, নৈতিক চরিত্র, পরকাল, সামাজিক ও তমদ্দুনিক বিষয়ে- রাসূলে করীম (সাঃ) যা কিছু বলেছেন, তা সবই ওহীর উৎস হতে গৃহীত, তা চিরন্তন মূল্য ও স্থায়ী গুরুত্ব সম্বলিত এবং তা কোন সময়ই বর্জনীয় নয়[97]।

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صَحَابِيٌّ): যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে সাহাবী বলে।

সর্বোচ্চ হাদীস বর্ণনাকারী কয়েকজন সাহাবীর নাম নিম্নে ছকে দেয়া হলোঃ-

[97] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১ম খণ্ড

সর্বোচ্চ হাদীস বর্ণনাকারী কয়েকজন সাহাবীর নাম:

কিতাবুস সিত্তা গ্রন্থাবলী ও এর সংকলকদের নাম				
ক্রঃ নং:	সাহাবীর নাম	ওফাত	জীবন কাল	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা
১	হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রকৃত নাম আবদুর রহমান	৫৭ হিজরী	৭৮ বছর	৫৩৭৪ টি
২	উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)	৫৮ হিজরী	৬৭ বছর	২২১০টি
৩	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)	৬৮ হিজরী	৭১ বছর	১৬৬০টি
৪	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)	৭০ হিজরী	৮৪ বছর	১৬৩০টি
৫	হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)	৭৪ হিজরী	৯৪ বছর	১৫৪০টি

“সাহাবী” (صَحَابِىٌّ) শব্দটি আরবী ভাষার ‘সুবহত’ শব্দের একটি রূপ। একবচনে ‘সাহেব’ ও ‘সাহাবী’ এবং বহুবচনে ‘সাহাবা’ ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সংঙ্গী, সাথী, সহচর, এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামী পরিভাষায় ‘সাহাবা’ শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মহান সংঙ্গী-সাথীদের বুঝিয়েছেন। ‘সাহেব’ শব্দটির বহুবচনের আরো কয়েকটি রূপ আছে। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সংঙ্গী-সাথীদের বুঝানোর জন্য

‘সাহেব’ এর বহুবচনে ‘সাহাবা’ ছাড়া ‘আসাহাব’ ও ‘সাহব’ ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবন হাজার (রহঃ) ‘আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা’ গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে বলেনঃ ইন্নাস সাহাবীয়্যা মান লাকিয়ান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মু’মিনান বিহি ওয়া মাতা আলাল ইসলাম’- অর্থাৎ সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ’র (সাঃ) প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্তারোপঃ উপরোক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ঈমান (২) ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (আল-লিকা) (৩) ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাউত’আলাল ইসলাম)।

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন সাহাবী বলে গণ্য হবে না যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষাৎ তো লাভ করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি। যেমনঃ আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ মক্কার কাফিরবৃন্দ।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি হুজুরের তো সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু অন্ধত্ব বা এ জাতীয় কোন অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে

বঞ্চিত হয়েছেন। যেমনঃ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ)।

তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত 'আলাল ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবীদের দলে শামিল হবেন, যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূল্লাহর (সাঃ) সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। এটাই সর্বাধিক সঠিক মত। যেমনঃ হযরত আশয়াস ইবন কায়েস (রাঃ) ও আরো অনেকে। হাদীস বিশারদগণ আশয়াস ইবন কায়েসকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগ) হয়ে যান এবং হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফতকালে আবার ইসলামে ফিরে আসেন। শেষোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবী বলে গণ্য হবে না যে ইসলাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, কিন্তু পরে মুরতা অবস্থায় মারা গেছে। যেমনঃ আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরাত করার পর খৃষ্টান হয়ে যায় এবং সেখানে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, রাবীয়া ইবন উমাইয়া প্রমুখ মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ। সাহাবী

হওয়ার জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ শর্তটি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহচর্য বেশী বা অল্প দিনের জন্য হউক, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক, রাসূলুল্লহ সংগে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, এমন কি যে ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তের জন্য রাসূলুল্লহ (সাঃ) সাক্ষাত লাভ ঘটেছে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এমন সকলেই সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি ঈমান আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষা লাভ করেছে, তারা সাহাবী নয়। আর বুহাইরা লাভের পূর্বে তাঁর সাক্ষা লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন- এমন ব্যক্তিদের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম মনীষীরা তাঁদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেনি। উল্লেখিত সংজ্ঞার শর্তাবলী জ্বীনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জ্বীনরাও সাহাবা ছিলেন। কুরআন মজিদে এমন কিছু জ্বীনের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। নি:সন্দেহে তারা অতি মর্যাদাবান সাহাবা ছিলেন। সাহাবীর উল্লেখিত সংজ্ঞাটি ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলসহ অধিকাংশ পন্ডিতের নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে

বিবেচিত। অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। যেমন কেউ সাক্ষাতের (আল-লিকা) স্থলে চোখে দেখার (রুইয়া) শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু তাতে এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যাঁরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমনঃ আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ)। অথচ তিনি অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেনঃ সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, এক বা দু'বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহচর্য অথবা তাঁর সাথে দু'একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ। কিছু সংখ্যক উলামায়ে উসূল ও উলামায়ে ইলমুল কালাম এর মতে, সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ সাহচর্য ও সুন্নাতে নববীর (সাঃ) অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি। কেউ কেউ আবার বয়:প্রাপ্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। একদল আলিমের মতে যে ব্যক্তি বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর এক নজর রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখেছেন, তিনি সাহাবী। আর যিনি বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখেছেন, তিনিও সাহাবী। তবে এ হিসেবে যে, রাসূল (সাঃ) তাকে দেখেছেন। তিনি রাসূলকে (সাঃ) দেখেছেন সে হিসাব নয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে এম ব্যক্তি সাহাবী নন, বরং তাবেঈর মর্যাদা লাভ করবেন। প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ইনতিকালের পর দাফনের পূর্বে তাকে দেখে থাকেন, যেমনটি ঘটেছিল প্রখ্যাত আরবী কবি 'আবু জুয়ায়িব

আল-হুজালীর' ক্ষেত্রে- তাঁর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে? আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এমন ব্যক্তি সাহাবীদের দলভুক্ত হবেন না। ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহচর্য বা 'সুবহাত' এমন একটি মর্যাদা, যার সমকক্ষ আর কোন মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহবতের মর্যাদা ছাড়াও দ্বীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করা, ইসলামের তাবলীগ ও শরীয়তের খিদমতের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবায়ে কিরামের একটি পবিত্র ও উচ্চ মার্যাদা আছে। এ কারণে কোন কোন আলিমের মতে সাহাবীদের হেয় প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি যিনদীক। আবার কারো মতে, এটা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাহাবীদের মর্যাদাঃ সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক হোন না কেন কেউই একজন সাধারণ সাহাবীর মার্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা একমত। এই সাহাবীরাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পরবর্তী উম্মাত আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসূলের পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা, দ্বীনের সবকিছুই একমাত্র তাদেঁরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং

এই প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে অথবা তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের সবকিছুই একমাত্র তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এই প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস্য দানা বেঁধে ওঠে। হাফেজ ইবন আবদিল বার সাহাবীদের মার্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুহবত ও তার সুন্নাতের হিফাজত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালা এইসব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা 'খায়রুল কুরুন' ও 'খায়রু উম্মাতিন' এর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

হাফেজ আবু বকর ইবন খতীব আল-বাগদাদী বলেনঃ উল্লেখিত ভাব ও বিষয়ের হাদীস ও আখবারের সংখ্যা অনেক এবং সবই 'নাসসুল কুরআনের' ভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থা তাতে সাহাবীদরে সুমহান মার্যাদা, আদালাত, পবিত্রতা, ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক তাদের আদালতের ঘোষণা দানের পর পৃথিবীর আর কোন মানুষের সনদের মুখাপেক্ষী তাঁরা নন। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) তাঁদের সম্পর্কে কোন ঘোষণা না দিলেও তাঁদের হিজরাত, জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর রাহে ধন-সম্পদ ব্যয়, পিতা ও সন্তানদের হত্যা, দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ, ঈমান ও ইয়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি কর্মকান্ড এ কথা প্রমাণ করতো যে, আদালাত, বিশ্বাস, পবিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ন্যায়

পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁরা ছিলেন সকলের থেকে উত্তম। কোন কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসূল (সাঃ) তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পন্ডিতদের অনেকে সাহাবীদের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবন হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইবন হাযামের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ 'আস-সাহাবাতু কুল্লুহুম মিন আহলিল জান্নাতী কাতআন- সাহাবীদের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী"। রাসুল (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের গালি দেওয়া বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ, আল্লাহ! আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করো না। তাদেরকে যারা ভালবাসে, আমার মুহাব্বতের খাতিরেই তারা ভালবাসে, আর যারা তাদেরকে হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে"।

সাহাবী চিনবার উপায়ঃ প্রশ্ন হতে পারে, কে সাহাবী এবং কে সাহাবী নয়, তা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে? 'রিজাল ও হাদীস' শাস্ত্র বিসারদগণ এ ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন।

প্রথমঃ 'খবরে তাওয়াতুর' অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতিটি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা বা সাক্ষ্য দেবে যে তিনি সাহাবী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, 'খবরে মাশহুর' অর্থাৎ প্রতিটি যুগের প্রচুর সংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক সাহাবী।

তৃতীয়ত: কোন একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।

চতুর্থত: কোন একজন প্রখ্যাত তাবেঈর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।

পঞ্চমত: কেউ নিজেই যদি দাবী করেন, আসি সাহাবী। সে ক্ষেত্রে দু'টি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা দেখতে হবে। ১) 'আদালত' বা ন্যায়নিষ্ঠতা। এটি সাহাবীদের বিশেষ গুন। সাহাবীয়্যাতের দাবীদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে। ২) 'মুয়াসিরাত' বা সমসাময়িকতা। সাহাবীদের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। কারণ, রাসূল (সাঃ) তাঁর ইনতিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন, আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে, আজ থেকে একশ বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না। সুতরাং হিজরী ১১০ সনের পরে কেউ জীবিত থাকলে এবং সে সাহাবী বলে দাবী করলে, 'রিজাল'শাস্ত্র বিশারদরা তাকে সাহাবী বলে মেনে নেননি। অনেকে এমন দাবী করেছিলেন; কিন্তু সে দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাদের জীবনীও 'রিজাল' শাস্ত্রে লিখিত আছে। এ ছাড়াও সাহাবী নির্ধারণের আরো কিছু নিয়ম নীতি মুহাদ্দিসগণ অনুসরণ করেছেন। সাহাবীদের সংখ্যাঃ সাহাবীদের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম আবু যারআ আর রাযী

বলেছেন, রাসূল (সাঃ) যখন ইনতিকাল করেন, তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। আবু যারআর একথার সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবন মালিকের একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মানুষের সংখ্যা অনেক। কোন দফতর বা দিনওয়ান তা গণনা করতে পারবে না"।

সাহাবীদের যথাযথ হিসেব কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করে। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী। তাহের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্যা সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফজীলত

বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত হলোঃ "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল : তার সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও" (সূরা আল-ফাতাহ : ২৯)

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা হবে কামিয়াবী"। (সূরা আত-তাওবা : ১০০)। "এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে (মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও"। (সূরা আল-হাশর: ৮-৯) এ আয়াতে প্রথমে মুহাজির ও পরে আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে।

এমনিভাবে সূরা আল-ফাতাহ- ১৮, সূরা আল-ওয়াকিয়া- ১০, এবং সূরা আল-আনফালের ৬৪ নাম্বার আয়াতসমূহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা এসেছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও তাঁর সাহাবীদের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কমস হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী। তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে"। "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দেবেনা, কসম নেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যায় করো তবুও তাদের যে কোন একজনের 'মুদ' বা তার অর্ধেক পরিমাণ যবের সমতূল্য হবে না"। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তার ওপর আমল করতে হবে। তা তরক করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আল্লাহর কিতাবে কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাতে খোঁজ করতে থাক। যদি তাতেও না পাওয়া যায় তাহলে আমার

সাহাবীদের কথায় তালাশ করতে হবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ। তার কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে। আর আমার সাহাবীদের পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ"। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আমার পরে আমার সাহাবীদের পারস্পরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে আমার 'রব' প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠালেন: হে মুহাম্মদ, তোমার সাহাবীরা আমার কাছে আকাশের তারকা সদৃশ। তারকার মত তারাও একটি থেকে অন্যটি উজ্জ্বলতর। তাদের বিতর্কিত বিষয়ের কোন বিয়য়ের কোন একটিকে যে আঁকড়ে থাকবে, আমার কাছে সে হবে হিদায়াতের ওপরে"।

ইমাম শাফেঈ হযরত আনাস ইবন মালিকের সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ আমাকে ও আমার সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। তাদের সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে আমার আনসার বানিয়ে দিয়েছেন। শেষ যামানার এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা তাদের অবমাননা করবে।

সাবধান, তোমরা তাদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে করবে না তাদের কাছে ছেলে-মেয়ে বিয়েও দেবে না। সাবধান, তাদের সাথে নামায পড়বে

না, তাদের জানাযাও পড়বে না। তাদের ওপর আল্লাহ লা'নত। মিশকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন আমার উম্মাতের মধ্যে একটি ফিরকাই নিশ্চিত জান্নাতী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কে? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অন্য একটি হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সাহাবীদের স্থান তেমন, যেমন খাবারের মধ্যে লবণের স্থান।

সাহাবীদের সমাজঃ সাহাবীদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। তাঁদের কর্মকান্ড মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা স্বরূপ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ ও সদাচারণ তুলনাবিহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। গরীব ও মুহতাজ শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা সমসময় অগ্রাধিকার দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজীরবিহীন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইত্তেবা বা অনুসরণ ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি রেখেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সেই সমাজের প্রথম নমুনা। রাসূল পাকের

(সাঃ) সুহবতের বরকতে তাঁরা মহান মানবতার বাস্তব রূপ ধারণ করেছিলেন।

‘আদল, তাকওয়া, দিয়ানাত, ইহসান এবং খাওফে খোদার তাঁরা ছিলেন সমুজ্জ্বল প্রতীক। তাঁদের মধ্যে এই অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের আগমন ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করা ও মানব জাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা বিশ্বাসী রূপে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। পবিত্রতা ও নিষ্কুলতা তাঁদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, হক ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁরা যেমন নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করতেন, তেমন মনে করতেন অন্যদেরকেও। তাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্বেও নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়-বন্ধুদের শরয়ী বিধানের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেনি, বাঁচাতে চেষ্টাও করেননি। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনে হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অনুসরণ করেছেন, তার নির্দেশ পালন করেছেন এবং ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ে তারা তার শরণাপন্ন হয়েছেন। তারা রাসূলের এত অনুসরণ করতেন যে, কোন কারণ ও হিকমত জানা ছাড়াই তিনি যা করতেন তারা তাই করত, তিনি যা পরিহার করতেন তারাও তা পরিহার করত। যেমন ইমাম বুখারী ইব্

ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বর্ণের আঙটি পরিধান করেছিলেন, ফলে লোকেরাও স্বর্ণের আঙটি পরিধান করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা এ বলে নিক্ষেপ করেন: "আমি কখনো তা পরিধান করব না, ফলে লোকেরাও তাদের আঙটি ফেলে দেন"।[98]

ইমাম আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে ছিলেন, হটাৎ তিনি জুতো খুলে বাম পাশে রেখে দেন। যখন লোকেরা তাকে দেখল, তারাও তাদের জুতো নিক্ষেপ করল। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করে বলেন: তোমরা কেন তোমাদের জুতো নিক্ষেপ করেছ, তারা বলল: আমরা আপনাকে দেখেছি আপনি জুতো নিক্ষেপ করেছেন, তাই আমরাও আমাদের জুতো নিক্ষেপ করেছি। তিনি বললেন: জিবরীল (অঃ) আমার নিকট এসে বলল যে, জুতোতে ময়লা রয়েছে"।[99] মোটকথা ঈমান ও বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক যোগ্যতাকে আলোকিত করে দিয়েছিল। তাঁরা খুব অল্প সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক অংশ প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁদের সামরিক ও সাংগঠনিক

[98] বুখারি, ৫৮৬৭।

[99] আবু দাউদ, ৬৫০।

যোগ্যতার ভুরিভুরি নজীর ইতিহাসের পাতায় বিদ্যামান। সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ সমাজের অনুরূপ সমাজ যদি আজ আমরা গড়তে চাই, আমাদের অবশ্যই তাঁদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁদের মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কুরআনী সমাজ গড়ার যে চেতনা দেখা যাচ্ছে, তাকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হলে সাহাবীদের জীবনীর ব্যাপক চর্চা হওয়া দরকার। তাঁদের জীবন থেকেই দিক নির্দেশনা নিতে হবে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাঙালী মুসলিম সমাজে সাহাবীদের জীবনের চর্চা খুব কম। এখানে পীর-আওলিয়ার জীবনের কাল্পনিক কিসসা-কাহিনী যে পরিমাণে আলোচিত হয় তার কিয়দাংশও সাহাবীদের জীবনীর আলোচনা হয়না। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

তাবিয়ীন (تَابِعِيْنَ): যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিয়ীন বলে। অর্থাৎ যিনি বা যারা ঈমানের সাথে কোন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন, তার নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং সাহাবীদের অনুকরণ করেছেন তাদেরকে ‘তাবিয়ীন’ বলে।

কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে সাহাবী থেকে অন্তত একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞাঃ তাবেয়ীনদের সম্বন্ধে প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হলোঃ-

উলুমুল হাদীস এর পরিভাষায়ঃ- তাবেয়ী হচ্ছেনঃ যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন তিনি তাবেয়ী। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, এর জন্য দীর্ঘদিনের সঙ্গ শর্ত নয়। অতএব, যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই তাবেয়ী। তাবেয়ীর মধ্যে উত্তমতার স্তরভেদ রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) ‘নুখবাতুল ফিকার’ (৪/৭২৪) গ্রন্থে বলেনঃ তাবেয়ী হচ্ছেন- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন।

ইবনে কাছির (রহঃ) বলেনঃ- খতিব আল-বাগদাদী বলেনঃ তাবেয়ী হচ্ছেন যিনি সাহাবীর শিষ্য ছিলেন। হাকেমের বক্তব্যের দাবী হচ্ছে- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন তাকে তাবেয়ী বলা যাবে। তাঁর থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যদিও সাহাবীর শিষ্যত্ব না পেয়ে থাকুক না কেন? ইরাকী (রহঃ) তাঁর ‘আলফিয়া’ (পৃষ্ঠা-৬৬) তে বলেনঃ তাবেয়ী হচ্ছেন- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। মূলতঃ তাবেয়ীন হলেন তারা- 'যারা আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদেরকে দেখেছেন'। তাবেয়ীনরা সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহন

করতেন। তাবেয়ীনদের যুগে এসে হাদীস সংকলনের কাজ আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। সাহাবাদের যুগে হাদীস মুখস্তকারীদের সংখ্যাই ছিল বেশী; কম সংখ্যক সাহাবীই হাদীস লিখে রাখতেন। কিন্তু তাবেয়ীদের যুগে এসে এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। প্রতিটি মজলিসে হাদীস মুখস্ত করার সাথে সাথে হাদীস লিখনের কাজও গুরুত্ব পায়। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম তাদের শিষ্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ- "তোমরা লিখনের মাধ্যমে ইলমকে বেঁধে রাখ।" অনুরূপ বাণী উমর (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। এছাড়া বিশিষ্ট তাবেয়ীন ইসলামের পঞ্চম খলিফা উমর বিন আব্দুল আযিয (মৃত:-৯৯হিঃ) তাঁর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেন। তিনি আবু বকর ইবনে হাযম, ইবনে শিহাব যুহরীসহ বড় বড় মুহাদ্দিসদের কাছে চিঠি লেখেন- তারা যেন হাদীস সংকলন করেন।

আবু বকর ইবনে হাযমকে লেখেন- "খুঁজে খুঁজে রাসূলের বাণী লিপিবদ্ধ করুন। আমার আশংকা হচ্ছে ইলম বিরান হয়ে যাবে, আলেমরা মারা যাচ্ছেন। ব্যাপক যাচাই-বাছাই করুন; শুধুমাত্র রাসূলের হাদীস হলে গ্রহন করবেন।..." ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, "উমর বিন আব্দুল আযিয আমাকে সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার আদেশ

দেন। তার আদেশে আমি একটি একটি করে লিপিকা তৈরী করেছি। এরপর তিনি তার শাসনাধীন প্রতিটি অঞ্চলে এর একটি করে কপি পাঠিয়ে দেন।"

তাবেয়ীনদের যুগে যাদের লিপিকার কথা জানা গেছে তারা হলেন-

১. ইবনে আব্বাসের ছাত্র সাঈদ ইবনে যুবাইরের লিপিকা

২. আবু হুরায়রার ছাত্র বাশির ইবনে নাহিকের লিপিকা

৩. ইবনে আব্বাসের ছাত্র মুজাহিদ বিন জাবরের লিপিকা

৪. জাবের বিন আব্দুল্লাহর ছাত্র মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন তাদরুসের লিপিকা

৫. হিশাম বিন উরউয়ার লিপিকা

৬. আউয়ুব বিন আবি তামিমা আস্ সিখতিয়ানীর লিপিকা। এ ছাড়াও রয়েছেন আরো অনেকে।

তাবে' তাবিয়ীন (تَابِعُ تَابِعِيْنَ): একই নিয়ম অনুযায়ী যিনি বা যারা তাবেয়ীদের সাহচর্য লাভ করেছেন বা একটু সময়ের জন্যেও দেখেছেন, তাদের অনুকরণ অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তারাই 'তাবে' তাবিয়ীন'।

প্রখ্যাত আলেমদের অভিমতঃ তাবে তাবেয়ীন সম্বন্ধে প্রখ্যাত আলেমদের অভিমত নিচে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হলোঃ-

ইমাম বুখারী (৩৬৫১) ও ইমাম মুসলিম (২৫৩৩) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে - আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা। এরপর তাদের পরে যারা। অতঃপর এমন কওম আসবে যাদের সাক্ষ্য হলফের পিছনে, হলফ সাক্ষ্যের পিছনে ছুটাছুটি করবে।"

ইমাম নববী বলেনঃ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজন্ম হচ্ছে-সাহাবায়ে কেরাম। দ্বিতীয় প্রজন্ম হচ্ছে- তাবেয়ীগণ। তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছে- তাবে-তাবেয়ীগণ। [ইমাম নববী রচিত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১৬/৮৫) থেকে সমাপ্ত]।

হাফেয ইবনে হাজার বলেনঃ হাদীসের বাণীঃ "এরপর তাদের পরে যারা" অর্থাৎ তাদের পরের প্রজন্ম। তারা হচ্ছেন - তাবেয়ীগণ। "এরপর তাদের পরে যারা"। তারা হচ্ছেন - তাবে-তাবেয়ীগণ। ফাতহুল বারী (৭/৬) থেকে সমাপ্ত। ক্বারী (রহঃ) বলেনঃ সুয়ুতী বলেনঃ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটি অর্থাৎ প্রজন্ম বিশেষ কোন সময়সীমাতে আবদ্ধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজন্ম হচ্ছে- সাহাবায়ে কেরাম। নবুয়তের শুরু থেকে সর্বশেষ সাহাবীর মৃত্যু পর্যন্ত ১২০ বছর এ প্রজন্মের সময়কাল। তাবেয়ী-

প্রজন্মের সময়কাল ১০০ হিঃ থেকে ৭০ বছর। আর তাবে-তাবেয়ী প্রজন্মের সময়কাল এরপর থেকে ২২০ হিঃ পর্যন্ত। এ সময়ে ব্যাপকভাবে বিদআতের উদ্ভব ঘটে। মুতাযিলারা তাদের মুখের লাগাম খুলে দেয়। দার্শনিকেরা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে। দ্বীনদার আলেমগণকে "কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি" এই মতবাদ মেনে নেয়ার জন্য চাপ দেয়া হয়। এভাবে গোটা পরিস্থিতি ওলট পালট যায়। এভাবে আজ অবধি দ্বীনদারী হ্রাস পেতেই আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর বাস্তব নমুনা যেন ফুটে উঠেছে - "এরপর মিথ্যা ব্যাপক হারে দেখা দিবে"। 'মিরকাতুল মাফাতিহ' (৯/৩৮৭৮) গ্রন্থ থেকে সমাপ্ত।

অতএব, তাবে তাবেয়ীনদের যুগ ছিল বেঁচে থাকা অবশিষ্ট তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের নিয়ে। এ যুগে হাদীসের সংকলন ও গ্রন্থায়নের কাজ আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। এর আগ পর্যন্ত সময়ে হাদীস বিক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন লিপিকাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বরং কোন কোনটি ছিল ব্যক্তিগত নোট আকারে। কিন্তু এ যুগে এসে হাদীসের সংকলন সুবিন্যস্ত গ্রন্থের রূপ ধারন করে। সুবিশেষ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে হাদীসগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়।

গ্রন্থাকারে এ যুগে যারা হাদীসের সংকলন করেছেন তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন-

মক্কায়- ইবনে জুরাইজের (মৃত্যু ১৫০হিঃ)

মদীনায়- মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃ ১৫১হিঃ)

ইয়ামেনে- মা'মার বিন রাশেদ (মৃ ১৫৩ হিঃ)

বসরাতে- সাঈদ বিন আবি আরুবা (মৃ ১৫৬হিঃ)

শামে- আল আওযায়ী (মৃ ১৫৬হিঃ)

বসরাতে- শু'বাহ বিন হাজ্জাজ (মৃ ১৬০হিঃ)

কুফাতে- সুফিয়ান ছাওরী (মৃ ১৬১ হিঃ)

মদীনাতে- ইমাম মালেক (মৃ ১৭৯ হিঃ) তার গ্রন্থের নাম "মুয়াত্তা"

মিশরে – ইমাম শাফেয়ী (মৃতঃ ২০৪ হিঃ) তার গ্রন্থের নাম "মুসনাদ"। তবে এ সময়ে সংকলিত গ্রন্থগুলোতে রাসূলের বাণীর সাথে সাহাবায়ে কেরামের বাণীগুলোও মিশ্রিত ছিল।

রিওয়ায়েত (رِوَايَةٌ): হাদীস বা আসার বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়েত' বলে। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, হাদীস শরীফ বা আসার বর্ণনা করাকে রিওয়ায়েত বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন ওনাকে রাবী (رِوَايَةٌ) বলে। কোন কোন সময় হাদীস শরীফ বা আসারকেও

রিওয়ায়েত বলে। যেমন, বলা হয় এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়েত আছে।

রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ) শব্দের অর্থ হলো কোন ঘটনার বিবরন, বর্ননা, কাহিনী ইত্যাদি। বস্তুতঃ হাদীসের বর্ননাকারীগণও রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম কিংবা তাবেঈনদের কথা, কাজ অথভা অনুমোদনের খন্ড খন্ড বর্ননা পেশ করে থাকেন। এ হিসাবেই তাদের বর্ণিত বিষয়কে রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ) বলা হয়ে থাকে।

রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ) বিল মা'নাঃ অর্থের গুরুত্ব সহকারে হাদীস বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়েত বিল মা'না' বলে।

রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ) বিল লবজিহিঃ হুবহু অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) -এর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনদের মুখনিঃসৃত শব্দ সহ হাদীস বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়েত বিল লবজিহি' বলে। এ ধরনের হাদীসের গুরুত্ব অনেক বেশী।

মুনকার (مُنْكَرٌ) ও রিওয়ায়েত (رِوَايَتٌ): যে দুর্বল বর্ণনাকারী রিওয়ায়েত বা হাদীস তদপেক্ষা সর্ব বর্ণনাকারীর রিওয়াতের পরিপন্থী হয় তাকে 'মুনকার রিওয়ায়েত' বলে।

রাবী (رَاوِىْ): 'রাবী' আরবী শব্দ, বাংলা অর্থ বর্ণনাকারী ও উদ্ধৃতকারী। হাদীসের পরিভাষায় সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে

(رَاوِىْ) বলা হয়। অর্থাৎ হাদীস বা আসার বর্ণনাকারীকে ‘রাবী’ বলে। বস্তুতঃ রাবী (رَاوِىْ) শব্দটি (رَوِىْ) শব্দ থেকে উদ্ভূত ইসমে ফায়েলের সিগাহ্। এর মূল অর্থ হলো ভূমিকে পানি দ্বারা সিক্ত করা, পানি সরবরাহ করা, পানি সিঞ্চন করা, পিপাসা নিবারণ করা। তাই রাবীর অর্থ হলো পানি সরবরাহকারী, পিপাসা নিবারণকারী।

যেহেতু কোন বিষয়ের বর্ননা দানকারীরাও শ্রোতাদের ঔৎসৌক্য জনিত পিপাসা নিয়ন্ত্রণ করেন পরবর্তী ব্যবহারে (رَاوِىْ) শব্দটি বর্ননাকারীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবহারে (رَاوِىْ) শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ননাকারী, বিবরণদাতা, কাহিনীকার ইত্যাদি করা হয়ে থাকে।

হাদীসের বর্ননাকারীদেরকে এই শেষোক্ত অর্থের প্রেক্ষিতেই রাবী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় যারা কেবলমাত্র রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ননা করেন তাদেরকেই রাবী (رَاوِىْ) বলা হয়। আর অন্য কারও কাছ থেকে বর্ননা করা হলে তাকে রাবী (رَاوِىْ) বলা হয় না[100]। যেমনঃ ‘উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (রঃ) .... হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

[100] আলী মুহাম্মাদ নসরকৃত আল নাহজুল হাদীস, পৃষ্ঠা নং - ২২

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তাবে'ঈ সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, এভাবে গ্রন্থকার পর্যন্ত সবাই বর্ণনা করেন, তাই সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক ব্যক্তি রাবী[101]। উদাহরণে পেশ করা মিসওয়াকের হাদীসে কয়েকজন রাবী রয়েছেন।

দিরায়াতঃ হাদীসের মতন বা মূল বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তির কষ্টিপাথরে যে সমালোচনা করা হয় হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে দিরায়াত বলে। "এটাকে হাদীস সমালোচনা যুক্তি-ভিত্তিক প্রক্রিয়ায়ো বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। তবে এর সারকথা এই যে। এতে হাদীসের মর্মকথা টুকুতে কোন ভুল, অসত্য, অবাস্তবতা এবং কোরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী কিছু থাকলে এই পন্থার যাচাই-পরীক্ষায় তা ধরা পড়তে পারে না। অতএব কেবল মাত্র এই পদ্ধতিতে যাচাই করে কোন হাদীস উত্তীর্ণ পেলেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। এই কারণে মূল হাদীস (মতন) - হাদীসের মর্মবাণীটুকু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও

[101] উজু অধ্যায় :: সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৪ :: হাদীস ২৪৬

বিবেচনার মানদন্ডে যাচাই করার উদ্দেশ্যে এই 'দিরায়াত' প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। হাদীস যাচাই পরীক্ষার ব্যাপারে 'দেরায়াত' নীতির প্রয়োগ 'রেওয়ায়েত' নীতির মতই কোরআন ও হাদীস সম্মত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই কেবলমাত্র 'রেওয়ায়েতের উপর নির্ভরশীল কোণ কথা গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত করিতে নিষেধ করেছেন।তিনি বরং দেরায়াত নীতির প্রয়োগ করতে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উৎসাহিত করেছেন।"[102]।

যেমন- মদিনার মুনাফিকগণ হযরত আয়েশা (রাঃ) - এর নামে কুৎসা রটাচ্ছিল তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও কোন রকম বিচার বিবেচনা বাদেই তা বিশ্বাস করেন। এদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাক কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন "তোমরা যখন সে কথা শুনতে পেয়েছিলে তখন তোমরা (শুনে) কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা বলা আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। তখন বলা উচিত ছিল যে, আল্লাহ পবিত্র মহান, এ এক সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা ও বিরাট দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়,এ কথা সত্য হয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।" [সূরা নূর - ৮১ আয়াত]। এখানে বলা হচ্ছে – যখন এ ধরনের অবিশ্বাস্য সংবাদ পৌছেছিল তখনই তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া উচিৎ ছিল এবং এর প্রচার-প্রসার বন্ধ করাও জরুরী ছিল।

[102] হাদীস সংকলনের ইতিহাস - মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী।

তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জ্ঞানই দেরায়াত নীতির প্রয়োগ।

মূল নীতিসমূহঃ দিরায়াত প্রক্রিয়ার মূল নীতিগুলো হল-

১/ হাদীস-কোরআনের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত হবে না।

২/ হাদীস-মুতাওয়াতের সূত্রে প্রমাণীত সুন্নাহের বিপরীত হবে না।

৩/ হাদীস-সাহাব্যে কিরামের সুস্পষ্ট ও অকাট্য ইজমার বিপরীত হবে না।

৪/ হাদীস-সুস্পষ্ট বিবেক বুদ্ধির বিপরীত হবে না।

৫/ হাদীস-শরীয়তের চির সমর্থিত ও সর্বসম্মত নীতির বিপরীত হবে না।

৬/ কোন হাদীস বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গৃহীত হাদীসের বিপরীত হবে না।

৭/ হাদীসের ভাষা আরবী ভাষার রীতি নীতির বিপরীত হবে না। কেননা নবী করীম (সাঃ) কোন কথাই আরবী নীতির বিপরীত ভাষায় বলেন নি।

৮/ হাদীস-এমন কোন অর্থ প্রকাশ করবে না,যা অত্যন্ত হাস্যকর,নবীর মর্যাদা বিনষ্টকারী[103]।

সনদ (سَنَدٌ): হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে ও যে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় সনদ বলে। অর্থাৎ হাদীস-এর রাবীর পরস্পর বর্ণনা সূত্রকে **সনদ** বলে।

অন্যভাবে বলা যায় যে, সনদ বলতে হাদীসের সূত্র বা Reference বুঝানো হয়। হাদীসের বর্ণনাকারীদের তালিকা। এটি সাধারণত হাদীসের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়। সাধারনতঃ কোন হাদীস - এর সনদ বর্ণনা করাকে **ইসনাদ (اَسْنَادٌ)** বলে। অর্থাৎ মুখে মুখে হাদীসের সনদ আবৃতি করাকে 'ইসনাদ' বলে। কখনও কখনও ইসনাদ সনদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সনদ বা বর্ণনাকারীদের গুণগত পার্থক্যের দিক দিয়ে হাদীসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে সেই সব হাদীস, যা 'হাফেযে মুতকিন' (নির্ভূলভাবে স্মরণ রাখিতে সক্ষম হাদীসের এমন হাফেয) লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সেই সব হাদীস, যার বর্ণনাকারী অপ্রসিদ্ধ এবং স্মরণ ও সতর্কতার মধ্যম মানের লোক।

[103] হাদীসের পরিচয়, জিলহজ আলী, সুহৃদ প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং – ১১

আর তৃতীয় হচ্ছে সে সব হাদীস, যা বর্ণনা করেছে দুর্বল ও গ্রহণ অযোগ্য এবং অগ্রাহ্য লোকেরা[104]।

হাদীসসমূহের সনদভিত্তিক বিভাগ

হাদীসের সনদ - বর্ণনা পরম্পরা ধারা যে স্তর পর্যন্ত পৌঁচেছে ও তা যেভাবে পৌঁচেছে, এই দৃষ্টিতে হাদীসকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এব তার প্রত্যেকটি ভাগেরে এক একটি পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ-

১। (مرفوع) মারফূঃ যেসব হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁচেছে, যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলের কোন কথা, কোন কাজ করার বিবরণ কিংবা কোন বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলে করীম (সাঃ) হতে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়েছে এবং মাঝখান হতে একজন বর্ণনাকারীও উহ্য হয়ে যায় নাই তা 'হাদীসে মারফূ' حديث مرفوع নামে পরিচিত। মারফু মূলতঃ (رفع - يرفعَ) থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ্। এর অর্থ কোন জিনিসকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা, উপরে উঠানো। অর্থাৎ مرْفوعُ এর আভিধানিক অর্থ উঁচু, উত্তোলিত বস্তু ও

---

[104] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং – ৪৪ – ৪৬

উচ্চ শিখরে উন্নীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস সনদের সর্বশেষ ও উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়, তাই এ প্রকার হাদীসকে মারফূ‘ বলা হয়। সুতরাং, মারফু শব্দের অর্থ হবে উর্ধ্বে উত্তোলিত বা স্থাপিত। যে হাদীসের সম্পর্ক রাসূল (সাঃ) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সাথে সেগুলোকে মারফু বলে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, হাদীসটির সম্পর্ক এমন এক সত্তার সাথে স্থাপন করা হয়েছে যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ফলে হাদীসটি মর্যাদার দিক থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে কিংবা হাদীসটি সর্বোচ্চ অধিষ্ঠানে পৌঁছে গেছে।

মারফূ’ হাদীস প্রসঙ্গে আলেমদের সংজ্ঞাঃ মারফু হাদীস প্রসঙ্গে আলেমদের যে সকল সংজ্ঞা রয়েছে তার কতক অংশ নিম্নে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হলোঃ-

১। ইমাম নববী এর সংজ্ঞা দিয়াছেন - ‘মারফূ’ সেই হাদীস, যা বিশেষভাবে রাসূলের কথা-তিনি ছাড়া অপর কারও কথা নয়-বলে বর্ণিত’।

২। ইবনে সালাহ লিখেছেনঃ যে কথা রাসূলের, অপর কারও নয় - কোন সাহাবীরও নয়, তাই ‘হাদীসে মারফূ’ নামে পরিচিত। দৃষ্টান্ত

দ্বারা এটি স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। যেমন কোন সাহাবী বলিলেনঃ রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি রাসূলে করীম (সাঃ) - কে এইরূপ বলতে শুনেছে - এইরূপ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ 'হাদীস মারফূ কাওলী' নামে পরিচিত। কিংবা কোন সাহাবী বললেনঃ আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-কে এইরূপ করতে দেখিছে। এটি 'হাদীসে 'মারফূ ফে'লী' নামে পরিচিত। কেননা এটি সাহাবীর বর্ণনাতে নবী করীমের কোন কাজের বিবরণ পেশ করে বা কোন সাহাবী বললেনঃ আমি রাসূলে করীম (সাঃ) - এর উপস্থিতিতে এইরূপ কাজ করেছি কিন্তু তিনি তার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। এটি 'হাদীসে মারফূ 'তাকরীরী' নামে পরিচিত। নবী করীম (সাঃ) এর সামনে কোন কাজ করার এবং তাঁর নিষেধ না করার কথা বলা হয়েছে এই হাদীসে।

'মারফূ''র পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ 'মারফূ''র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ''নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত কথা, অথবা কর্ম, অথবা সমর্থন, অথবা তার চারিত্রিক ও শারীরিক গঠনের বর্ণনা; হোক স্পষ্ট মারফূ' কিংবা হুকমান মারফূ'। সাহাবী তার সাথে সম্পৃক্ত করুক কিংবা তাবে'ঈ কিংবা তাদের পরবর্তী কেউ, সকল প্রকার মারফূ'র অন্তর্ভুক্ত''। অতএব

মারফূ‘র সংজ্ঞায় মুত্তাসিল, মুরসাল, মুনকাতি‘, মু‘দ্বাল ও মু‘আল্লাক অন্তর্ভুক্ত, তবে মাওকুফ ও মাকতু‘ অন্তর্ভুক্ত নয়।

মারফূ‘ হাদীসের প্রকারভেদঃ মারফূ‘ দু’প্রকার: ১. স্পষ্ট মারফূ‘ ও ২. হুকমান মারফূ‘।

১. স্পষ্ট মারফূ‘: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কাজ, সমর্থন ও গুণগান ইত্যাদিকে مرفوع تصريحا বা স্পষ্ট মারফূ‘ বলা হয়। স্পষ্ট মারফূ‘ কয়েকভাগে বিভক্ত। যেমনঃ

ক. মারফূ‘ কাওলি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী।

খ. মারফূ‘ ফে‘লি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম।

গ. মারফূ‘ তাকরিরি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থন।

ঘ. মারফূ‘ সিফাতি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠনের বর্ণনা।

ক. মারফূ‘ কাওলি: যেমন, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

“নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের সাথে গ্রহণযোগ্য হয়, আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়ার জন্য যা সে উপার্জন করবে, অথবা নারীর জন্য যাকে সে বিয়ে করবে, তাহলে সে যে জন্য হিজরত করেছে তার হিজরত সে জন্য গণ্য হবে।[105]

খ. মারফূ‘ ফে‘লি: মুগিরা ইব্‌ন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওজু করিয়েছি, তিনি তার মোজার উপর মাসেহ করেছেন ও সালাত পড়েছেন”।[106]

গ. মারফূ‘ তাকরিরি: যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক দাসীকে বলেনঃ

[105] বুখারি: (১), মুসলিম: (৩৫৩৭)

[106] বুখারি: (৩৭৮), মুসলিম: (৪০৭)

«أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

"আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি বলেন: আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন: তাকে মুক্ত কর, কারণ সে মুমিন"।

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদির কথা প্রত্যাখ্যান না করে সমর্থন করেছেন, তাই বাদীর কথা তার কথা হিসেবে গণ্য। এটা তার তাকরির বা সমর্থন।

ঘ. মারফূ' সিফাতি: চারিত্রিক ও শারীরিক উভয় বিশেষণ উদ্দেশ্য। চারিত্রিক বিশেষণ যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান দিক আনন্দিত করত, তার জুতা পরিধান করায়, তার মাথার চুল আঁচড়ানোতে ও তার পবিত্রতা অর্জন করায় এবং তার প্রত্যেক অবস্থায়"।[107]

[107] বুখারি: (১৬৫)।

শারীরিক বিশেষণ যেমন, বারা ইব্ন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ

«مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ».

"লাল পোশাকে কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ বিশিষ্ট নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি। তার চুল উভয় কাঁধকে স্পর্শ করত। উভয় কাঁধের মধ্যে তফাৎ ছিল, তিনি বেটে বা লম্বা ছিলেন না"।[108]

জ্ঞাতব্যঃ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনও কর্ম, তবে অধিক স্পষ্ট করার জন্য সমর্থন পৃথক করা হয়েছে, নচেৎ কারো ধারণা হত সমর্থন তার কর্ম নয়, তাই পৃথক করা যথাযথ হয়েছে। সাহাবী কিংবা তাদের পরবর্তী কারো সমর্থন বা চুপ থাকা দলিল নয়, এ জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনকে পৃথক করা জরুরী ছিল। অনুরূপ তার কথাও কর্ম, তবে স্পষ্ট করার জন্য পৃথক করা হয়েছে।

---

[108] মুসলিম: (২৩৩৮), তিরমিযি: (৩৫৯৭)

২. হুকমান মারফূ‘: এ প্রকার হাদীস প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত নয়, তাই মওকুফ অথবা মাকতু, তবে অন্যান্য নিদর্শন প্রমাণ করে এগুলো তার থেকে প্রকাশিত, তাই হুকমান মারফূ‘ বলা হয়, যেমনঃ

এক. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে কোনো সাহাবীর এটা বলা যে, আমরা এরূপ বলতাম, অথবা এরূপ করতাম, অথবা এরূপ দেখতাম, তাহলে এ জাতীয় কর্ম হুকমান মারফূ‘, তথা সরাসরি মারফূ‘ নয়, তবে মারফূ‘র হুকুম রাখে। কারণ, সাহাবীদের এরূপ বলা প্রমাণ করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কর্ম জানতেন এবং তিনি তাদেরকে এসব কর্মের উপর স্থির রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত তাদের যুগ ছিল ওহীর যুগ, তাদের কর্মের উপর নীরবতা অবলম্বন ওহীর সমর্থন প্রমাণ করে। সমর্থন একপ্রকার মারফূ‘, তবে সরাসরি নয় তাই হুকমান মারফূ‘। যেমন, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেনঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

“ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বকরের সাথে কাউকে তুলনা করতাম না, অতঃপর ওমর অতঃপর উসমান। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাব সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থাকতাম, তাদের কারো মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করতাম না”।[109]

অনুরূপ সাহাবীর বলা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ জাতীয় কর্ম আমরা দোষণীয় মনে করিনি। অথবা তার যুগে সাহাবীগণ এরূপ করত কিংবা এরূপ বলত কিংবা এতে কোনো সমস্যা মনে করা হত না ইত্যাদি হুকমান মারফূ‘, যেমন জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেনঃ

" كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ "

“আমরা আযল করতাম, আর কুরআন নাযিল হত”।[110] তারা কুরআন নাযিলের যুগে আযল করত, কুরআন তাদেরকে আযল

---

[109] বুখারি, বাবু মানাকিবে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান রা.: (৭/৫৩-৫৪), হাদীস নং: (৩৬৯৭), মুসনাদে আবু ইয়ালা, তাবরানি ও অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনতেন, কিন্তু নিষেধ করতেন না। মুসনাদে আবু ইয়ালা: (৯/৪৫৬), হাদীস নং: (৫৬০৪), মুজামুল কাবির লি তাবরানি: (১২/২৮৫), হাদীস নং: (১৩১৩২)

[110] বুখারি: (৪৮৩৪), মুসলিম: (২৬১৮)

থেকে নিষেধ করেনি, হারাম হলে অবশ্যই কুরআন তাদেরকে নিষেধ করত, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হত, কারণ আল্লাহ হারামের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨) [النساء : ١٠٨]

"তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন"।[111]

আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাতের আধারে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরামর্শ করেছে, যা কেউ জানত না, তবে তাদের কর্ম ছিল আল্লাহর অপছন্দনীয়, তাই তিনি তাদের নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন।

এ ঘটনা প্রমাণ করে নবী যুগের আমল, যার উপর আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি বৈধ, তবে সরাসরি মারফূ' নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোচরে হয়নি।

[111] সূরা নিসা: (১০৮)

কতক আলেম বলেনঃ এরূপ হাদীস হুকমান মারফূ' নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবগতিতে হয়নি, তবে দলিল হিসেবে গণ্য, কারণ আল্লাহ তাদের সমর্থন করেছেন।

দুই. কোনো সাহাবীর বলা যে, "এরূপ করা সুন্নত", অথবা "এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে", অথবা "এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে", অথবা "অমুককে এরূপ আদেশ করা হয়েছে", অথবা "আমাদের জন্য এটা হালাল ও ওটা হারাম করা হয়েছে" ইত্যাদি হুকমান মারফূ'। কারণ, নির্দেশ দাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হালাল ও হারামকারী তিনি, সুন্নত দ্বারা তার সুন্নতই উদ্দেশ্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ

" مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ ".

"সুন্নত হচ্ছে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি যদি কুমারী নারী বিয়ে করে, তাহলে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করবে। অতঃপর বারি বণ্টন করবে। আর যখন কুমারী নারীর উপর বিধবা নারীকে বিয়ে করে, তাহলে তার নিকট তিন দিন অবস্থান করবে, অতঃপর বারি বণ্টন

করবে”।[112] এখানে সুন্নত অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেনঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সূরা ফাতেহা এবং যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করি”।[113] এখানে নির্দেশদাতা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিন. সাহাবী যদি এমন বিষয়ে সংবাদ দেয়, যাতে ইজতিহাদ ও নিজস্ব মত প্রকাশের সুযোগ নেই, যা দেখে ধারণা হয় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বলেছেন, তাহলে সাহাবির এ জাতীয় সংবাদ হুকমান মারফূ‘, যদি কিতাবি তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে সংবাদ গ্রহণ করার অভ্যাস তার না থাকে।

উদাহরণত কোনো সাহাবি সৃষ্টির সূচনা, অথবা নবী ও পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে সংবাদ দিল, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফেতনা, কিয়ামতের

---

[112] বুখারি: (৫২১২), মুসলিম: (১৪৬৩)

[113] আবু দাউদ: (১/২১৬), হাদীস নং: (৮১৮), ইব্‌ন হিব্বান হাদীসটি সহি বলেছেন: (৫/৯২), (১৭৯০)

আলামত ও কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সংবাদ দিল, অথবা কোনো আমলের নির্দিষ্ট সওয়াব অথবা নির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা দিল, যেখানে গবেষণার সুযোগ নেই, অথবা কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা দিল অথবা অপরিচিত শব্দের বিশ্লেষণ করল, যা সাধারণ অর্থের বিপরীত ইত্যাদি হুকমান মারফূ'। যেমন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ ارْكُوا (يعني أخِّروا) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: প্রতি জুমায় [সপ্তাহে] বান্দার আমল দু'বার পেশ করা হয়: সোমবার ও বৃহস্পতিবার। অতঃপর প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, তবে সে বান্দা ব্যতীত যার মাঝে ও তার ভাইয়ের মাঝে বিদ্বেষ রয়েছে। বলা হয়: তাদেরকে ত্যাগ কর, যতক্ষণ না তারা সংশোধন করে নেয়"।[114] অন্যত্র ইমাম মালিক বর্ণনা করেনঃ

أن أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.

[114] মুয়াত্তা ইমাম মালেক: (২/৯০৮), হাদীস নং: (১৭)

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন: নিশ্চয় ব্যক্তি কতক শব্দ উচ্চারণ করে, যার কোনো পরোয়া সে করে না, অথচ তার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর ব্যক্তি কতক বাক্য উচ্চারণ করে, যার কোনো পরোয়া সে করে না, অথচ তার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে উন্নীত করেন"।[115] ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (في وصف جهنم): أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنْ الْقَارِ.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি [জাহান্নামের বর্ণনা সম্পর্কে] বলেন: "তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এ আগুনের ন্যায় লাল মনে করছ? অথচ তা আলকাতরার চেয়ে কালো"।[116]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এসব বর্ণনা হুকমান মারফূ', কারণ এসব বিষয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ নেই। অধিকন্তু ইমাম মুসলিম[117] প্রথম হাদীস এবং ইমাম বুখারি[118] দ্বিতীয় হাদীস স্পষ্ট

---

[115] মুয়াত্তা ইমাম মালেক: (২/৯৮৫), হাদীস নং: (৬)

[116] মুয়াত্তা ইমাম মালেক: (২/৯৯৪), হাদীস নং: (২)

[117] মুসলিম: (৪/১৯৮৯৭)

[118] বুখারি: (১১/৩০৮), হাদীস নং: (৬৪৭৮)

মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় হাদীস সম্পর্কে বাজি[119] রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আবু হুরায়রার এ সংবাদ ওহীর উপর নির্ভরশীল, কারণ তার সম্পর্ক গায়েব ও অদৃশ্যের সাথে, তাই হুকমান মারফূ‘।

চার. হাদীস বর্ণনাকারী রাবী যদি সাহাবী সম্পর্কে বলেনঃ

يرفعه أو يَنْمِيه، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية.

তাহলে হুকমান মারফূ‘, যেমন ইমাম বুখারী বর্ণনা করেনঃ

عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «أَنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ؛ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ».

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি মারফূ‘ বর্ণনা করেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগকারীকে বলবেন: যদি তোমার দুনিয়া ভর্তি সম্পদ হয়, তুমি কি সেগুলো ফিদিয়া [মুক্তিপণ] হিসেবে প্রদান করবে? সে বলবে: হ্যাঁ, তিনি বলবেন: আমি তোমার নিকট এর চেয়ে নগন্য বস্তু চেয়েছিলাম,

---

[119] أ.د عبد الرحمن البر রচিত উসুলে হাদীসের উপর ‘একাদশ ভাষণ’।

যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, যে আমার সাথে শরীক কর না। কিন্তু তুমি শির্ক ব্যতীত ক্ষান্ত হওনি"।[120] এতে يرفعه শব্দ হুকমান মারফূ'র নিদর্শন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেনঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত: "স্বভাব পাঁচটি, অথবা পাঁচটি স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত: খৎনা করানো, নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও মোচ ছোট করা"।[121] এতে رواية শব্দ হুকমান মারফূ'র নির্দশন।

পাঁচ. শানে নুযূল সংক্রান্ত সাহাবীর সংবাদ হুকমান মারফূ'। কারণ, ওহী ও কুরআন নাযিল প্রত্যক্ষকারী সাহাবী কোনো আয়াত সম্পর্কে যখন বলেন, এ আয়াত অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তখন তিনি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত করলেন, অতএব হুকমান মারফূ'। অনুরূপ সাহাবী যদি কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যাতে ইজতেহাদের সুযোগ নেই, অথবা যার সাথে শব্দের অর্থ সম্পৃক্ত নয়, তাহলে তা

---

[120] বুখারি: (৬/৩৬৩), হাদীস নং: (৩৩৩৪)

[121] বখারি: (১০/৩৩৪), হাদীস নং: (৫৮৮৯)

হুকমান মারফূ‘। এ তাফসির তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, যেমন ইমাম বুখারী বর্ণনা করেনঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).

ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “ইয়ামান বাসীরা হজ করত কিন্তু খাদ্য-সামগ্রী বহন করে আনত না, তারা বলত: আমরা ভরসাকারী। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে মানুষের নিকট ভিক্ষা করত, তাই আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন:

(وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰۖ ١٩٧) [البقرة: ١٩٧]

“তোমরা সামগ্রী বহন কর, কারণ তাকওয়া সর্বোত্তম সামগ্রী”।[122] অপর জায়গায় বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ আবু ইসহাক শায়বানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “আমি ‘যির’কে আল্লাহর বাণী[123]:

(فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ ٩ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَىٰ عَبۡدِهِۦ مَآ أَوۡحَىٰ ١٠) [النجم:٩، ١٠]

---

[122] বুখারি: (৩/৩৮৩-৩৮৪), হাদীস নং: (১৫২৩)

[123] অর্থ: “তখন সে নৈকট্য ছিল দু’ ধনুকের পরিমাণ, অথবা তারও কম। অতঃপর তিনি তার বান্দার প্রতি যা ওহি করার তা ওহি করলেন”। সূরা আন-নাজম: (৯-১০)

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন: আমাদেরকে ইব্ন মাসউদ বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন, তার ছয়শ পাখা রয়েছে”।[124]

ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ব্যাখ্যা আরবীর কোনো নিয়মে পড়ে না, তাতে গবেষণারও সুযোগ নেই, অতএব তিনি এ তাফসির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তাই হুকমান মারফূ‘।

ছয়. নির্দিষ্ট কোনো কর্ম সম্পর্কে সাহাবি যদি বলেন, “এতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য রয়েছে”, অথবা বলেন “এ কাজ আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি”, তাহলে হুকমান মারফূ‘। কারণ, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনেছেন। উদাহরণত ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেনঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم».

---

[124] বুখারি: (৮/৬১০), হাদীস নং: (৪৮৫৭)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: "সবচেয়ে খারাপ খানা ওলীমার খানা, যেখানে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় কিন্তু গরিবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না। আর যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করল"।[125]

জান্নাত, জাহান্নাম, অতীত, ভবিষ্যৎ ও ইজতিহাদ চলে না বিষয়ে সংবাদদাতা সাহাবি যদি বনু ইসরাইল থেকে জ্ঞানার্জন করে প্রসিদ্ধ হন, তাহলে তার সংবাদ হুকমান মারফূ' হবে না। কারণ, হয়তো তিনি সংবাদটি তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইয়ারমুকের যুদ্ধে রূমী ও অন্যান্য কিতাবিদের রেখে যাওয়া অনেক কিতাব আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সংগ্রহ করেছেন, তখন এর অনুমতি ছিল।

কোনো তাবে'ঈর বলা: 'এটা সুন্নত':

কেউ বলেছেন: কোনো তাবে'ঈ যদি বলেন: 'এটা সুন্নত' তাহলে মাওকুফ গণ্য হবে, মারফূ' নয়। কারণ, তাবে'ঈ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাননি, তাই তার সুন্নত বলার অর্থ নবী

[125] বুখারি: (৯/২৪৪), হাদীস নং: (৫১৭৭), ইমাম মুসলিম হাদীসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে স্পষ্ট মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম: (২/১০৫৪), হাদীস নং: (১০৭), (১৪৩২)

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয়, বরং সাহাবীদের সুন্নত, অতএব মাওকুফ। কেউ বলেছেন: কোনো তাবে'ঈ যদি বলেন: 'এটা সুন্নত' তাহলে হুকমান মারফূ' হবে। তাদের সুন্নত বলার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, তবে তাদের এ কথা এক হিসেবে মুরসাল ও অপর হিসেবে মুনকাতি', কারণ সনদে সাহাবির উল্লেখ নেই। মোদ্দাকথা: কোনো তাবে'ঈর 'এটা সুন্নত' বলা যদি হুকমান মারফূ' মানি তাহলে মুরসাল, যা একপ্রকার দুর্বল হাদীস, কারণ সনদ মুত্তাসিল নয়, তাই তার সাথে মুরসাল হাদীসের ব্যাবহার করা হবে। আর তাবে'ঈর 'এটা সুন্নত' বলা যদি মাওকুফ মানি তাহলে সাহাবির কথা বা কর্ম হয়। সাহাবির কথা বা কর্মের হুকুম 'মাওকুফে'র বর্ণনায় আসছে।[126]

মারফূ (مرفوع) হাদীসের হুকুমঃ মারফুর সংজ্ঞা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুত্তাসিল, মুনকাতে, মুরসাল, মু'আল্লাক সব ধরনের হাদীসই মারফু'র অন্তূর্ভূক্ত হতে পারে। সুতরাং, কোন

[126] ১৫-নং পঙক্তি দেখুন। যার সারাংশ: তিনটি শর্তে সাহাবির কথা বা কর্ম দলিল হয়: ১. সাহাবি যদি ফকিহ হন। ২. সাহাবির কথা যদি দলিল বিরোধী না হয়। ৩. সাহাবির কথা যদি অপর সাহাবির কথার বিপরীত না হয়। এ তিনটি শর্তে সাহাবির কথা ও কর্ম দলিল হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সাহাবি ফকিহ না হলে তার কথা দলিল নয়। আবার ফকিহ সাহাবির কথা দলিল বিরোধী হলে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন দলিল গ্রহণযোগ্য। ফকিহ সাহাবির কথা যদি দলিল বিরোধী না হয়, তবে অপর সাহাবির কথার বিপরীত, তাহলে প্রাধান্য দেওয়ার দিকটি বিবেচনা করব। অতএব তাবেঈর কথা 'এটা সুন্নত' যদি মাওকুফ মানি, এ তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব।

হাদীস মারফু' হলেই তা হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি কোন মারফু' হাদীস সহীহ বা হাসান স্তরের হয় এবং অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তা শরীয়তের হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হবে। আর যদি যঈফ হয় এবং যঈফ হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়ার যে সব শর্ত শারায়েত রয়েছে তা তাতে বিদ্যমান থাকে তাহলেও তা প্রামানিক ভিত্তি রূপে গণ্য হবে। যে সব হাদীস সূত্রের বিচারে মওকুফ অথচ হুকমান মারফু' তার বিধানও মারফু'র বিধানের অনুরূপ হবে। যদি অন্য কোন কওলী বর্ননা না থাকে তাহলে মারফু' ফেইলী হাদীস দ্বারা কোন বিষয় ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয় না[127]।

২। **হাদীসে মওকুফঃ** যে সব হাদীসের বর্ণনাসূত্র (সনদ) ঊর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁচেছে - কোন সাহাবীর কথা কিংবা কাজ বা অনুমোদন যেসব সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা 'হাদীসে মওকুফ' নামে অভিহিত।

আভিধানিক অর্থঃ মওকুফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো থেমে যাওয়া, স্থির থাকা, বিরতি দেয়া ইত্যাদি। মূলতঃ সাহাবীর কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ননাকে এ জন্য মওকুফ বলা হয় যে,

[127] তাইসিরুল মুসতালাহীল হাদীস - ডঃ মুহাম্মদ তাহান, পৃষ্ঠা নং - ১৩০

বর্ননাকারী যেন সনদ বর্ননার ক্ষেত্রে সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেলেন সামনে অগ্রসর হলেন না।

পারিভাষিক অর্থঃ বস্তুতঃ যে বর্ননাকারী সাহাবীর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত তাকে মওকুফ বলে[128]। অর্থাৎ যে বর্ননার সম্পর্ক সাহাবীর সঙ্গে তা সাহাবীর বক্তব্য সম্পর্কিতই হোক বা তাঁর কর্ম ও আচরণ সংক্রান্তই হোক কিংবা তাঁর অনুমোদন সংক্রান্তেই হোক, সেই বর্ননা বিচ্ছিন্ন সূত্রেই বর্ণিত হোক সবই হাদীসে মওকুফ বলে গণ্য হবে[129]।

ইমাম নববী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ যাতে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ কিংবা অনুরূপ কিছু বর্ণিত হয়- তা পরপর মিলিত বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হউক কিংবা মাঝখানে কোন বর্ণনাকারীর অনুপস্থিতি ঘটুক- তা 'মওকুফ হাদীস'।

৩। যে সনদসূত্রে কোন তাবেয়ী'র কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়, তা 'হাদীসে মকতু' নামে পরিচিত। ইমাম নববী বলেছেনঃ "তাবেয়ী পর্যন্ত যার সূত্র পৌঁচেছে, তাই 'হাদীসে মাকতু'।"

---

[128] তাইসির মুসতালাহিল হাদীস, ডঃ মুহাম্মাদ তাহান, পৃষ্ঠা নং - ১৩০

[129] হাদীস অধ্যায়নের মূলনীতি, আবুল ফাতাহ ইয়াহ্ইয়া, পৃষ্ঠা নং - ৮৬

সনদের গুরুত্বঃ হাদীসের সনদ এর গুরুত্ব সম্পর্কে সহীহ মুসলিম গ্রন্থের মুকাদ্দামায় রয়েছে তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেনঃ এই জ্ঞান হলো দ্বীন। সুতরাং কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ তা দেখে নিবে। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে কতক বিখ্যাত মনীষীর বাণী উদ্ধৃত করেছেনঃ

১. সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "মালায়েকাগণ আসমানের পাহারাদার, আর আসহাবে হাদীসগণ জমিনের পাহারাদার"।

২. আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "সনদ দীনের একটি অংশ, যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা চাইত তা-ই বলত"।

৩. ইব্‌ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "নিশ্চয় সনদের ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ"।

৪. তিনি আরো বলেনঃ "মানুষ সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না, কিংবা সনদ দেখত না, অবশেষে যখন ফেতনার সূচনা হল, তারা বলল: তোমাদের শায়খদের নাম বল, বিদ'আতি হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করব না। আহলে সুন্নাহ হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করব"।

৫. ইব্‌নুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেনঃ “সনদ ব্যতীত দীনি ইলম অন্বেষণকারী সিঁড়ি ব্যতীত ছাদে আরোহণকারী ব্যক্তির ন্যায়”।[130]

দ্বিতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী বলেনঃ “সনদ মুমিনের অস্ত্র স্বরুপ”।

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেনঃ “সনদ বর্ণনা ও সংরক্ষণ দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা না থাকলে যে যা চাইত তাই বলত।

মতন (مَتْنٌ): সনদ বাদে মূল কথা ও তার শব্দসমূহ হচ্ছে ‘মতন’। অর্থাৎ সনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তাকে **মতন** (مَتْن) বলে। বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, মতন (مَتْن) হলো হাদীসের মূল ভাষা। সনদ বাদে মূল কথা ও তার শব্দসমূহ হলো “মতন”। তাই একটি উদাহরণ দ্বারা প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট করছি, যেন পাঠকবর্গ সহজে বুঝতে পারেন।

قال الإمام البخاري -رحمه الله- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»

[130] দেখুন: ইমাম মুসলিমের ভূমিকা।

এ হাদীস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। এখানে দেখছি বুখারীর (১৯৪-২৫৬হি.) উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (২১৮হি.), তার উস্তাদ মালিক (৮৯-১৭৯হি.), তার উস্তাদ আবুয যিনাদ (৬৫-১৩১হি.), তার উস্তাদ আ'রাজ (১১৭হি.), তার উস্তাদ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু (৫৭হি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট না হত, অথবা [বলেছেন] মানুষের উপর, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম"। [তথ্যসূত্রঃ বুখারী: (৮৮৭), মুসলিম: (২৫৪)]

সনদ (سَنَدٌ) ও মতন (مَتْنٌ): হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এগুলোর অন্যতম হলো সূত্র সংরক্ষণ ও সূত্র বর্ননার অপরিহার্যতা।

কেউ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে কিছু বললেই তাঁকে সর্বপ্রথম বলতে হতো, তিনি কার নিকট থেকে এই কথাটি সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি কার নিকট থেকে তা শুনছেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরাকে সনদ বলা হয়। মুহাদ্দিসঘনের পরিভাষায় হাদীস বলতে দুটি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। প্রথম অংথঃ হাদীসের সূত্র বা সনদ এবং দ্বিতীয় অংশঃ হাদীসের মূল

বক্তব্য বা মতন[131]। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, হাদীসের দু'টি প্রধান অংশঃ একটি সনদ, অপরটি মতন। এ হাদীসে ইমাম বুখারীর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পর্যন্ত অংশকে سَنَد 'সনদ' বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসের অবশিষ্ট অংশকে مَتْن 'মতন' বলা হয়।

হাদীসের মতন ও সনদ একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোত জড়িত। সনদ ব্যতীত মতন হয় না, মতন থাকলে অবশ্যই তার সনদ আছে। তবে একটি 'সহীহ' হলে অপরটি 'সহীহ' হওয়া জরুরী নয়। কখনো সনদ সহীহ হয়, কারণ সহির সকল শর্ত তাতে বিদ্যমান, যেমন সনদ মুত্তাসিল, রাবিগণ আদিল ও দ্বাবিত, তবে মতন শায বা 'ইল্লতের কারণে সহী নয়। কখনো মতন সহীহ হয়, তবে রাবির দুর্বলতা বা ইনকিতা' (বর্ণনাপরম্পরা কাটা পড়া) এর কারণে সনদ সহীহ হয় না। সনদ ও মতন উভয় সহি হলে হাদীস সহীহ। এরূপ হাদীস সম্পর্কে আমরা দৃঢ়ভাবে বলবঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গ্রন্থকারের উস্তাদকে সনদের শুরু এবং সাহাবীকে সনদের শেষ বলা হয়।

---

[131] হাদীসের সনদ : মৌখিক বর্ননা বনাম পান্ডুলিপি নির্ভরতা - ডঃ খন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইন্টটিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্স জার্নাল ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, জুন ২০০৬ সালে প্রকাশিত

রিজাল (رجال): হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে।

আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال): যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রিজাল' বলে। আসমাউর রেজাল সম্পর্কে ডঃ স্প্রেনগার তার "লাইফ অব মুহাম্মদ।" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেনঃ- "দুনিয়ায় এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই যারা মুসলমানদের ন্যায় 'আসমাউর রেজালের' বিরাট তত্ত্ব ভান্ডার আবিষ্কার করেছে। আর এর বদৌলতে আজ পাঁচ লাখ লোকের বিবরণ জানা যেতে পারে।" (হাদীসের পরিচয়, সুহৃদ প্রকাশন)।

আদল বা আদিল (عَدْلٌ – عَادِلٌ): عدل 'আদ্‌ল' শব্দের অর্থ সোজা ও বক্রতাহীন রাস্তা, যেমন বলা হয় طريق عدل 'সোজা রাস্তা'। পাপ পরিহারকারী ও সুস্থরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায় ও সোজা রাস্তার অনুসরণ করে, তাই তাকে 'আদ্‌ল' বা 'আদিল' বলা হয়। عادل কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। হাদীসের পরিভাষায় দীনদারী ও সুস্থরুচিকে عدالة বলা হয়।

প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞাঃ

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ 'আদল' এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন: 'আদল' ব্যক্তির মধ্যে এমন যোগ্যতা, যা তাকে তাকওয়া ও

রুচিবোধ আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করে”। [আন-নুয্হাহ: (পৃ. ৮৩)]। মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তাই তাদের সর্ব স্বীকৃত মত হচ্ছে –‘সকল সাহাবীই আ’দিল অর্থাৎ সত্যবাদী। সুতরাং, যে যে ব্যক্তি ‘তাকওয়া’ ও ‘মরুওত’ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে আ’দিল বলে অর্থাৎ যিনি -

১/ হাদীস সম্পর্কে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হননি,

২/ সাধারণ কাজ কারবার মিথ্যান্বী বলে কখনো সাব্যস্ত হননি,

৩/ অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ দোষ গুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায় নি এরূপ লোকও নন,

৪/ বে-আমল ফাসিকও নন, অথবা

৫/ বদ-এতেকাদ বিদাআতীও নন তাকে আ’দিল বলে।

আদালত (عَدَالَةٌ): মানুষের ভিতরের যে আদিম শক্তি তাকে ‘তাকওয়া’ ও ‘মরুওত’ অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত রাখতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে ‘আদালত’ বলে। ‘তাকওয়া’ অর্থে এখানে শিরক, বিদাআত ফিছক ও প্রকৃতি কবীরা এবং বারবার করা সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে বুঝায়, ‘মরুওত’ সর্বপ্রকার

বদ রসম রেওয়াজ থেকে দূরে থাকাকে বুঝায়’ যদিও তা মুবাহ হয়। যেমনঃ উদাহরণে পেশ করা মিসওয়াকের হাদীসে ইমাম বুখারীর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ, তার উস্তাদ মালিক, তার উস্তাদ আবুয যিনাদ এবং তার উস্তাদ আ‘রাজ সবাই আদিল এবং একাধিক মুহাদ্দিস তাদের আদালত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অতএব সনদে বিদ্যমান সকল রাবীর মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত বিদ্যমান। উল্লেখ্য, সকল সাহাবী আদিল, কারণ তাদের আদালত প্রসঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী দিয়েছেন, তাদের সাক্ষীর পর কারো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। আরও বিস্তারিবত ভাবে বলা যায় যে, যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও মরুওওয়াত অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে **আদালত** বলে।

তাক্বওয়া অর্থে এখানে শিরক প্রভৃতি কবীরা গুণাহ্ এবং পুনঃ পুনঃ ছগীরা গুণাহ্ করা হতে, হাদীস শরীফ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা থেকে, সাধারণ কাজ-কারবারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া থেকে, অপরিচিত হওয়া থেকে, বে-আমল-ফাসিক, বদ্ আক্বীদা ও বিদয়াতী আমল থেকেও বেঁচে থাকাকে বুঝায়। মরুওয়াত অর্থে অশোভন বা অভদ্রোচিত, অশালীন, অশ্লীল, কুরুচীসম্পন্ন এমনকি অপছন্দনীয় কথা ও কাজ হতে দূরে থাকাকে বুঝায়। যথা হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তাঘাটে ইস্তিঞ্জা করা ইত্যাদি। এরূপ কার্য করেন এমন ব্যক্তির হাদীস সহীহ নয়।

যবত (ضَبْطٌ) ও যাবিত (ضَابِطٌ): ضبط ক্রিয়াবিশেষ্য, আভিধানিক অর্থ নিয়ন্ত্রণ। এ থেকে যিনি শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন, তাকে **ضابط** বলা হয়।

'যাবিত' কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকারী। যবত হলো সেই শক্তি যা মানুষের শ্রুত ও লিখিত জিনিসের বিন্যাস থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ স্মৃতিপটে জাগরিত করে হুবহু যখন তখন অপরের নিকট পৌছাতে পারে।

যবত (ضَبْطٌ) এর পারিভাষিক অর্থ: শায়খ থেকে শ্রবণ করা হাদীস হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়াই যবত। যবত দুই অবস্থায় থাকা জরুরীঃ শ্রবণ করার সময় ও বর্ণনা করার সময়।

শ্রবণ করার সময় দ্বাবত যেমন, শায়খের হাদীস মনোযোগসহ শ্রবণ করা ও তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ যথাযথ সংরক্ষণ করা। এ প্রকার যবতকে **ضبط عند التحمل** বলা হয়, অর্থাৎ হাদীস গ্রহণ করার সময় দ্বাবত। বর্ণনা করার সময় দ্বাবত যেমন, শায়খ থেকে শ্রবণকৃত হাদীস রাবির নিকট কোনো প্রকার হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত বর্ণনা করা, ভুল হলেও কম। এ প্রকার যবতকে **ضبط عند الأداء** বলা হয়, তথা বর্ণনা করার সময় যবত। এ দুই অবস্থায়

দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে যাবিত (ضَابِطٌ) বলা হয়। বিষয়টি উদাহরনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤) [العلق: ١، ٤]

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন"। [সূরা আলাক: (১-৪)]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে প্রথম বলেছেন পড়, অতঃপর বলেছেনঃ "যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন"। অর্থাৎ তোমরা স্মৃতি শক্তি থেকে পড়, যদি স্মৃতি শক্তিতে না থাকে, তাহলে তোমার লিখনি থেকে পড়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা 'যবত' ও 'যাবিত' দু'টি শব্দ বুঝতে পারলাম।

সিক্বাহ্ (ثِقَةٌ): যে ব্যক্তির মধ্যে আ'দল গুণ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাবে তাকে 'সিকাহ' বলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে আদালত ও যবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে **সিক্বাহ্ রাবী** বলে।

উদাহরণে পেশকৃত মিসওয়াকের হাদীসে সকল রাবি সিকাহ। তাদের বিরোধিতা করে তাদের চেয়ে অধিক সেকাহ রাবি কোনো হাদীস বর্ণনা করেনি।

আসহাবে সুফফাঃ যে সব সাহাবী সব সময় রাসূল (সাঃ) - এর সান্নিধ্যে থাকতেন অর্থাৎ রাসূলের (সাঃ)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তাঁর আদেশ নিষেধ শুনতেন এবং মুখস্থ করতেন এই স্বল্প সংখ্যক সাহাবীকে 'আসহাবে সুফফা' বলে[132]। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রাসুল (সঃ) এর সাহাবীদের ভেতর ৭০ (সত্তর) জন সাহাবী ছিলেন যারা নিজেদের জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। তাদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো।মসজিদে নববীর উঠোন ছাড়া তাদের মাথা গুজবার দ্বিতীয় কোন স্থান ছিল না। দুনিয়ায় তাদের মালিকানায় এক টুকরো কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। এমন উৎসর্গিত প্রাণের কথা কল্পনাও করা যায়? তারা দিনের বেলা প্রয়োজনে জংগলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন এবং তা বিক্রি করে নিজদের ভরণ পোষণ চালাতেন।এমন কি এ থেকে আল্লাহর পথেও ব্যয় করতেন।

আসহাবে সুফফার উল্লেখযোগ্য ২৪ জন সদস্য

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) (মৃ ৫৭ হি)

---

[132] হাদীসের পরিচয়, জিলহজ্ব আলী, সুহৃদ প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং - ১৩

২। আবু জর গিফারী (রাঃ) (মৃ ৩২ হি)

৩। কাব ইবনে মালেক আল আনসারী (রাঃ) (মৃ ৩৪ হি)

৪। সালমান ফারসী (রাঃ) (মৃ ৩৪ হি)

৫। হানজালা ইবনে আবু আমির (রাঃ)

৬। হারিসা ইবনে নুমান (রাঃ)

৭। হুজায়ফা ইবনুল য়ামান (রাঃ)

৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

৯। সুহায়ব ইবনে সিনান রুমি (রাঃ)

১০। সালেম মাওলা আবি হুজায়ফা (রাঃ)

১১। বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)

১২। সা'দ বিন মালিক আবু সাইদ খুদরী (রাঃ)

১৩। আবূ উবায়দাঃ 'আমির ইবনুল জাররাহ (রাঃ)

১৪। মিকদাদ ইবনে আমের (রাঃ)

১৫। আবু মারছাদ (রাঃ)

১৬। আবু লুবাবা (রাঃ)

১৭। কাব ইবনে আমর (রাঃ)

১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাঃ)

১৯। আবু দ্দারদা (রাঃ) (মৃ ৩২ হি)

২০। ছাওবান [মাওলা রাসুলিল্লাহ (সঃ)] (রাঃ)

২১। সালিম ইবনে উমায়ের (রাঃ)

২২। খাব্বাব ইবনে আরাও (রাঃ)

২৩। মিসতাহ ইবনে উছাছা (রাঃ)

২৪। ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রাঃ)। (তথ্যসূত্রঃ হাদীসের পরিচয়, জিলহজ্জ্ব আলী, সুহৃদ প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং – ৪২)[133]।

মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ): 'মুহাদ্দিস' আরবী শব্দ, বাংলা অর্থ বর্ণনাকারী বা বক্তা। 'মুহাদ্দিস' **(مُحَدِّثٌ)** কর্তাবাচক বিশেষ্য, এ শব্দের আদেশসূচক

---

[133] হাদীসের পরিচয়, জিলহজ্জ্ব আলী, সুহৃদ প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং – ৪২

ক্রিয়া দ্বারা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। হাদীসের পঠন-পাঠনকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদেরকে পরিভাষায় **مُحَدِّث** ‘মুহাদ্দিস’ বলা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাকেই মুহাদ্দিস বলে। মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রের ওপর গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন। যেহেতু ‘মুহাদ্দিস’ কর্তাবাচক বিশেষ্য, এ শব্দের আদেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা আল্লাহ’র নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

[وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١) [الضحى: ١١

“আর আপনার রবের অনুগ্রহ আপনি বর্ণনা করুন”।

অর্থাৎ রিসালাত ও নবুওয়ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত, অতএব যে রিসালাত দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন, আর যে নবুওয়ত আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুহাদ্দিস’, কারণ তিনি কুরআন ও হাদীস বর্ণনা করে রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। পরবর্তীতে শুধু হাদীস বর্ণনাকারীদের মুহাদ্দিস বলা হয়। এ

পরিভাষা সাহাবীদের যুগেও ছিল, আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেনঃ

وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ مُحَدِّثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ.

“আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অমুক বিষয়ে বর্ণনা করেন”?

অতএব সনদে বিদ্যমান সকল রাবী মুহাদ্দিস। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সমর্থন ও গুণগানকে যথাযথ সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেন।

শায়খ (شَيْخٌ): ‘শায়খ’ আরবী শব্দ, বাংলা অর্থ বৃদ্ধ ও বয়স্ক। সাধারণত পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ বয়স হলে **شَيْخ** বলা হয়। তবে শায়খ দ্বারা হাদীসের উস্তাদ ও রাবি দ্বারা শায়খের ছাত্রকে বুঝিয়েছি।

শায়খ ও রাবী আপেক্ষিক শব্দ। মূলতঃ যিনি হাদীস শিক্ষা দেন সেই রাবীকে তার শাগরিদের তুলনায় ‘শায়খ’ বলে।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে উনার শাগরিদের তুলনায় উনাকে **শায়খ** বলা হয়ে থাকে।

শায়খ ও রাবীর সম্পর্ক : শায়খ ও রাবী আপেক্ষিক শব্দ। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন হিসেবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাবি, তাবেয়ি আ'রাজ হিসেবে তিনি শায়খ।

শাইখুল হাদীস : হাদীস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, দীর্ঘ দিন হাদীসের পঠন ও পাঠনে নিরত শায়খকে কেউ 'শায়খুল হাদীস' বলেন। তবে আমাদের ভারত উপমহাদেশে বুখারী শরীফের পাঠদানকারীকে 'শায়খুল হাদীস' বলা হয়।

হাফিয (حافظ): যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হাফিয বলা হয়।

বিশদভাবে বলা যায় যে, যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সহ প্রায় একলক্ষ হাদীস আয়ত্ত বা মুখস্ত করেছেন তাকে 'হাফিয' বা 'হাফিযে হাদীস' বলে।

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফিয (حافظ) গণঃ

(১) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) : (আবদুর রহমান) : ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার বর্ণিত বা

রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তার ছাত্র সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত।

(২) হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) : ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০।

(৩) হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) : ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

(৪) হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) : ৭৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

(৫) হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) : ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।

(৬) হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) : ১০৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।

(৭) হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) : ৮৪ বছর বয়সে ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এই কজন মহান সাহাবীর প্রত্যেকেরই এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্থ ছিল। তাছাড়া হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (মৃঃ ৬৩ হিজরী), হজরত আলী (মৃঃ ৪০ হিজরী) এবং উমার ফারুক (মৃঃ ২৩ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে। অনুরূপভাবে হজরত আবু বকর (মৃঃ ১৩ হিজরী), হজরত উসমান (মৃঃ ৩৬ হিজরী), হজরত উম্মে সালমা (মৃঃ ৫৯ হিজরী), হজরত আবু মূসা আশআরী (মৃঃ ৫২ হিজরী), হজরত আবু যার গিফারি (মৃঃ ৩২ হিজরী), হজরত আবু আইয়ুব আনছারি (মৃঃ ৫১ হিজরী) রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে একশতের অধিক এবং পাঁচশতের কম হাদীস বর্ণিত আছে।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ১৪শ' বছর পরও আমাদের মাঝে আলোকবিস্তার করছে হাদীসের মহান হাফেজদের কারণে। তাদের কাছ থেকে যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন তাদের ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব মহান ব্যক্তি হিকমাত ও হেদায়াতের এই উৎসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে মেহনত করেছেন তা অতুলনীয়।

হুজ্জাত (حجة): যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃতান্ত সহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত করেছেন বা আয়ত্ত করেছেন তাকে ‘হুজ্জাত’ বা ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ বলে।

হাকিম (حاكم): যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে ‘হাকিম’ বলে। অর্থাৎ যিনি সব হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

শায়খাইন (شَيْخَيْنِ): ইমাম বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে ‘শায়খাইন’ বলে। (এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শায়খাইন বলতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কেই বুঝায়। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনাদেরকে এক সঙ্গে শায়খাইন বলে। (কিন্তু খুলাফায়ে রাশিদীন আলাইহিমুস সালাম ওনাদের মধ্যে শায়খাইন বলতে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্ব আলাইহিস সালাম এবং হযরত উমর ফারুক আলাইহিস সালাম ওনাদেরকে বুঝায়। এভাবে হানাফী ফিক্বাহে শায়খাইন বলতে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আবূ ইউছূফ রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনাদেরকে বুঝায়)।

সিহাহ্ সিত্তা (صِحَّاحٌ سِتَّةٌ) / কুতুবে সিত্তা: যে ছয়খানা হাদীস গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসে অধিকতর বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে "সিহাহ্ সিত্তাহ" / কুতুবে সিত্তা বলে। এগুলি হচ্ছে –

১. সহীহুল বুখারী ২. সহীহুল মুসলিম ৩. আবু দাউদ ৪. তিরমিজী ৫. নাসাঈ ৬. ইবনে মাজাহ। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব ষষ্ঠ নম্বরের হাদীস গ্রন্থ কোন খানা হবে এ নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। বিশিষ্ট আলেমগণের অনেকেই ইবনে মাজাহর স্থলে 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' কে আবার কেউ কেউ 'সুনানে দারেমীকে' ই সেয়াহ সেত্তার শামীল করেন। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সহীহুল, সহীহুল মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ - হাদীস - এর এই ছয়খানা কিতাবকে এক সঙ্গে সিহাহ্ সিত্তাহ **(صِحَّاحٌ سِتَّةٌ) /** কুতুবে সিত্তা বলে। এটাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিশিষ্ট আলিমগণ ইবনু মাজাহ-এর স্থলে মুয়াত্তা ইমাম মালিক আবার কেউ কেউ সুনানে দারিমীকেও সিহাহ্ সিত্তাহ্ **(صِحَّاحٌ سِتَّةٌ)** মধ্যে শামীল করেন।

আমাদের সমাজে 'সিহাহ সিত্তাহ' (সিহাহ সিত্তাহ পরিভাষাটি ভারতীয় ব্যবহার। এই ছয়টি গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা সুপরিচিত। তবে গ্রন্থগুলি 'সহীহ' নয়। বরং ২টি গ্রন্থ সহীহ এবং বাকিগুলি সুনান। এজন্য মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুপরিচিত পরিভাষা হলো 'আল কুতুবুস সিত্তা' 'পুস্তক ছয়টি'। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও

সিহাহ সিত্তা পরিভাষাটি প্রচলিত নয়) নামে প্রসিদ্ধ ৬ টি গ্রন্থের মধ্যে ২টি সহীহ গ্রন্থঃ "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিম" ছাড়া বাকি ৪টির সংকলক ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করবেন বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসও সংকলন করেছেন। তবে তাঁদের গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হাদীস নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেছেন, সাথে সাথে তাঁরা এসকল গ্রন্থে সংকলিত দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেনঃ 'এই চার গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ নয়। বরং এ সকল গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল প্রকারের হাদীস রয়েছে। (আল আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল আশারাতিল কামিলা পৃ. ৬৬)[134]।

ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহর (রহ) বিবরণ দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, তিনি সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী: এই তিনটি গ্রন্থকে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছেন, যে সকল গ্রন্থের হাদীসসমূহ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে।

134 আল আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল আশারাতিল কামিলা পৃ. ৬৬

কিন্তু তিনি 'সুনান ইবনি মাজাহ'কে এই পর্যায়ে উল্লেখ করেননি। এর কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজীদ ইবনু মাজাহ আল কাযবীনী (২৭৫ হি) সংকলিত 'সুনান' গ্রন্থটিকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করেননি। হিজরী ৭ম শতক পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অতিরিক্ত এই তিনটি সুনান গ্রন্থকেই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং হাদীস শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন। ৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু তাহির মাকসিদী, আবুল ফাদল ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭ হি) এগুলির সাথে সুনান ইবনু মাজাহ যোগ করেন। তাঁর এই মত পরবর্তী দুই শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেননি। ৭ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুস সালাহ আবু আমর উসমান ইবনু আবদুর রাহমান (৬৪৩ হি), আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের মূল উৎস হিসেবে উপরের ৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সুনানে ইবুন মাজাহ কে তাঁরা এর মাঝে গণ্য করেননি। পরবর্তী যুগের অনেক মুহাক্কিক আলিম এদের অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে ইমাম মালিকের মুআত্তাকে গ্রহণ করেছেন।

সুনান ইবনি মাজাহকে উপরের তিনটি সুনানের পর্যায়ভুক্ত করতে আপত্তির কারণ হলো ইমাম ইবনু মাজাহর সংকলন পদ্ধতি এই তিন গ্রন্থের মত নয়। উপরে তিন গ্রন্থের সংকলক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কিছু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনু মাজাহ তৎকালীন সাধারণ সংকলন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, এ সকল যুগের অধিকাংশ সংকলক সনদসহ প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করতেন। এতে সহীহ, যয়ীফ, মাউদূ সব প্রকারের হাদীসই তাঁদের গ্রন্থে স্থান পেত। সনদ বিচার ছাড়া হাদীসের নির্ভরতা যাচাই করা সম্ভব হতোনা। ইমাম ইবনু মাজাহও মূলত এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সহীহ বা হাদীস সংকলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ ও কিছু মাউযূ বা বানোয়াট হাদীসও সংকলন করেছেন। তিনি এসকল যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য করেননি। ৮ম হিজরী শতক থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সুনানে ইবনি মাজাহকে ৪র্থ সুনান গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করতে থাকেন। মুআত্তা ও সুনান ইবনি মাজাহ এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুআত্তা গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা কম এবং এই গ্রন্থের সকল সহীহ হাদীস উপরের ৫টি গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত। ফলে এই গ্রন্থটিকে পৃথকভাবে অধ্যয়ন করলে অতিরিক্ত হাদীস জানা

যাচ্ছেনা। পক্ষান্তরে সুনান ইবনি মাজাহ এর মধ্যে উপরের ৫টি গ্রন্থের অতিরিক্ত সহস্রাধিক হাদীস রয়েছে। এজন্যই পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এই গ্রন্থটিকে ৪র্থ সুনান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ এর সুনান গ্রন্থে মোট ৪৩৪১টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজার হাদীস উপরের পাঁচটি গ্রন্থে সংকলিত। বাকী প্রায় দেড় হাজার হাদীস অতিরিক্ত। ৯ম হিজরী শতকের মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ ইবনু আবী বাকর আল-বূসীরী (৮৪০ হি) ইবনু মাজাহর এ সকল অতিরিক্ত হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন[135]। আল্লামা বূসীরী ১৪৭৬ টি হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন, যেগুলি উপরের ৫টি গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, শুধুমাত্র ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সহীহ বা হাসান হাদীস এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ হাদীস যয়ীফ। এগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধশত হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন মুহাদ্দিসগণ। (ইবনুল কাউসূরানী, শুরুতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ পৃ. ১৩, ২৪-২৬)[136]।

নিম্নে সিয়াহ সিত্তা ও তার সংকলক বৃন্দের পুরো নাম, জন্ম ও মৃত্যু সন দেয়া হল।

---

[135] হাদীসের নামে জালিয়াতি – ডঃ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের বই থেকে কিছুটা সংগ্রহীত ও ঈষৎ পরিবর্তীত

[136] ইবনুল কাউসূরানী, শুরুতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ পৃ. ১৩, ২৪-২৬

ক্রঃ নং:	গ্রন্থের নাম	সংকলকের নাম	জন্ম	ওফাত	জীবন কাল	হাদীস সংখ্যা
০১	সহীহ বুখারী	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা	১৯৪ হিজরী	২৫৬ হিজরী	৬২ বছর	৭৩৯৭টি
০২	সহীহ মুসলিম	মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী আল নিশাপুরী	২০৪ হিজরীতে নিশাপুরে	২৬১ হিজরী	৫৭ বছর	৪০০০টি
০৩	জামে আত তিরমিযী	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ইসা ইবনে আওরাতা আত-তিরমিযী	২০৯ হিজরীতে খোরাসানের তিরমিযী শহরে	২৭৯ হিজরী	৭০ বছর	৩৮১২টি
০৪	সুনানে আবু দাউদ	আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআশ ইবনে ইসহাক	২০২ হিজরীতে সীস্তান নামক স্থানে	২৭৫ হিজরী	৭৩ বছর	৪৮০০টি
০৫	সুনানে নাসাঈ	ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব ইবনে আলী আল খোরাসানী আন-নাসায়ী	২১৫ হিজরী নাসা শহরে	৩০৩ হিজরী	৮৮ বছর	৫৭৬১ টি
০৬	সুনানে ইবনে মাযাহ	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাযাহ আল কাযবীনি	২১৭ হিজরীতে কাসবীন শহরে	২৭৩ হিজরী	৬৪ বছর	৪৩৪৯টি

সিহাহ সিত্তা (صِحَّاحٌ سِتَّةٌ) বলা কতদূর সঠিক?

আমরা বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এসব মহামতি ইমামদের হাদীস গ্রন্থ গুলিকে ছিহাহ সিত্তাহ বলে থাকি। যার অর্থ হাদীসের ছয়টি সহীহ কিতাব। আসলে কি এ ছয় খানি কিতাবই সহীহ হাদীসের কিতাব? একমাত্র সহীহ হাদীসের কিতাব বলতে বুখারী ও মুসলিমকে বুঝানো হয়। যে দুটিকে একত্রে ছহীহায়েন বলা হয়। এই দুই কিতাবের সাথে অনেক বিদ্বান মুওয়াত্ত্বা মালিককেও শামিল করেছেন। এর বাইরে কোন কিতাবই নিরঙ্কুশ সহীহ হাদীসের কিতাব নয়। বরং সব হাদীর বিতাবেই সহীহ-যঈফ মিশ্রিত রয়েছে। আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এ চারটি কিতাবে যঈফ হাদীস মিশ্রিত রয়েছে। সুতরাং এগুলিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে ছিহাহ সিত্তাহ বলা ঠিক নয়। এমন কি সহীহ বুখারী মুসলিম ছাড়া অন্যান্য হাদীসের কিতাবের সংকলকগণ তাদের কিতাবগুলোকে সহীহ হিসেবেও নাম করণ করেন নি। যদিও অনেক আলেম এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ হাদীস সহীহ হওয়ার উপর ভিত্তি করে সিহাহ সিত্তাহ বলেছেন। বিদ্বানদের গণনা মতে ঐ চারটি কিতাবে যঈফ হাদীসের সংখ্যা তিন হাযারের ঊর্ধ্বে রয়েছে। যেমন মুহাদ্দিস আলবানী (রহঃ) এর চারটি যঈফ গ্রন্থ অবলম্বনে বলা যায়-

- নাসাঈতে যঈফ হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৪৪০ টি
- আবুদাউদে যঈফ হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১১২৭ টি
- তিরমিযীতে যঈফ হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৮২৯ টি
- ইবনু মাজাহ্‌তে যঈফ হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৯৪৮ টি

———————————————————————————————

মোট = ৩৩৪৪ টি

এই চার খানা কিতাবকে পুরোপুরিভাবে সহীহ হাদীসের সংকলন জ্ঞান করার কারণেই আমরা এগুলোর মধ্যে সন্নিবেশিত হাদীসগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি না বা করার প্রয়োজন মনে করি না। অথচ এটি একটি মারাত্মক ভুল। আল্লামা মোহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইয়ামানী বলেন: সুনানে ইবনে মাজাহ আবূদাউদ ও নাসাঈর পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থ। উহার হাদীসসমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো আবশ্যক। উহাতে ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে একটি মওযূ হাদীস রয়েছে। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ইফাবা, ১৯৯২), পৃঃ ৫৬১। গৃহীত: ত্বানক্বীহুল আনওয়ার)।

উপরোক্ত চারখানা বিতাবের বাইরেও এমন অনেক কিতাব রয়েছে যার বেশীর ভাগ হাদীস সহীহ। যেমন সহীহ ইবনু খুযায়মা, সহীহ ইবনু হিব্বান প্রভৃতি। **মোটকথা,** হাদীসের প্রসিদ্ধ চয় খানা বিতাবকে ছিহাহ সিত্তাহ না বলে কুতুবু সিত্তাহ বা সহীহাইন ও সুনানে আরবাআহ বলা উচিত। প্রকাশ থাকে যে, অনেকে মনে

করেন, যঈফ হাদীস ফযীলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। বরং ফযীলত ও আহকাম সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীস বর্জনীয়। এটিই মুহাক্কেক্বীন বিদ্বানদের চূড়ান্ত ফায়সালা। আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মঈন, ইবনুল আরাবী, ইবনে হাযম এবং ইবনু তাইময়াহ প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীস আমল যোগ্য নয়। (ফাওয়ায়েদুত্ তাহদীস পৃঃ ৯৫)।

সহীহাইন (صَحِيْحَيْنِ): হাদীস শাস্ত্রে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের স্থান সর্ব উচ্চে। তাই বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে একত্রে 'সহীহাইন' বলে।

সুনানে আরবায়া (سُنَنٌ اَرْبَعَةٌ): সিয়াহ সিত্তাহ'র অন্তর্গত অপর চারখানি হাদীস গ্রন্থ (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) কে এক সঙ্গে 'সুনানে আরবা' বলে।

মুত্তাফাকুন্ আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): যদি কোন হাদীস একই সাহাবীর নিকট হত ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রহণ করে থাকেন তবে সেই হাদীসকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বলে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, যে হাদীসকে একই সাহাবী হতে হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত মুসলিম রহমতুল্লাহি আলাইহি

উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে হাদীসে মুত্তাফাকুন্ আলাইহি বা ঐক্যসম্মত হাদীস বলে।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছেঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীসের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। নিম্নে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর মতামত তুলে ধরা হলোঃ-

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেনঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যাতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।' এইরূপে ইমাম মুসলিম (রঃ) বলেনঃ 'আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্ত যইফ।'

কাজেই এ দুই কিতাবের বাইরেও সহিহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর (রঃ) মতে সিহাহ সিত্তাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যাতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবন খুযায়মা - আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবন হিব্বান - আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুসতাদরাক – হাকিম-আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা – যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হি.)

৫. সহীহ আবূ আ'ওয়ানা – ইয়াকুব ইবন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা – ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধি (২৮৬হি) এবং ইবন হাযম জাহিরীর (৪৫৬ হি)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যাঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ঈমান আহমদ ইবন হাম্বলের মুসনাদ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর মুনতাখাবু কানযিল উমমাল-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযূল উমমাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে।

অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহমদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরও কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬ টি হাদীস মুত্তাফাকু আলায়হী। তবে যে বলা হয়ে থাকেঃ হাদীসের বড় বড় ইমামের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তাঁর অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে। (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে- তাদবীন, ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীসের কিতাবের বিভাগঃ হযরত মুহাদ্দিসীন কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনারা হাদীস এর কিতাব লিখতে বিভিন্ন পন্থা বা উপায় অবলম্বন করেছেন এবং বিভিন্ন কিতাবকে বিভিন্নরূপে সাজিয়েছেন। নিচে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

জামে (جَامِعٌ): হাদীসকে বিষয় বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং সমস্ত প্রধান প্রধানগুলো সন্নিবেশিত যে হাদীস গ্রন্থ তাকে 'জামে' (جامع) বলে। যেমন- 'জামে' (جامع) সহীহ বুখারী। যে কিতাবে হাদীস সমূকে বিষয় অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যাতে আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, ফিতান, আদাব, আহকাম, রিকাক ও মানাকিব- এ আটটি প্রধান অধ্যায় রয়েছে তাকে জামে (جَامِعٌ) বলে। যথা- জামেয়ে সহীহ হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি, জামেয়ে তিরমিযী, তিরমিযী কিতাবটি আসলে জামে হলেও এটা সুনান নামেই প্রসিদ্ধ। এ জাতীয় কিতাবে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের হাদীস রয়েছে।

সুনান বা মুসান্নাফ (مُصَنَّفٌ – سُنَنٌ) : যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র তাহারাত, নামায, রোযা, প্রভৃতি আহকামের হাদীসসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশী নজর দেয়া হয়েছে তাকে 'সুনান' বলে। যেমন - সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারিমী, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক প্রভৃতি।

মুসনাদ (مُسْنَدٌ): مسْنَدُ কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ সম্পৃক্ত ও মিলিত বস্তু। إسناد ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য থেকে উদ্‌গত। إسناد الشيء إلى الشيء অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা। কেউ

বলেন: سند ধাতু থেকে مسند উদ্‌গত। سند শব্দের অর্থ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঁচু ভূমি।

আভিধানিক অর্থানুসারে এক বস্তুর সাথে মিলিত অপর বস্তুকে মুসনাদ বলা হয়। রাবী বা গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত হাদীসকে ‘মুসনাদ’ বলা হয়। হাদীসসমূহকে সাহাবীদের নামানুসারে সাজানো হয়েছে এবং এক একজন সাহাবী বর্ণিত হাদীসসমূহকে একটি মাত্র হাদীস গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়েছে - এমন হাদীসগ্রন্থকে ‘মুসনাদ’ বলে। যেমন - মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি, মুসনাদে তায়লাসী, মুসনাদে আবদ্‌ ইবনে হুমাইদ প্রভৃতি।

মু’জাম (مُعْجَمٌ): যে কিতাবে হাদীস সমূহকে শায়খ অর্থাৎ উস্তাদ ওনাদের নাম অনুসারে (ওনাদের মর্যাদা বা বর্ণনাক্রমে) সাজানো হয়েছে তাকে **মু’জাম** বলে। যথা মু’জামে ইবনে কানে,’ মু’জামে তাবারানী (মু’জামে কবীর, মু’জামে ছগীর, মু’জামে আওছাত) প্রভৃতি। শেষোক্ত মু’জাম তিনটি হযরত তাবারানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার কর্তৃক রচিত। এতে তিনি হাদীস শরীফসমূহকে বর্ণনাক্রমে সাজিয়েছেন। এ মু’জাম নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন হযরত ইবনে কানে’ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

রিসালা (رِسَالَةٌ): যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীস সমূহকে একত্র করা হয়েছে তাকে **রিসালা বা জুয্** বলে। যথা কিতাবুত্ তাওহীদ লি ইবনে খুযায়মা রহমতুল্লাহি আলাইহি। এতে শুধু তাওহীদ সম্পর্কিত হাদীস শরীফসমূহ একত্র করা হয়েছে। কিতাবুত্ তাফসীর লি সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি। এটাতে কেবল তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ জমা করা হয়েছে।

হাদীসের কিতাবের স্তর

হাদীস-এর কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা যেতে পারে। দ্বাদশ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ ও ইমাম হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনিও উনার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে হাদীসগুলোর কিতাবসমূহকে পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর: এ স্তরের কিতাবসমূহের কেবল সাহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটিঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

অতএব, এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি। মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহুল বুখারী ও সহীহ। দুনিয়ায় এ কিতাব তিনটির যত অধিক

আলোচনা বা যাচাই-বাছাই হয়েছে, অপর কোন কিতাবের এরূপ হয়নি।

আলোচনায় এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাধারণতঃ এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীস শরীফ নিশ্চিতরূপে সহীহ। তবে এছাড়াও আরো অনেক কিতাব সহীহ হিসেবে প্রমাণিত আছে। কারো কারো মতে, পঞ্চাশটিরও অধিক সহীহ হাদীস শরীফ-এর কিতাব রয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর: এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কম। নাসাঈ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী এ স্তরের কিতাব।

সুনানে দারিমী, সুনানে ইবনে মাজাহ এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মতে মুসনাদে ইমাম আহমদকে এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এ দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফক্বীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর: এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, শায ও মুন্কার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, মুছান্নাফে আবূ বকর ইবনে আবী শাইবাহ, মুসনাদে

আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে তায়লাসী এবং বাইহাক্বী, তাহাবী ও তাবারানীর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর: এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীস রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুয্ যুয়াফা, ইবনে আছীরের কামিল এবং খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম, জাওকানী, ইবনে আসাকির, ইবনে নাজ্জার ফিরদাউস লিদ্ দায়লামীর কিতাবসমূহ এ স্তরের কিতাব। মুসনাদে খাওয়ারিযমীও এ স্তরের। তবে এতে সহীহ ও হাসান হাদীসও রয়েছে।

পঞ্চম স্তর: উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নেই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রথম স্তর ব্যতীত কোন স্তরেরই সমস্ত কিতাবের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ কেবল কতক কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

খবর (خَبَرٌ): হাদীসকে আরবী ভাষায় খবরও বলা হয়। কিন্তু পার্থক্য এই যে খবর শব্দটি হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক। যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়। খবর (خَبَرٌ) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অত্র গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুন্নাহ (السنة): সুন্নাহ (السنة) শব্দটি يسن - سن থেকে ক্রিয়ামূল। যার অর্থ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়ই হতে পারে। সুন্নাহ (السنة) শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থঃ ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা, রীতি, আদর্শ ইত্যাদি।[137]

শারঈ পরিভাষায় সুন্নাহ্ হল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঐ সকল বাণী, যা দ্বারা তিনি কোন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ, বিশ্লেষণ, মৌণ সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছেন এবং কথা ও কর্মের মাধ্যমে অনুমোদন করেছেন, যা সঠিকভাবে জানা যায় তাকে সুন্নাহ বলা হয়। [শাইখ যাকারিয়া আল-আনছারী, ফাতহুল বাকী আলা আলাফিল ইরাকী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ: ১২][138]।

শরয়ী পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করতে ইবনু মানযুর[139] লিখেনঃ

"وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما

---

[137] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ: سنن , ১৩/১২৪।

[138] শাইখ যাকারিয়া আল-আনছারী, ফাতহুল বাকী আলা আলাফিল ইরাকী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ: ১২

[139] আরবী ভাষার বিশাল শব্দ ভান্ডার সম্বলিত বিখ্যাত অভিধান 'লিসানুল-আরব' এর রচয়িতা আবুল ফযল জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর আল-আনসারী, জন্ম: ৬৩০ ওফাত: ৭১১ হিজরী, মোতাবেক: ১২৩২-১৩১১ ঈসায়ী। মূল আফ্রিক্বী বংশীয়, তবে তার জন্ম ও মৃত্যু মিশরে। (আল-আ'লাম: ৭/১০৮।

لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث".

"তবে যখন শরীয়তে সুন্নাত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের আদেশ করেছেন, যে সব থেকে নিষেধ করেছেন, কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে দিকে আহ্বান করেছেন, যা সম্মানিত কিতাব কুরআনে বলা হয় নি। এ জন্যই বলা হয়, শরীয়তের দলীল কিতাব ও সুন্নাত। অর্থাৎ হাদীস এবং কুরআন"[140]

উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে সুন্নাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ

" السنة في اصطلاح الأصوليين هي "ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن" وهذا يشمل: قوله:- صلى الله عليه وسلم-، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهمه، وتركه ".(معالم اصول الفقة عند اهل السنة والجماعة 1-118)

"উসূলীদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে, "কুরআন ছাড়া যা কিছুই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে" এই সংজ্ঞায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম,

---

140 লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত।

স্বীকৃতি, লিখা, ইঙ্গিত, প্রতিজ্ঞা ও বর্জন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।"[141]

আল্লামা শাওকানী[142] (রাহ.) সুন্নাতের সংজ্ঞাটি যেভাবে বর্ণনা করেনঃ

" وأما معناها شرعًا: أي: في اصطلاح أهل الشرع فهي: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة ". (ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، الفصل الاول، في معنى السنة لغة وشرعا 1-(95

"শরয়ী পরিভাষায় সুন্নাতের অর্থ, অর্থাৎ শরীয়তবিদদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন।

---

[141] ড. মুহাম্মদ হুসাইন ইবন হাসান, মা'আলিমুল উসূলিল ফিক্বহী 'ইনদা আহলিস্-সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, দ্বিতীয় আলোচনা, সুন্নাতের সংজ্ঞা, পৃষ্টা:১১৮।

[142] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ্-শাওকানী। ১১৭৩-১২৫০ হিজরী, ১৭৬০-১৮৩৪ ঈসায়ী। ইয়ামান এর সান'আর ফক্বীহ, মুজতাহিদ। উসূল, হাদীস, ফিক্বহ, তাফসীর সর্ব বিষয়ে তার পান্ডিত্য ও রচনা বিদ্যমান।

ভাষাবিদ ও হাদীস বিশারদদের নিকট ব্যাপক অর্থে তা ওয়াজিব এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়। তবে ফিক্বহবিদদের পরিভাষায় তারা ওয়াজিব নয় এমন বিষয়ের উপর সুন্নাতের প্রয়োগ করে থাকেন। এর বিপরীতে বিদ'আত শব্দটি ব্যবহার হয়, যেমন বলা হয়ঃ অমুক আহলুস্-সুন্নাহ।"[143]

ইমাম শাতেবী (রহঃ) সুন্নাতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুন্নাত হলো নবী (সাঃ) এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এবং যা সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষ থেকে এসেছে।

সফীউদ্দিন আল হাম্বলী লিখেছেন- সুন্নাহ্ বলতে বুঝায় কুরআন ছাড়া রাসূলের সব কথা, কাজ ও সমর্থন। তবুও আমরা হাদীস ও সুন্নাহ্ এর মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখতে পাই। সূন্নাহ শব্দটি সম্পূর্ণরুপে ও সর্বতোভাবে হাদীস শব্দের সমান নয়। কেননা 'সুন্নাহ্' হলো রাসূলের (সাঃ) বাস্তব কর্মনীতি, আর 'হাদীস' বলতে রাসূলের কাজ ছাড়াও কথা ও সমর্থন বুঝায়। আল্লামা ফয়সাল ইবনে আব্দুল আযিয আলে মুবারক (রহঃ) বলেন, সুন্নাত হলো যা

---

[143] আল্লামা শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল, প্রথম পরিচ্ছেদ, সুন্নাতের আভিধানিক এবং শরয়ী অর্থ, ১/৯৫।

নবী (সাঃ) এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে। (মুকামুর রাশাদ ১/২৫ পৃষ্ঠা)[144]।

আল্লামা মুহাম্মদ বশীর শাহসোয়ানীর ভাষায়ঃ যেই বিশেষ পথ, পন্থা ও পদ্ধতি, যা নবী করীম (সাঃ) এর সময় থেকেই দ্বীন ও ইসলামের ব্যাপারে কোন কাজ করার বা না করার দিক দিয়ে বাস্তবভাবে অনুসরণ করা হয় যার ওপর দিয়ে চলাচল করা হয়।

আল্লামা সফিউদ্দীন আল হাম্বলী লিখেছেনঃ কোরআন ছাড়া রাসূলের যে কথা, যে কাজ বা অনুমোদন বর্ণনার সুত্রে পাওয়া গেছে - তাই সুন্নাহ্। মাওলানা আব্দুর রহিম (রহঃ) সুন্নাহ্ সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করেছেন অনুরূপই বলতে হয় [সুন্নাত ও বিদ'আত ১৪/১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন][145] –

সুন্নাতের সেই অর্থ আলোচ্য নয়, যা হাদীস বিজ্ঞানীরা পরিভাষা হিসেবে গ্রহন করেছেন; সেই অর্থও নয়, যা ফিকাহ শাস্ত্রে গ্রহন করা হয়েছে। হাদীস-বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় 'সুন্নাহ্' হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ) এর মুখের কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদনের বর্ণনা- যাকে, প্রচলিত কথায় বলা হয় 'হাদীস'। আর ফিকাহ শাস্ত্রে 'সুন্নাহ্' বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরয বা ওয়াজিব নয় বটে; কিন্তু নবী

---

[144] মুকামুর রাশাদ ১/২৫ পৃষ্ঠা

[145] মাওলানা আব্দুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ'আত ১৪/১৫ পৃষ্ঠা

করীম (সাঃ) তা প্রায়ই করেছেন। এখানে দুটো সুন্নাতের কোনটিই আলোচ্য নয়।

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ফিক্বহের পরিভাষায় সুন্নাতের একটি অর্থ, ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য আমল। তবে সুন্নাতের মৌলিক অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক জীবন আদর্শ। ফরয, ওয়াজিব ও নফল সবকিছুর উপর সুন্নাতের ব্যবহার হাদীসে প্রসিদ্ধ।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শই দীন। জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বের তারতম্য থেকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইবাদতের মধ্যে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মানেই দীনের মধ্যে তাহরিফ বা পরিবর্তন। দীনকে আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ করার ঘোষণা[146] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ঘোষণা[147] দিয়ে দিয়েছেন। তাই কোনো ধরণের কম-বেশি, যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যে ইবাদত যেভাবে করেছেন তা তখন সেভাবে করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে তা খেলাফে সুন্নাত বলে অগ্রাহ্য হবে।

[146] সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৩।

[147] সূরা আহযাব, আয়াত: ২১।

সুন্নাতের প্রকারভেদঃ অনুসরণ ও বর্জনের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণের ক্ষেত্রে সুন্নাত দুই প্রকারঃ

১. **সুন্নাতেফে'লিয়্যাহঃ** (তথা কর্মে সুন্নাত)। সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলের প্রত্যেকটি আমল প্রতি পদে মেনে চলেছেন। আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব, আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, তার জন্য কোন নির্দেশ ছেড়ে দিয়ে আমি যেন পথভ্রষ্ট হয়ে না যায়। (বুখারী হা/৩০৯৩, মুসলিম হা/১৭৫৯)[148]।

২. **সুন্নাতে তারকিয়্যাহঃ** (তথা বর্জনে সুন্নাত)। রাসূল (সাঃ) যে ইবাদত করেননি, করতে বলেননি এবং সম্মতি প্রদান করেননি এমন ইবাদত বর্জন করাই সুন্নাত।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, 'সুন্নাহ্' তার মূলগত অর্থের দিক দিয়ে যা মৌলিক আদর্শ রীতি-নীতি, পথ, পন্থা ও পদ্ধতি বোঝায়। বস্তুত এ হিসেবে সুন্নাহ্ হলো সেই মূল আদর্শ, যা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-মানবের জন্যে নাযিল করেছেন, যা রাসূলে করীম (সাঃ) নিজে তার বাস্তব জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল

---

[148] বুখারী হা/৩০৯৩, মুসলিম হা/১৭৫৯

ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে পেশ করেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে।

সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে নেওয়াই একজন মুমিনের কর্তব্য। তার জীবনাদর্শের বাইরে যাওয়ার চিন্তা করা মুমিন কল্পনা করতে পারেন না। সুন্নাতের বাইরে যাওয়াকে তিনি তার আখিরাতের ঝুঁকি মনে করেন। মুমিন জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত না হয়ে হুবহু নবীর আদর্শের উপর থাকাকেই কর্তব্য মনে করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তাকে এক সুঁতো পরিমাণ বাইরে যেতে দেয় না। কদাচিৎ এমন হয়ে গেলে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

«ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ». (صحيح مسلم، كتاب

الايمان، باب كون النهي عن المنكر من الايمان...،
(رقم:188)

"আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোনো জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তার এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমনসব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন, যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানা পরিমানও ঈমান নেই।"[149]

সুন্নাতের উপর থাকার গুরুত্ব এবং এর বাইরে যাওয়ার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। কুরআনের একাধিক জায়গা এবং একাধিক হাদীসে এ বিষয়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় সুন্নাত নয়, তাই আর কোনো আয়াত বা হাদীস উল্লেখ করছি না।

---

[149] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ....,নং: ১৮৮।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাব'য়ি তাবিঈন, অনুসৃত চার ইমাম সহ কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগের আলেমগণ উপরোক্ত হাদীসের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দীন তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ রক্ষা করার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন নায়েব তৈরী করেছেন। যুক্তি বা বিবেক দ্বারা দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন, ইবাদতে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সজাগ থেকে সর্বদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সংরক্ষন করার চেষ্টা করেছেন এবং সক্ষম হয়েছেন। সুন্নাতের বাইরে যাওয়া মানেই ভ্রান্তির পথ উম্মুক্ত করা এ কথা বুঝতে তাদেরকে বেগ পেতে হয় নি। সর্বযুগেই আল্লাহ তা'আলা এমন একদল লোকের মাধ্যমে তার নবীর সুন্নাতকে রক্ষা করবেন যারা নবীর হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার চেষ্টা করবেন।

সুন্নাতের বাইরে কিছু দেখলেই যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দল বা তাদের সহযোগী হিসেবে কবুল করুন। শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী[150] রাহ.

---

[150] হিন্দের প্রখ্যাত মুহাদ্দীস, আহমদ ইবন আব্দুর রহীম আশ-শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী। যার তাজদীদি বা সংস্কারমুলক কর্ম আরব 'আজম সর্বজন স্বীকৃত। তার লিখিত বিভিন্ন কিতাব এর জলন্ত প্রমান। জন্ম: ১১১৪ হিজরী, ওফাত: ১১৭৬ হিজরী। আফসোসের বিষয়, উপমহাদেশের এ মহান ব্যক্তিত্বের নাম আমাদের মুখে থাকলেও তার চিন্তাধারার বাস্তব কোনো মূল্যায়ন আমাদের মাঝে নেই। তাঁর চিন্তাধারা ও তাঁর রচনা সমগ্রের বাস্তব মূল্যায়ন আরব আলেমগণ করে থাকেন। তাঁর রচনা তাদের পাঠ্য সিলেবাস এর প্রমাণ।

সুন্নাতের উপর থাকার গুরুত্ব বুঝাতে উপরোক্ত হাদীস সহ আরো কিছু হাদীস উল্লেখের পূর্বে লিখেন,

" قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مداخل التحريف بأقسامها . وغلظ النهي عنها ، وأخذ العهود من أمته فيها ، فمن أعظم أسباب التهاون ترك الأخذ بالسنة ".

‘‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সর্বপ্রকার তাহরিফ তথা দীনের বিকৃতি প্রবেশ করানো থেকে সতর্ক করেছেন, তাহরিফ থেকে কঠোর নিষেধ করেছেন, উম্মত থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, এ ব্যাপারে শিথিলতার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সুন্নাতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া...’’[151]

এরপর তিনি হুবহু সুন্নাতের অনুকরণ না করার সতর্কতা সম্বলিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করেন। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় তা উল্লেখ করছি না। পাঠকের কাছে তার এই আলোচনাটি দেখে নিতে অনুরোধ রইল। সারকথায় তিনি সুন্নাতের মধ্যে কম বেশ, সংযোজন, বিয়োজন, বাড়াবাড়ি সবকিছুকেই দীনের তাহরীফ বা বিকৃতি গণ্য করেছেন এবং তা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

[151] মুহাদ্দিসে দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, কিতাব ও সুন্নাত আকড়ে ধরা অধ্যায়, ১/৩৫৭।

সারকথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতিই সুন্নাত। যা তিনি ফরয হিসেবে করেছেন তা ফরয হিসেবে পালন করা সুন্নাত। যা নফল হিসেবে করেছেন তা নফল হিসেবে পালন করা সুন্নাত। যা সর্বদা করেছেন তা সর্বদা করা, যা মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করা সুন্নাত। যা সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করা, যা মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করা সুন্নাত। যেই কাজ যেই পদ্ধতিতে করেছেন তা সেই পদ্ধতিতে পালন করাই সুন্নাত। কোনো কিছুতে বেশ কম হলেই খেলাফে সুন্নাত বলে গণ্য হবে। করণীয় বর্জনীয় সকল ক্ষেত্রে তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুনঃ

"جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم:4776)

“তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট গিয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন বলে মনে হলো। তারা বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহ্গার উম্মত, আমাদের উচিৎ তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করা) তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে নামায পড়ব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা রোজা রাখব, কখনই রোজা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব, কখনো বিবাহ করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা জানতে পেরে তাদের কাছে এসে বললেন: তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ তাক্বওয়াবান। তা সত্বেও আমি মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখি, আবার মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় নফল সালাত আদায় করি আবার কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করি। যে ব্যক্তি আমার

সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”[152]

পাঠক, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। এখানে তিনজন সাহাবীর কেউই নাজায়েয কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন নি। প্রত্যেকেই ভালো কাজের নিয়ত করেছেন। নফল নামায কতই না উত্তম ইবাদত, নফল সালাতের মাধ্যমে সময় কাটানো মুমিনের উত্তম ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[153] নফল সিয়াম পালন করা কতই না উত্তম কাজ। বেশি বেশি ইবাদতের জন্য বিবাহ শাদিতে নিজেকে জড়িত না করা কতই না উত্তম নিয়ত বা কল্পনা। তথাপি এই কর্মগুলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত অপছন্দ বলে আখ্যায়িত করলেন তার কারণ কি? সাধারণ অপছন্দ নয়, এমন অপছন্দ যার কারণে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না। বাহ্যত তাদের এমন নিয়তের উপর নবীজীর বাহবা দেওয়ার কথা ছিল। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক বাহবামুলক শব্দ প্রয়োগ করে, আমি যা পারি না তোমরা তা করছ বলে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরার

[152] সহীহুল বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, নিকাহের প্রতি উৎসাহ অনুচ্ছেদ, নং: ৪৭৭৬।

[153] সুয়ূতী, আল-জামি‘উল কবীর, হামযা হরফে হাদীস, নং: ৭৯৩৫, আলবানী, সহীহ ওয়া দ‘য়ীফুল জামি‘য়িস সাগীর, নং: ৭৩১৭, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, তারগীব ফিস সালাত অনুচ্ছেদ, নং:৩৯০, হাদীসটি হাসান। হাদীসের ইবারতটি হচ্ছে: “ الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر ”

কথা। আমাদের যুক্তি বা সমাজের বাস্তব চিত্র এমনটিরই দাবী রাখে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্টো তাদের উপর রাগ করলেন কেন? বাহ্যত বিষয়টি একটু উল্টো মনে হলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের জন্য এর রহস্য বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা ইবাদত মূলত কম বা বেশি করার নাম নয়। বরং আল্লাহর হুকুম তাঁর রাসূলের পদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ করে পালনের নাম। এখানে যদিও মূল ইবাদতের মধ্যে পূর্ণ অনুসরণের বৈপরিত্য নেই, তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের সাথে বৈপরিত্য আবশ্যই। কেননা, রাত কাটাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে, কিছু সময় সালাত আদায় করা, কিছু সময় ঘুমানো। যিনি সারা রাত সালাতে কাটাচ্ছেন তাঁর আমল বেশি হলেও রাত কাটানোটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নয়। ঠিক এমনিভাবে সিয়াম ও বিবাহের বিষয়টিও। এমন আমলকারীর মনে ধীরে ধীরে সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা জন্ম নেয়। সুন্নাত মোতাবেক চলা তার কাছে কম মনে হয়। যেমনটি সাহাবীদের মত ব্যক্তিত্বের মনে জড় বাঁধতে শুরু করেছিল বলে বর্ণিত হাদীস থেকেই আমরা বুঝতে পারছি। এটি একটি বাস্তব বিষয় যা আমরা আমাদের সমাজ বা আমাদের নিজ থেকেই যাচাই করতে পারি। যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি রাতে এশার সালাত জামাতে আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন, রাতের শেষভাগের দিকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং ফজরের সালাত জামাতে আদায়

করেন। আরেক ব্যক্তি এশা এবং ফজর জামাতে আদায়ের সাথে সাথে সারা রাত জেগে সালাত আদায় করেন, স্বাভাবিকত দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে একথা জড় পাকাবে যে, আমি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদত করছি, তার থেকে আমার কাজ উত্তম, কেননা সে কিছু সময় ঘুমিয়ে নামাযের মত শ্রেষ্ট ইবাদত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আল্লাহর শোকর আমি বঞ্চিত হচ্ছি না। তার মনে একথার জড় না পাকালে তিনি প্রথম ব্যক্তির মত কিছু সময় ঘুমানোর কথা। যদি আমরা ধরেই নেই যে, তিনি এমন মানুষ যার মাঝে এমন কল্পনা আসতে পারে না, তবে অন্য মানুষের মনে একথার বীজ অবশ্যই বপন হবে। সমাজের সাধারণ থেকে নিয়ে বড় বড় ব্যক্তিত্বের কথাবার্তা থেকে এমন বিশ্বাস পাওয়া যায়।

যেমন কেউ সারা রাত জেগে ইবাদত করলে তাকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি তুলে ধরা হয় বা বেশি পরহেযগার মনে করা হয়, যিনি রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেছেন আবার ঘুমিয়েছেন। যেমন বলা হয়, অমুক এত বছর ঘুমাননি, অমুক এত বছর এক অযু দিয়ে এশা এবং ফজর আদায় করেছেন[154]। এবার আপনি প্রথম ব্যক্তি ও

[154] কারো মনে আসতে পারে, আবু হানিফা রাহ. যেহেতু ৪০ বছর এক ওযু দিয়ে এশা ফজর আদায় করেছেন বলে শুনা যায়, অতএব তার চল্লিশ বছর খেলাফে সুন্নাত ভাবে রাত কেটেছে, অথচ এমন রাত কাটানো শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছেন। অধমের খেয়াল মতে এ সব হচ্ছে প্রশংসা না বুঝে প্রশংসায় সীমালঙ্গন। এসব কথার যেহেতু সহীহ কোনো ভিত্তি নেই, সুতরাং আবু হানিফার মত মহান পন্ডিত, মুজতাহিদ, যিনি হবহু সুন্নাতের অনুসরণ থেকে এক চুল পরিমান সরতে চান না, বিদ‘আত সন্দেহ হলে যিনি সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন,অনেক মাসআলা মাসাঈল যার

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সাথে তুলনা করুন। প্রথম জনের রাতের ইবাদত কম, তবে রাত কেটেছে সুন্নাত মোতাবেক। দ্বিতীয় জনের রাতের ইবাদত বেশি, তবে তাঁর রাত হুবহু সুন্নাত মোতাবেক কাটেনি। এই দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বিতীয় ব্যক্তির রাত কাটানোকে উত্তম মনে করা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞার নামান্তর। কেননা যার রাত কাটানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলল তাকে অনুত্তম, আর যার রাত কাটানো তাঁর সাথে মিলেনি তাকে উত্তম মনে করা সুন্নাতকে অনুত্তম মনে করা ছাড়া কিছু নয়। এভাবে লোকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে সরে যাওয়া এবং অন্য পদ্ধতিকে উত্তম জ্ঞান করা তাঁর মনে স্থান নিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে তাঁর ইবাদত বেশি এ কথা দিলে বদ্ধমুল হবে। আর এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত সাহাবীদের উপর তাদের নিয়ত মহৎ থাকা সত্বেও রাগ করেছেন।

মোটকথা সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদেরকে মুত্তাবি‘য়ি সুন্নাত বা সুন্নাত অনুসারী বলে দাবী করতে পারব। নামাযে তার কি শিক্ষা, তিনি কীভাবে তা আদায় করতেন, কোনো

প্রমাণ বহন করে, এমন ব্যক্তির দিকে এ সব কথা সম্পৃক্ত করার কোনো যুক্তি বা প্রয়োজন নেই।

নামাযকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন। রোজার ক্ষেত্রে তার কি শিক্ষা, তিনি কোনো রোজা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতেন। এভাবে প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তার কি শিক্ষা, কি পদ্ধতি সবকিছুই আমাদেরকে তাকে ফলো করতে হবে।

কুরআন তেলাওয়াতে তাঁর কি শিক্ষা, তিনি কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কী উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতেন, তাঁর আদর্শ থেকে গ্রহণ করতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহাবীদের কি শিক্ষা দিলেন, সাহাবীরা হাদীসের সাথে কি আচরণ করলেন, তাঁর হাদীসের মাধ্যমে আমাদের কী করা উচিত, সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বিদ্যমান। এভাবে কালেমার ক্ষেত্রে তিনি কী শিক্ষা দিলেন, যিকরের বেলায় তার শিক্ষা কী, তিনি যিকরে কী কী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তিনি কোন যিকর কোন পদ্ধতিতে করতেন তা জেনে সেই পদ্ধতিতেই আমল করতে হবে।

অনুরূপ তাসমিয়া, দো'আ, এক কথায় কোনো আমলের ক্ষেত্রেই তার শিক্ষা ও আদর্শের বাইরে যাওয়া যাবে না। তার আদর্শের ব্যতিক্রম করতে কোনো যুক্তি যোগ করা যাবে না। তবেই আমরা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে নিজেকে দাবী করতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তার রাসূলের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করার তওফিক দিন। আমীন।

হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ

মুহাদ্দিছীনে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনারা প্রধানতঃ হাদীস বা সুন্নাহ্ কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

(১) مَرْفُوْعٌ (মারফূ')

(২) مَوْقُوْفٌ (মাওকূফ) ও

(৩) مَقْطُوْعٌ (মাকতূ')।

(১) مَرْفُوْعٌ (মারফূ'): مرْفوعُ এর আভিধানিক অর্থ উঁচু, উত্তোলিত বস্তু ও উচ্চ শিখরে উন্নীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস সনদের সর্বশেষ ও উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়, তাই এ প্রকার হাদীসকে মারফূ' বলা হয়।

'মারফূ''র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত কথা, অথবা কর্ম, অথবা সমর্থন, অথবা তার চারিত্রিক ও শারীরিক গঠনের বর্ণনা; হোক স্পষ্ট মারফূ' কিংবা হুকমান মারফূ'। সাহাবী তার সাথে সম্পৃক্ত করুক কিংবা তাবে'ঈ কিংবা তাদের পরবর্তী কেউ, সকল প্রকার মারফূ'র অন্তর্ভুক্ত"।

অতএব মারফূ‘র সংজ্ঞায় মুত্তাসিল, মুরসাল, মুনকাতি‘, মু‘দ্বাল ও মু‘আল্লাক অন্তর্ভুক্ত, তবে মাওকুফ ও মাকতু’ অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল-খাতীব আল-বাগ্‌দাদী বলেনঃ “একটি মারফূ’ হাদীসের বর্ণনা একজন সাহাবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; তার বাইরে নয়।”

সুতরাং, মারফূ হাদীস বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার কথা, কাজ, মৌন সম্মতিকে। অর্থাৎ যে হাদীস - এর সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকেই ‘মারফূ’ হাদীস বলে।

মারফূ হাদীসকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(ক) مَرْفُوْعُ قَوْلِىْ (মারফূ’ ক্বওলী),

(খ) مَرْفُوْعُ فِعْلِىْ (মারফূ’ ফে’লী)

(গ) مَرْفُوْعُ تَقْرِيْرِىْ (মারফূ’ তাক্বরীরী)

নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

(ক) مَرْفُوْعُ قَوْلِىْ (মারফূ’ ক্বওলী): উছূল শাস্ত্রবিদ ওনাদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার মুখ মুবারক নিসৃত বাণী মুবারককে মারফু’ ক্বওলী হাদীস বলে।

এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "শুধুমাত্র হযরত রাসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মুখ মুবারক নিসৃত বানী মুবারককে মারফু' ক্বওলী হাদীস বলে।" (উছুলুল আসার)।

যেমন, ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

"নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের সাথে গ্রহণযোগ্য হয়, আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়ার জন্য যা সে উপার্জন করবে, অথবা নারীর জন্য যাকে সে বিয়ে করবে, তাহলে সে যে জন্য হিজরত করেছে তার হিজরত সে জন্য গণ্য হবে। [তথ্যসূত্রঃ বুখারী: (১), মুসলিম: (৩৫৩৭)][155]।

বর্ণিত হাদীসটি যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার সরাসরি যবান মুবারক নিসৃত বাণী এবং এর 'সনদ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার পর্যন্ত পৌঁছেছে তাই উক্ত হাদীসটি মারফূ ক্বওলী হাদীস - এর অন্তর্ভুক্ত।

---

[155] বুখারী: (১), মুসলিম: (৩৫৩৭)

(খ) مَرْفُوْعُ فِعْلِىْ (মারফূ’ ফে’ল): রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যা আমল করে বাস্তবে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন তাকে মারফূ’ ফে’লী হাদীস বলে। যেমন, আবদান (রঃ) ..... উমায়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

“আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাঁর পাগড়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি।’ মা’মার (রঃ) আমর (রঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তা করতে দেখেছি।”[156] বর্ণিত হাদীসটি যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার সরাসরি ফে’ল বা আমল এবং এর ‘সনদ’ আখিরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার পর্যন্ত পৌঁছেছে তাই উক্ত হাদীসদ্বয় মারফূ’ ফে’লী হাদীস - এর অন্তর্ভুক্ত।

---

[156] উজু অধ্যায় :: সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৪ :: হাদীস ২০৪

(গ) مَرْفُوْعُ تَقْرِيْرِىْ (মারফূ’ তাক্বরীরী): আখিরী রসূল (সাঃ) তিনি যে ব্যাপারে কোন কথা বলেননি এবং নিজে কোন কাজও করেননি বরং হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনারা ওনার সামনে কোন কথাবার্তা বলেছেন কিংবা কোন কাজ-কর্ম করেছেন আর আখিরী রসূল (সাঃ) তিনি তাতে নিরবতা পালন কিংবা সম্মতি প্রদান করেছেন তাকে মারফূ’ তাক্বরীরী হাদীস বলে। যেমনঃ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক দাসীকে বলেনঃ

«أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

“আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি বলেন: আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেনঃ তাকে মুক্ত কর, কারণ সে মুমিন”। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদির কথা প্রত্যাখ্যান না করে সমর্থন করেছেন, তাই বাদীর কথা তার কথা হিসেবে গণ্য। এটা তার তাকরির বা সমর্থন।

(২) مَوْقُوْفٌ (মাওকূফ): সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনাদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে মাওকূফ হাদীস বলে। যা রাসূল (সাঃ) ওনার বরাত না দিয়ে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনারা নিজেরাই বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ যার 'সনদ' হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ ধরনের হাদীসের উদাহরণ হল 'আলী ইবনু আবি তলিব (রাদ্বিআল্লাহু 'আনহু) এর এই কথাগুলো নিম্নরূপঃ-

"ভালবাসার মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করবেন না; কারণ হতে পারে একদিন হয়ত আপনিই তাকে ঘৃণা করতে পারেন। আবার কাউকে ঘৃণা করার ক্ষেত্রেও চরমপন্থা অবলম্বন করবেন না; কারণ হতে পারে আপনিই একদিন তাকে ভালবাসতে পারেন।" [সহীহ্ আল-বুখারী; অধ্যায়ঃ আদাবুল মুফ্রাদ, হাদীস নং - ৪৪৭][157]।

আল হাকিম এর মত অনুযায়ী কোন হাদীস মাওকূফ বলে বিবেচিত হতে হলে হাদীসটিকে আরেকটি শর্ত পূরণ করতে হবে আর তা হল হাদীসটির ইসনাদ (হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে; এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে) সম্পূর্ণ হতে হবে এবং কোন ক্ষেত্রে তা বিঘ্নিত হওয়া যাবে না।

মাওকূফ পরিভাষাটি সাহাবাগণ ছাড়া অন্যান্যদের দ্বারা বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে উল্লেখ করতে

[157] সহীহ্ আল-বুখারী; অধ্যায়ঃ আদাবুল মুফ্রাদ, হাদীস নং - ৪৪৭

হবে যে, অমুক হাদীসটি মাওকূফ যার বর্ণনা আল-জুহ্‌রী কিংবা আল-‘আতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যারা দু’জনেই তাবিঈ ছিলেন বা তাবিঈদের অনুসরণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, মারফু হাদীস - এর ন্যায় মাওকুফ হাদীসও তিন প্রকার।

(ক) مَوْقُوْفُ قَوْلِىْ (মাওকুফ ক্বওলী): যা সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনারা বলেছেন।

(খ) مَوْقُوْفُ فِعْلِىْ (মাওকুফ ফে’লী): যা সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনারা আমল করেছেন।

(গ) مَوْقُوْفُ تَقْرِيْرِىْ (মাওকুফ তাক্বরীরী): সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনারা যে কাজে বা কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

(৩) مَقْطُوْعٌ (মাক্বতূ’): مقْطوعُ এর আভিধানিক অর্থ কর্তিত, বলা হয়, العضو المقطوع ‘কর্তিত বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ’। এ থেকে তাবে’ঈদের কথা ও কর্মকে মাকতু’ বলা হয়, কারণ তাদের বাণী ও কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের কথা ও কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন।

হযরত তাবিয়ীন রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনাদের কথা-কাজ ও মৌন সম্মতিকে মাক্বতূ’ হাদীস বলে। অর্থাৎ যার ‘সনদ’ হযরত তাবিয়ীন

রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকেই 'মাক্বতূ' হাদীস বলে। উদাহরণস্বরূপ, মাস্‌রূক ইবনুল আজ্‌দা (রাহিমাহুল্লাহ্‌) এর কথাগুলো মাকতূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত জ্ঞানই হল যথেষ্ট জ্ঞান আর নিজের কর্ম সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করাই হল যথেষ্ট মূর্খতা বা অজ্ঞতা।"

ইবনুল সালাহ্‌ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেনঃ "ইমাম আল শাফে'ঈ, আবুল কাশেম আল-তাবারানী এবং অন্যান্যদের ভাষ্য অনুযায়ী "মাকতূ'" পরিভাষাটিকে আমার কাছে "মুনকাত" (যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম ধারাবাহিকভাবে সুসজ্জিত নয় অর্থাৎ, বিঘ্নিত) পরিভাষাটির বিপরীত বলে মনে হয়েছে।" [মুকাদ্দিমাত ইবনুল সালাহ্‌ ফী 'উলুম আল-হাদীস; পৃষ্ঠা নং - ২৮][158] উল্লেখ্য, মারফূ' ও মাওকুফ হাদীস - এর ন্যায় মাক্বতূ' হাদীসও তিন প্রকার।

(ক) مَقْطُوْعُ قَوْلِىْ (মাক্বতূ' ক্বওলী): যা তাবিয়ীন রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনারা বলেছেন।

(খ) مَقْطُوْعُ فِعْلِىْ (মাক্বতূ' ফে'লী): যা তাবিয়ীন রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনারা আমল করেছেন।

---

[158] মুকাদ্দিমাত ইবনুল সালাহ্‌ ফী 'উলুম আল-হাদীস; পৃষ্ঠা নং - ২৮

(গ) مَقْطُوْعُ تَقْرِيْرِىْ (মাক্বতূ’ তাক্বরীরী): তাবিয়ীন রহমতুল্লাহি আলাইহিম ওনারা যে কাজে বা কথায় সম্মতি প্রদান করেছেন। (উছূলুল আসার)।

উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ حَضَرَتْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اَدْرَكْتُ
الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ يَعْتَمُّوْنَ بِعَمَائِمَ كَرَبِيْسَ ...... خُضْرٌ

অর্থঃ “হযরত সুলাইমান ইবনে আবী আব্দুল্লাহ (তাবিয়ী) রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (ইসলামের) প্রথম দিকের সকল মুহাজিরীন (হিজরতকারী সাহাবী) রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনাদেরকে সবুজ রংয়ের সূতী কাপড়ের পাগড়ী পরিধান করতে দেখেছি।” (মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ)।

রিওয়ায়েত বা সনদ অনুসারে হাদীস -এর প্রকারভেদঃ “উসূলুল আসার এবং মীযানুল আখবার” কিতাবে উল্লেখ আছে, “সনদ অনুসারে হাদীস দু’প্রকারঃ

(১) মুতাওয়াতির এবং (২) আহাদ।

আর সনদ বলা হয়, "মতন তথা হাদীসের মূলভাষ্য পর্যন্ত পৌঁছার পরস্পর বর্ণনা সূত্রকেই সনদ বলে। (এক কথায়- হাদীসের মূল কথার বর্ণনার ধারাবাহিকতাকেই সনদ বলে।)"

(১) مُتَوَاتِرٌ (মুতাওয়াতির): متواتر শব্দের উৎপত্তি تواتر ধাতু থেকে। আভিধানিক অর্থ تتابع বা লাগাতার, যেমন বলা হয়: تواتر المطر 'লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে'। অনুরূপ বলা হয়: تواتر المصلون إلى المسجد 'লাগাতার মুসল্লি মসজিদে এসেছে'। এ থেকে লাগাতার অগণিত মানুষের বর্ণিত হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

আভিধানিক অর্থ: متواتر (মুতাওয়াতির) শব্দটি ইসমে ফায়েল-এর সীগা, যা تواتر (তাওয়াতুর) শব্দমূল থেকে উৎকলিত। অর্থ একের পর এক বা অবিরামভাবে কোনো কিছু আসা, যেমন অবিরামভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হলে বলা হয় تواتر المطر।

متواتر এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ "বৃহৎ জনসংখ্যার বর্ণিত হাদীস, মিথ্যার উপর যাদের একাট্টা হওয়া অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয়। বস্তুতঃ যে সব হাদীস-এর বর্ণনাকারী এত অধিক যে, যাদের কাউকে মিথ্যা ও সন্দেহ পোষণ করা কখনও সমীচীন নয়, সে সব ঐ হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। যেমন,

উসূলূশ শাশী কিতাবে উল্লেখ আছে, "মুতাওয়াতির ঐ হাদীসকে বলা হয় যা রাবীদের একটি জামায়াত অপর একটি জামায়াত থেকে বর্ণনা করেছেন। যাঁদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চিন্তাও করা যায় না।" অর্থাৎ মুতাওয়াতির হাদীস হলো যার বর্ণনা- পরম্পরার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে এমন বহুল সংখ্যক বর্ণনাকারী (রাবী) যারা তাদের বর্ণিত হাদীসটি জাল করেছেন বলে কোনো সংশয় সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ অভিন্ন শব্দ ও অর্থবোধক একটি হাদীস, বহুল সংখ্যক রাবী যার যার জায়গা থেকে জাল করে প্রচার করে দেবেন তা একটি অসম্ভব তথা অকল্পনীয় ব্যাপার। যেমনঃ হাদীস إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ সকল আমলের মূল্যায়ন নিয়ত অনুযায়ীই হয়। এই হাদীসটি সাত শতেরও অধিক সনদসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [شرح النخبة ص] মুহাদ্দিসগণ সাধারণত 'মুতাওয়াতির' হাদীসকে এই পারিভাষিক নামে অভিহিত করেন না। কেননা কোন হাদীসের 'মুতাওয়াতির' হওয়াটা সনদের আলোচনা পর্যায়ে গণ্য হয় না। তার কারণ এই যে, সনদশাস্ত্রে সাধারণত হাদীসের 'সহীহ' বা 'যয়ীফ' হওয়ার ব্যাপারটিই আলোচ্য- যেন হয় তদনুযায়ী আমল করা যায়, না হয় যেন তা ত্যাগ করা যায়।

উপরন্তু মুতাওয়াতির হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। তদনুযায়ী আমল করা আলোচনা ব্যতিরেকেই

ওয়াজিব। [علوم الحديث ومصطله وشرح النخبة ج-3 ص- 150 (হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং – ৪৭)[159]।

মুতাওয়াতির হাদীস প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞাঃ মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাফিয ইবন আসকালানী (রহঃ) বলেন, খবরে মুতাওয়াতির হল যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত না হয়ে এত অধিক হবে, তাদের সবাই কোন একটি মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়াকে স্বভাবত বিবেক বিরুদ্ব মনে হবে। আল্লামা মোল্লা জিউন (রহঃ) বলেন, "যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দিক থেকে সন্দেহ থাকে না, তাকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলা হয়"।

মুহাদ্দীস দেহলভী (রঃ) বলেন, যদি রাবীর সংখ্যা অসংখ্য হয় এবং তাদের সকলের মিথ্যার উপর এক মত হওয়ার অসম্ভব হয় তাহলে তাদের বর্ণিত হাদীস হল মুতাওয়াতির।

আল্লামা আবুল বারকাত আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মাহমূদ (রঃ) বলেন, মুতাওয়াতির হল এমন হাদীস যেখানে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা সীমিত নয় এবং

---

159 হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং – ৪৭

একটি মিথ্যার উপর তাদের সবারই একমত হওয়ার সন্দেহ করা যায় না।

তাদের সংখ্যাধিক্য প্রথম থেকে শুরু করে মাঝ পর্যন্ত এমন কি একেবারে শেষ পর্যন্ত সমান থাকবে"।

মুতাওয়াতিরের শর্তঃ

হাফিজ ইবন আসকালানীর উল্লিখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোনো হাদীসকে মুতাওয়াতির বলতে হলে তাতে চারটি শর্ত পাওয়া যেতে হবেঃ

১. মুতাওয়াতির হাদীসটি বহুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হতে হবে। বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কত হলে 'বহুল সংখ্যক' বলা হবে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

ক। জমহুর ওলামার মতে এই সংখ্যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।এর জন্য কেবল অধিক সংখ্যা হওয়া দরকার।

খ। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে এই সংখ্যাটি চার হওয়া উচিৎ।কারণ ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী থাকা দরকার। আল্লাহ বলেন,

তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি; [সূরা নূর, আয়াত নং -১৩]

গ। কারও মতে এই সংখ্যাটি পাঁচ হওয়া দরকার।কারণ লিআন হওয়ার জন্য এই সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়।

ঘ। কারও কারও মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা ৭ হওয়া দরকার। কারণ কারণ কুকুরে অপবিত্র পাত্র থেকে নিজেকে পবিত্র করার জন্য সাতবার ধৌঁত করতে বলা হয়েছে। একটি সপ্তাহ সম্পন্ন হয় সাতদিনে আর আসমান ও যমীনের কথা সাত বলা হয়েছে।

ঙ। কারও মতে এই সংখ্যাটি দশ হওয়া উচিৎ। কারণ দশের নীচে কোন সংখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না।

চ। কারও মতে এর সংখ্যা ১২। কারণ ঈসা (আঃ) এর সাথে ১২ জন সংগী ছিলেন এবং আল্লাহ বলেনঃ-

আল্লাহ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। [সূরা মায়িদা, আয়াত নং - ১২]

ছ। কারও মতে এই সর্বনিম্ন সংখ্যা ২০ হওয়া দরকার। যেমন আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায় [সূরা আনফাল, আয়াত নং - ৬৫]

জ। কোন কোন হাদীসবিদগণের মতে এই সংখ্যা হল ৪০। কারণ আল্লাহ বলেন, হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। [সূরা আনফাল, আয়াত নং - ৬৪] আর এই আয়াত নাযিলের সময় মুমিনের সংখ্যা ছিল ৪০।

ঝ। কারও কারও মতে এই সংখ্যাটি নিম্নসীমা হল ৭০। কারণ আল্লাহ বলেন, মূসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। [সূরা আরাফ, আয়াত নং - ১৫৫]

ঞ। আবার কোন কোন হাদীসবিদগণ বলে থাকেন যে, এই সংখ্যাটি হল ৩১৩। কারণ বদরের যুদ্বের দিন সাহাবার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১৩ জন। তবে এ ব্যাপারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত হলো, নিদেন পক্ষে দশ ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হলে তবেই তাকে বলা হবে।

২. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, বর্ণনা পরম্পরার সকল স্তরে, বর্ণনাকারীদের সংখ্যাগত এই বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকতে হবে।

৩. বর্ণনাকারীগণ মিথ্যার উপর একত্র হতে পারেন, মানুষের আকল-বুদ্ধি ও স্বাভাবিক বাস্তবতার বিবেচনায় তা অসম্ভব হওয়া। যেমন বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন দেশ ও এলাকার বাসিন্দা হওয়া, যাদের মধ্যে বিশেষ করে সে কালে পরস্পর যোগাযোগ ও যোগসাজশ

অসম্ভব থাকা। অথবা বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও যাদের প্রত্যেকের চিন্তার ধরন-ধারণ আলাদা। অতএব কোনো মিথ্যার ব্যাপারে এঁরা জোটবদ্ধ হতে পারেন, তা বাস্তবতা-রহিত অসম্ভব ব্যাপার।

৪. বর্ণনাকারীগণ ইন্দ্রীয় নুভূতির নির্ভরতায় হাদীসটি বর্ণনা করবেন। অর্থাৎ তারা বলবেন سمعنا (আমরা শুনেছি), অথবা رأينا (আমরা দেখেছি), অথবা لمسنا (আমরা স্পর্শ করেছি) এর বিপরীতে যদি বর্ণিত বিষয়টি বুদ্ধি-বিবেচনানির্ভর হয়, যেমন বলা হলো, ‘মহাবিশ্ব অনাদি কাল থেকে বিরাজিত নয়, “তবে এ প্রকৃতির ‘খবর’ মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য হবে না”।

মুতাওয়াতির দু’প্রকারঃ

১. শব্দের তাওয়াতুরঃ যে হাদীস সকল রাবী একই শব্দে বর্ণনা করেন, কতক শব্দ ব্যতিক্রম হলেও অর্থ পরিবর্তন হয় না, তাই শব্দের মুতাওয়াতির, যেমনঃ

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“আমার উপর যে মিথ্যা রচনা করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়”।[160] এ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[160] বুখারী: (১/২০০), হাদীস নং: (১০৭), আবু দাউদ: (৩/৩১৯-৩২০), ইব্‌ন মাজাহ: (১/৩২), হাদীস নং:

থেকে ৭০ (সত্তুর) থেকে অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীও রয়েছেন, তাদের থেকে ক্রমানুসারে বিরাট এক জমাত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যেখানে এ হাদীস নেই।

المتواتر اللفظي 'শাব্দিক মুতাওয়াতির' হলো যা শব্দ ও অর্থ উভয় বিবেচনায় মুতাওয়াতির। যেমনঃ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামে তার স্থান তৈরি করে নেয়। হাদীসটি সত্তর-জনেরও অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

২. অর্থের তাওয়াতুরঃ অনেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত প্রচুর হাদীস বিদ্যমান, যাদের মিথ্যার উপর একাট্টা হয়ে এসব হাদীস রচনা করা অসম্ভব, তাদের একটি হাদীসও অন্যান্য হাদীসের সাথে অর্থ ও শব্দের মিল না-থাকার করণে মুতাওয়াতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তবে একটি বিষয় রয়েছে, যা প্রত্যেক হাদীসে বিদ্যমান, তাই সে বিষয়টি মুতাওয়াতির। যেমন দো'আর সময় উভয় হাত উত্তোলন করার হাদীস। শতাধিক হাদীসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আর সময় উভয় হাত

---

(৩৬), আহমদ: (১/১৬৫,১৬৭)

উত্তোলন করেছেন, প্রত্যেকটি হাদীস খবরে ওয়াহেদ, এক হাদীসে যে ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, অপর হাদীসে তার বর্ণনা নেই, তবে সব হাদীসে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আর সময় উভয় হাত উঠিয়েছেন। অতএব দো'আর সময় উভয় হাত উঠানো মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অর্থগত মুতাওয়াতির।

অস্তিত্বঃ অত্যল্প হলেও মুতাওয়াতির হাদীসের অস্তিত্ব আছে। যেমন 'হাউজ' বিষয়ক হাদীস, চামড়ার মোজার ওপর মুসাহ করার হাদীস, ইত্যাদি। তবে আহাদ হাদীসের তুলনায় মুতাওয়াতির হাদীসের সংখ্যা অত্যল্প এতে কোনো বিতর্ক নেই। ইমাম সুয়ূতী এবং মুহাম্মদ ইবন জাফর আল-কাততানী মুতাওয়াতির হাদীস গ্রন্থের সংকলক।

হুকুমঃ মুতাওয়াতির শাব্দিক হোক বা অর্থের দিক থেকে হোক, তার উপর আমল করা ওয়াজিব। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, খবরে মুতাওয়াতিরের দ্বারা ইলমে জরুরী নাকি ইলমে নাজারী হয় তা নিয়ে আলেমদের ভিতর একাধিক মতামত রয়েছে। ইমামুল হারামাইন, আবুল হাসান আল বসরী (রঃ), আল্লামা কাবীর মতে এর দ্বারা ইলমে নাজারী প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে জমহুর উলামার মতে, মুতাওয়াতির দ্বারা একীনি ইলম তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়, ঠিক স্বচক্ষে দেখার মতোই। অর্থাৎ স্বচক্ষে

নিরাবরণভাবে কোনো কিছু দেখলে দৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে যে ধরনের নিঃসংশয় বিশ্বাস তৈরি হয়, মুতাওয়াতিরের মাধ্যমেও অভিন্ন রকমের দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়। এ কারণেই সমুদয় মুতাওয়াতির বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য, এমন নয় যে কিছু মুতাওয়াতির হাদীস গ্রহণযোগ্য, আর কিছু অগ্রহণযোগ্য। সে হিসেবে মুতাওয়াতির হাদীস পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, রবীদের অবস্থা ঘেঁটে দেখার অপেক্ষায় থাকতে হয় না। খবরে মুতাওয়াতিরের অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। তাহলে এর দ্বারা ইলমে ইয়াকীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপর আমল করা ওয়াজিব।তা পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামে তার স্থান তৈরি করে নেয়।এই হাদীসের উপর আমল করা সকলের জন্য ওয়াজিব। মুতাযিলাগণ বলে থাকেন যে, খবরে মুতাওয়াতিরের দ্বারা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। সেইসাথে তার দ্বারা ইলমে ইসতিদিলালী প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) اَحَادٌ (আহাদ): মুতাওয়াতির হাদীস এর বিপরীত হাদীসকে আহাদ বলে। এটা আবার তিন প্রকার।

(ক) غَرِيْبٌ (গরীব): غَرِيبٌ আরবী **غربة** শব্দ থেকে গৃহীত, অর্থ অপরিচিত, আগন্তুক ও বিদেশী। পরিবার ও স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন

অপর দেশে অপরিচিত ব্যক্তিকে গরীব বলা হয়। অপরিচিত হওয়াকে গুরবত, আর ব্যক্তিকে গরীব বলা হয়।

পারিভষিক সংজ্ঞা

যে সহীহ হাদীসের সনদের কোন এক স্তরে বা সম্পূর্ণ সনদের প্রত্যেক স্তরেই মাত্র একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলে। মাওলানা আব্দুর রহিম বলেন, কোন স্তরে যদি বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মাত্র একজন হয় তবে সেই হাদীস হল হাদীসে গরীব।

ব্যাখ্যা

অর্থাৎ, একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হল গারীব হাদীস।সেটা যদি সনদের সকল স্তরে যদি একজন বর্ণনাকারী থাকে আর এমন কি যেকোন স্তরে একজন বর্ণনাকারী থাকলেও তা গরীব হবে।

গরীব হাদীসের অন্যান্য নামসমূহ

কেউ কেউ খবরে গরীবের অন্য একটি নাম দিয়েছেন যা হল আল-ফারদ। হাফিয ইবন আসকালানীসহ অধিকাংশ ওলামাগণ এই শব্দদ্বয়কে আভিধানিক ও পারিভাষিকভাবে একই শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য আবার স্বয়ং, এই হাফিয ইবন আসকালানী বলেছেন, কতিপয় আলিম-উলামাবৃন্দ এই দুইটি শব্দের ভিতর

ব্যবহারের আধিক্য ও স্বল্পতা বিবেচনা করে এই শব্দদ্বয়ের ভিতর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। কারণ ফারদ ফারদে মুতলাক আর গারীব ফারদে নিসাবীর উপর ব্যবহৃত হয়।

গরীব সাধারণত তিন প্রকার

১. সনদ ও মতন উভয় গরিব, যেমন কোনো রাবীর একলা বর্ণিত মতন।

২. সনদ গরীব কিন্তু মতন গরিব নয়, যেমন কোনো রাবী স্বীয় সনদে কোনো মতন বর্ণনা করলেন, তার সাথীদের কেউ যা বর্ণনা করেনি, তবে অপর সনদে তা বর্ণিত আছে। এখানে সনদ গবির, কিন্তু মতন গরিব নয়।

৩. মতন গরীব কিন্তু সনদ গরীব নয়, এরূপ হতে পারে না। কেউ এরূপ কল্পনা করেছেন, যা সঠিক নয়, যেমন তারা নিয়তের হাদীসের সনদকে দু'ভাগ করেন: গরিব ও মাশহূর।

কারণ ১-ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব, ২-আলকামাহ, ৩-মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহিম, ৪-ইয়াহইয়া ইব্‌ন সায়িদ পর্যন্ত সনদ গরিব, ইয়াহইয়াহ ইব্‌ন সায়িদ থেকে সনদ ও মতন উভয় মাশহূর। সনদের দ্বিতীয়াংশ

ইয়াহইয়া ইব্ন সায়িদ থেকে গ্রন্থকার[161] পর্যন্ত মাশহূর। তারা সনদের প্রথমাংশের বিবেচনায় মতন গরিব ও সনদের দ্বিতীয়াংশের বিবেচনায় সনদ মাশহূর বলেন। এরূপ বলা যথাযথ নয়, কারণ মতন যখন গরিব ছিল, সনদও তখন গরিব ছিল; মতন যখন প্রসিদ্ধ সনদও তখন প্রসিদ্ধ।

যে বিশুদ্ধ হাদীস - এর বর্ণনাকারী সর্বদা একজন থাকে তাকেই গরীব হাদীস বলে। যেমন- "বাইউলওয়ালা' তথা আযাদকৃত দাস-দাসীর ওয়ারিছসত্ত্ব ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।" (মিযানুল আখবার)

এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে শুধুমাত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বর্ণনা করেছেন।

গরীব হাদীসের হুকুমঃ ১. সহী, ২. হাসান ও ৩. যঈফ সবপ্রকার হতে পারে। দুর্বল হওয়া গরীব হাদীসের প্রকৃতি। তাই মুহাদ্দিসগণ গরীব হাদীসের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না। ইমাম মালিক গরীব সম্পর্কে বলেনঃ "সবচেয়ে খারাপ ইলম গরীব, আর সবচেয়ে উত্তম ইলম প্রকাশ্য ইলম, যা একাধিক রাবী বর্ণনা করে"। আব্দুর রায্যাক বলেন: আমরা মনে করতাম গরীব ইলম ভালো, কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হল নিরেট খারাপ"।

[161] নিয়তের হাদীস বর্ণনাকারী গ্রন্থকারগণ, যেমন বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলেনঃ "তোমরা এসব গরীব লিপিবদ্ধ কর না, কারণ এগুলো মুনকার, তার অধিকাংশ দুর্বল রাবিদের থেকে বর্ণিত"। তিনি আরো বলেনঃ "সবচেয়ে খারাপ ইলম গরীব, তার উপর আমল ও ভরসা করা যায় না"।

গরীব হাদীসসমূহের ভিতর প্রসিদ্ব কিতাবঃ গরীব হাদীসসমূহের ভিতর প্রসিদ্ব কিতাব হল আল-আফরাদ ও গারাইবু মালিক যা দারকুতনীকৃত। আর আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী এর উপর এক খানা কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

(খ) عَزِيْزٌ (আযীয): عزيز শব্দ عز থেকে সংগৃহীত, আভিধানিক অর্থ শক্তিশালী। কেউ শক্তিশালী হলে বলা হয়: عَزَّ فُلاَنٌ একজন রাবীর কোনো সংবাদ দেওয়ার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাবী একই সংবাদ দিলে সংবাদটি 'আযীয' বা শক্তিশালী হয়। সংবাদদাতার সংখ্যা বেশী হলে সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এ থেকে দু'জন বা তিনজন রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'আযীয' বলা হয়। মূলতঃ এটি সিফাতে মুশাব্বাহ। আযযা ইয়াইযযু থেকে।এর অর্থ স্বল্প ও বিরল।যেহেতু এই সকল হাদীসের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য কিংবা এখানে রাবীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির ও মাশহূরের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে তাই একে আযীয বলা হয়। অথবা আযযা ইয়াআযযু। যার অর্থ হল শক্তিশালী ও মযবূত হওয়া। যেহেতু অন্য আরেকটি

সনদ দ্বারা এর শক্তি বৃদ্বি পায় তাই এর এই নামকরণ হয়েছে। ‘আযীয’-র পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় যে, ‘দু’জন অথবা তিনজন রাবীর বর্ণিত হাদীস আযীয’। সনদের কোনো স্তরে যদি দু’জন অথবা তিনজন রাবি থাকে, অন্যান্য স্তরে রাবীর সংখ্যা দুই বা দু’য়ের অধিক থাকলে হাদীস আযীয।

যেমনঃ

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّ اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلِدِهِ وَالنَّسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থঃ “তোমাদের মধ্যে কেউই কামিল মুমিন হতে পারবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতা এমনকি সকল মানুষের চেয়ে আমাকে বেশী মুহব্বত না করবে।” রাসূল (সাঃ) ওনার থেকে এ হাদীসটি শুধু আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওনারা বর্ণনা করেছেন।

‘আযীযে’র আরেকটি উদাহরণঃ

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»

وقال الإمام البخاري -رحمه الله- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস দু'জন সাহাবীঃ আবু হুরায়রা ও আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে দু'টি সনদে বর্ণনা করেন। তাই এতে সাহাবীর স্তরে দু'জন রাবী বিদ্যমান।[162]

অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে দু'জন তাবে'ঈ বর্ণনা করেন: কাতাদাহ ও আব্দুল আযীয ইব্‌ন সুহাইব। অতএব তাবে'ঈর স্তরে দু'জন রাবী বিদ্যমান। অতঃপর কাতাদাহ থেকে দু'জন রাবী বর্ণনা করেন: শু'বা ও সায়িদ ইব্‌ন আবী 'আরুবাহ। আবার আব্দুল আযীয থেকে দু'জন রাবী বর্ণনা করেন: ইসমাইল ইব্‌ন 'উলাইয়্যাহ ও আব্দুল ওয়ারেস ইব্‌ন সায়িদ। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের থেকে একদল রাবী বর্ণনা করেন। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায়

[162] হাদীসটি ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা [হাদীস নং : ১৪] ও আনাস ইব্‌ন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা [হাদীস নং : ১৫] থেকে দু'টি সনদে এবং ইমাম মুসলিম একটি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী 'আনাস' থেকে দু'টি সনদ উল্লেখ করেছেন, তাই ইমাম মুসলিমের বর্ণনা উল্লেখ করেনি, কারণ মুসলিমও 'আনাসে'র ছাত্র কাতাদাহ, কাতাদার ছাত্র শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শু'বার ছাত্রদের থেকে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা ভাগ হয়েছে। আনাস থেকে বর্ণিত মুসলিমের হাদীস নং: (৪৬)

যে, যে সমস্ত হাদীস - এর বর্ণনাকারী সর্বযুগে কমপক্ষে দু'জন থাকে তাকে হাদীসে আযীয বলে।

খবর বিশুদ্ব হওয়ার জন্য আযীয হওয়া জরুরী কিনা

আবূ যুবায়র বলেন, খবর শুদ্ব হওয়ার জন্য বর্ণনাকারী দুইজন থাকা দরকার।

আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (রহঃ) বলেন, যেকোন হাদীস বিশুদ্ব হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুইজন বর্ণনাকারী থাকা অত্যাবশ্যক।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে, হাদীস শুদ্ব হওয়ার জন্য একজন বর্ণনাকারী হলেই হয়।

তাদের যুক্তি হল এই যে, যদি একজন বর্ণনাকারীর দ্বারা হাদীস অশুদ্ব হয় তাহলে সহীহুল বুখারীর প্রথম হাদীস তথা "মানুষের কর্মফল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" এ হাদীসটি অশুদ্ব হত। কারণ তা কেবলমাত্র উমার (রাঃ) প্রথমে বর্ণনা করেছেন এবং পরবর্তীতে তা অনেকে বর্ণনা করেছেন।

আযীযের হুকুমঃ সহী, হাসান ও দুর্বল সকল প্রকার হতে পারে।

আযীযের উপর কিতাবঃ ওলামাগণ এই গ্রন্থের উপর তেমন কোন কিতাব রচনা করেন নাই,কারণ এর উপর রচিত কিতাবের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

(গ) مَشْهُوْرٌ (মাশহূর): "مَشْهورٌ" এর আভিধানিক অর্থ প্রসিদ্ধ। এই শব্দটি শহুরাত থেকে এসেছে যার অর্থ হল সবার কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য। এর বহুবচন হল মাশাহীর যার অর্থ হলঃ well known, widely known, famous known, wide spread ইত্যাদি। যে সমস্ত হাদীস - এর সর্বযুগে সর্বস্তরে কমপক্ষে দু'য়ের অধিক কিংবা তার চেয়ে আরো অধিক বর্ণনাকারী রয়েছে, তবে মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌছেনা বরং তার চেয়ে বর্ণনাকারী কম হয়, সে সব হাদীসকে মাশহূর হাদীস বলে। যথা -

اِنَّ اللهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا

অর্থঃ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাক তিনি হঠাৎ করে ইল্মকে একেবারেই উঠিয়ে নিবেন না।"

এ হাদীস - এর রাবী সর্বযুগে সর্বকালে দু'য়ের অধিক রয়েছে।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে সব হাদীসের বর্ণনাকারী তিন বা তিনের অধিক হবে কিন্তু মুতওয়াতির পর্যন্ত পৌছাবেনা,এমন হাদীসকে মাশহুর হাদীস বলে।

উদাহরণ নবী করিম (সাঃ) এর বাণী, আল্লাহ বান্দাদের থেকে ইলম ছিনিয়ে নেন না বরং আলিমদের উঠিয়ে ইলম উঠিয়ে নিন। উসূলবিদগণ একে খবরে মুতাওয়াতির এবং আহাদের মাঝামাঝি পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।তাদের মতে এটি প্রথম যুগে খবরে আহাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ২য় ও ৩য় যুগে এটি প্রসিদ্বি লাভ করেছিল।

ফকীহগণের পরিভাষায় একে মুসতাফীয বলা হয়। মুসতাফীয শব্দটি ইসতিফায থেকে এটি ইসমে ফায়িল। আরবী প্রবচন ফাযাল মাউ থেকে এর উৎপত্তি। এখন এই মাশহূর ও মুস্তাফীয এক শব্দ কিনা তা নিয়ে ওলামাদের ভিতর মতবিরোধ রয়েছে। এই ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায় যা হলঃ

১। কারও মতে এই দুটি একই শব্দ।তাদের মতে মাশহূর হাদীস মুস্তাফীয। মাশহূর হাদীসটি প্রসিদ্বি লাভের কারণে তা মুস্তাফীয হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

২। আবার কারও মতে তা কেবল মাত্র বর্ণনাকারীদের প্রতি স্তরে সংখ্যার তারতম্যের কারণে এর সংখ্যা ভিন্ন থেকে ভিন্ন হয়। যদি প্রত্যেক স্তরে রাবীর সংখ্যা ঠিক থাকে তাহলে তা মুস্তাফীয হবে। যেমনঃ সকল স্তরে তিন, আবার সকল স্তরে চার ইত্যাদি। আর

প্রত্যেকটি স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যার তারতাম্য থাকে তাহলে তা মাশহূর হিসেবে খ্যাত থাকবে। যেমন কোন স্তরে তিন,আবার কোন স্তরে চার আবার এভাবে করে পাঁচ আবার সাত ইত্যাদি।

৩। কতিপয় ফকীহগণের মতে, মুস্তাফীয সেই ধরনের হাদীস যার অনুসরণকারীগণ বর্ণনাকারীগর সংখ্যা গণনা না করে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়। আর মাশহূর হল এমন হাদীস যা অনুসারীগণ বর্ণনাকারীর সংখ্যার উপর গুরুত্বারোপ করে তা গ্রহণ করে থাকে।

মাশহূর প্রধানত দু'প্রকারঃ ক. সাধারণের নিকট মাশহূর এবং খ. আলেমদের নিকট মাশহূর।

ক. সাধারণের নিকট হাদীস মাশহূর হওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাদের নিকট অনেক জাল হাদীসও মাশহূর, যেমনঃ

«حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ»

"দেশ প্রেম ঈমানের অংশ"।

সাধারণ লোকেরা এ হাদীসকে সহি হিসেবে জানে, অথচ সহী নয়। তার অর্থও ভুল, কারণ দেশপ্রেম গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা। তাই

তাদের নিকট মাশহূর হাদীস মূল্যহীন। এ প্রকার হাদীসের উপর অনেক মুহাদ্দীস স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন, যেমনঃ

"تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث".
"المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة"
"كشف الخفا ومزيل الألباس فيما اشتهر من الأحاديث في ألسنة الناس"

খ. আলেমদের শ্রেণীভাগ হিসেবে তাদের নিকট প্রসিদ্ধ হাদীস বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়: মুহাদ্দিসদের নিকট মাশহূর, ফকিহদের নিকট মাশহূর, ভাষাবিদদের নিকট মাশহূর ইত্যাদি। যেমনঃ

«لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»

"সন্তানের কারণে পিতা থেকে কিসাস নেয়া হবে না"।[163] এ হাদীস কুরআন বিরোধী। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

(وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥)
[المائدة: ٤٥]

[163] তিরমিযী: (১৪০০), দারা কুতনি: (৩২৫২)

"আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম"।[164]

এ আয়াতে কিসাস থেকে পিতাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেনঃ

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨) [البقرة: ١٧٨]

"হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে

[164] সূরা মায়েদা: (৪৫)

আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত।

সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব”।[165] এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অপর সহী হাদীসেরও বিপরীত, যেমনঃ

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقُتِلَ بِهِ»

“তিনটি অপরাধের কোন একটি ব্যতীত মুসলিমের রক্ত হালাল নয়ঃ বিবাহের পর যেনা করা, অথবা ইসলামের পর মুরতাদ হওয়া, অথবা কাউকে বিনা অপরাধে হত্যা করা, এর বিনিময়ে হত্যা করা হবে”।[166] এখানেও কিসাস থেকে পিতাকে মুক্ত রাখা হয়নি।

হুকুমঃ অতএব মাশহূর হাদীস কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী তাই গ্রহণীয় নয়।

---

[165] সূরা বাকারা: (১৭৮)

[166] তিরমিযী: (২০৮৪)

বিভিন্ন প্রকার হাদীসঃ এছাড়াও আরো অনেক প্রকারের হাদীস রয়েছে। যেমনঃ

১) مُتَّصِلٌ (মুত্তাসিল): مَتَّصِلْ এর আভিধানিক অর্থ মিলিত। এক বস্তুর সাথে মিলিত অপর বস্তুকে মুত্তাসিল বলা হয়।

মুত্তাসিলের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় যে, "যে হাদীসের সনদ প্রত্যেক রাবীর শ্রুতি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত তাই মুত্তাসিল।

যে হাদীস - এর সনদের মধ্যে কোন স্তরের কোন রাবী বাদ পড়েননি। অর্থাৎ সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ রয়েছে তাকে হাদীছে মুত্তাসিল বলে। আর এ বাদ না পড়াকে বলা হয় ইত্তিসাল।

২) مُنْقَطِعٌ (মুনকাতে): যে হাদীস - এর সনদের মধ্যে কোন স্তরের কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে হাদীসে মুনকাতে বলে। আর এ বাদ পড়াকে বলা হয় ইনকিতা। এ হাদীস প্রধানত দুই প্রকার মুরসাল ও মুয়াল্লাক।

ক) مُرْسَلٌ (মুরসাল): مُرْسلٌ এর আভিধানিক অর্থ মুক্ত করা ও ছেড়ে দেওয়া। মূলতঃ মুরসাল শব্দটি ইরসাল থেকে উদ্ভূত যার অর্থ

হল খুলে দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত করা এবং মুরসালের অর্থ হয় এই যে, মুক্ত, খোলা, পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য ইত্যাদি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় মুরসাল বলা হয় ঐ সকল হাদীসসমূহকে যার সনদের শেষের দিকে তাবিঈ এর পরবর্তী পর্যায়ের সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে। এরুপ করাকে ইরসাল বলা হয়। যেমন কোন তাবিঈ তার শায়খের নাম উল্লেখ না করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনটি করেছেন।

আল্লামা হাফিয বিন আসকালানী (রহঃ) বলেন, সনদের শেষ বর্ণনাকারী যদি বাদ পড়ে যায়, তথা তাবিঈর নাম যদি সনদ থেকে বাদ পড়ে তাহলে ঐ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে গণ্য করা হবে।
শায়খ আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ সংজ্ঞায় বলেনঃ

ومرسل من فوق تابع سقط = وقل غريب ما روى راو فقط

"আর মুরসাল - তাবে'ঈর উপর থেকে যার রাবী বাদ পড়েছে। আর বল গরীব - যা শুধু একজন রাবী বর্ণনা করেছে"। এ সংজ্ঞানুসারে কোনো প্রশ্ন থাকে না, সাহাবীর সাথে তাবে'ঈ বাদ পড়ুক কিংবা সাহাবীর সনদ থেকে সাহাবী বাদ পড়ুক, সকল প্রকার তার অন্তর্ভুক্ত। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি তাবে'ঈর বর্ণিত হাদীস মুরসাল। হোক তা বাণী, কিংবা কর্ম

কিংবা সমর্থন কিংবা কোনো বিশেষণ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ঐ হাদীস হল মুরসাল যা কোণ তাবিঈ, সাহাবীর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসূল পর্যন্ত সংবাদ দিয়েছেন।

উদাহরণঃ

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يَقْلِبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.

আবু সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দু'ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মোলামাসা ওমোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন। ... মোলামাসা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি (ক্রেতা) অপর ব্যক্তির (বিক্রেতার) কাপড় রাত্রে অথবা দিনের বেলায় নিজ হাতে স্পর্শ করা এবং তা ভালোভাবে উল্টে-পাল্টে না দেখা। আর মোনাবাযা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে এবং অপর ব্যক্তি এই ব্যক্তির দিকে নিজ নিজ কাপড়

নিক্ষেপ করবে। এভাবে না দেখেই এবং পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকেই ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

সহীহ মুসলিম :: খন্ড ১০ :: হাদীস ৩৬১৩, কিতাবুল বুয়ূ (ব্যবসা-বানিজ্য) অধ্যায়[167]। ইবনে শিহাব থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায় হাদীসটি উদ্বৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন রাবী, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হুজাইন, তিনি লাইস, তিনি আকীল থেকে, তিনি ইবন শিহাব থেকে, তিনি সাঈদ ইবন মুসাইবি থেকে রিওয়ায়াত করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মুযবানা পদ্বতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসে সাঈদ ইবন মুসাইবি একজন প্রবীণ তাবিঈ। তিনি এখানে সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটি একটি মুরসাল হাদীস। সুতরাং, যে হাদীসে সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনাদের নাম

[167] সহীহ মুসলিম :: খন্ড ১০ :: হাদীস ৩৬১৩, কিতাবুল বুয়ূ (ব্যবসা-বানিজ্য) অধ্যায়

মুবারকই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবিয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার নাম মুবারক করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে মুরসাল বলে।

মুরসাল বর্ণনার কয়েকটি কারণঃ

১. কখনো রাবী একাধিক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, যাদের আদালত ও যবত সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত, এরূপ অবস্থায় তিনি শায়খদের উপর নির্ভর করে মুরসাল বর্ণনা করেন। যেমন ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে এভাবে বর্ণনা করতেন।

২. কখনো রাবী নিজ শায়খের নাম ভুলে যান, কিন্তু হাদীস স্মরণ থাকে, ফলে তিনি মুরসাল বর্ণনা করেন।

৩. কখনো রাবী উপদেশ হিসেবে, বা বিতর্কের সময় বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে বা ওয়াজের মজলিসে হাদীস বর্ণনা করেন, তাই সনদের প্রতি বিশেষ নজর দেন না, মতন স্পষ্ট বলেন, বিশেষ করে শ্রোতাদের সামনে বক্তার শায়খ নির্দিষ্ট থাকলে এরূপ করা হয়।
৪. কখনো দুর্বল রাবীর কারণে মুরসাল বর্ণনা করা হয়।

৫. ক্ষতির আশঙ্কা কিংবা হাদীস গ্রহণ করা হবে না ভেবে মুরসাল বর্ণনা করা হয়।

৬. কখনো রাবীর সন্দেহ হয় যে, হাদীসটি মুসনাদ না মুরসাল, এমতাবস্থায় মুসনাদ হলেও তিনি মুরসাল বলেন, যেমন ইমাম মালিক প্রমুখ থেকে এরূপ শ্রুতি রয়েছে।

৭. ইমাম মুসলিম বলেনঃ কখনো রাবী নিজের মধ্যে আগ্রহের অভাবে সনদবিহীন মতন উল্লেখ করেন, আবার যখন উদ্যমতা ফিরে পান শায়খকে স্পষ্ট বলে দেন।

মুরসাল হাদীসের প্রকারভেদঃ এই ধরনের হাদীস পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে যা হলঃ

১। সাহাবা কর্তৃক ইরসাল

২। তাবিঈ কর্তৃক ইরসাল

৩। তাবী-তাবিঈ কর্তৃক ইরসাল

৪। তাবী-তাবিঈ পরবর্তী যুগ কর্তৃক ইরসাল

৫। সনদের ভিন্নতা

এখানে সকল প্রাকারের মুরসাল হাদীসের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১। সাহাবা কর্তৃক ইরসালঃ এটি এই ধরনের ইরসাল যেখানে এক সাহাবা অন্য কোন সাহাবাদের থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছে। আর তারা হাদীসটিকে এমনভাবে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরুপ বলেছেন অথবা এরুপ বলতে শুনেছি কিন্তু যেই সাহাবার কাছে থেকে বর্ণনা করেছেন তার নাম উল্লেখ করেন নাই। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) হিজরীর ৬ষ্ঠ-৭ম সনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার আগে হিজরতের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেনঃ "এ জাতীয় হাদীসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, কোনো সাহাবী আহকাম সংক্রান্ত কোনো হাদীস দুর্বল তাবে'ঈ থেকে গ্রহণ করেননি"।[168]

হুকুমঃ উক্ত হাদীস সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ শায়খ সাহাবী রাসূলুল্লহ (সাঃ) থেকে হাদীসটি শুনেছেন আর তাদেরকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

---

[168] জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (২১৯)

২। তাবীঈ কর্তৃক ইরসালঃ এই হাদীস বর্ণনা করার সময় কোন তাবীঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন। এর কারণ হল এই যে, হাদীসটি এতটা প্রসিদ্বি লাভ করেছে এবং সেই সাহাবী এতটা জনপ্রিয় যে, তাই সাহাবার নাম আর উল্লেখ করতে প্রয়োজন হয় নাই। সেই তাবিঈ এই কথা এভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ বলেছেন অথবা এরূপ বলতে শুনেছি।

হুকুমঃ এই ধরনের মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে কারণ তাবিঈগণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নিকট অধিক মর্যাদাবান।

৩। তাবী-তাবীঈ কর্তৃক ইরসালঃ এখানে হাদীসটি সুপরিচিতি হওয়ার ফলে সাহাবী তাবীঈ এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

হুকুমঃ এই ধরনের ইরসালের ব্যাপারে জুমহুর উলামাগণ নীরবতা অবলম্বণ করেছেন।তবে যদি এটা জানা যায় যে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে তা বর্ণনা করেছে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় তা হবে না।

৪। তাবী-তাবীঈ পরবর্তী যুগ কর্তৃক ইরসালঃ যদি এই ইরসাল তা তাবি বা তাবিঈ পরবর্তী যুগে কেউ করে থাকে। তারা হাদীসটিকে

এভাবে বলবে, রাসূলুয়ল্লাহ (সাঃ) এরূপ বলেছেন অথবা এরূপ বলতে শুনেছি।

হুকুমঃ এই হাদীসের বিশুদ্বতা নিয়ে ইমামদের ভিতর মতবিরোধ দেখা দেয়। কারও মতে তা গ্রহণযোগ্য আবার কারও মতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনঃ ইমাম আবুল হাসান কারখী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারীর ইরসালের দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাদীসটির সনদের বিশুদ্বতা সম্পর্কে নিশ্চিত।

৫। সনদের ভিন্নতাঃ যে হাদীসে এক সনদে মুরসাল আর অন্য সনদে তা মুসনাদ এমন হতে পারে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মেয়ের সম্মতি ছাড়া বিবাহ হয় না।

হুকুমঃ এই হাদীসের হুকুম হল তা গ্রহণযোগ্য হবে।

মুরসাল হাদীসের হুকুমঃ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন: "আমাদের ও আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে মুরসাল দলিল নয়"।[169] ইমাম শাফেঈ[170] (রহঃ) কয়েকটি শর্তে

---

[169] ইমাম নববির ব্যাখ্যা সম্বলিত মুসলিম: (১/১৩২)

[170] আর-রিসালাহ: (৪৬১-৪৭০), জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়া থেকে সংগৃহীত: (২২৩)

মুরসাল গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে কতক রাবী ও কতক মতনের সাথে সম্পৃক্ত।

রাবীর সাথে সম্পৃক্ত তিনটি শর্তঃ

১. ইরসালকারী রাবির সেকাহ হওয়া।

২. রাবীর বড় তাবে'ঈ থেকে বর্ণনা করা।

৩. ইরসালকারী রাবির সেকাহ শায়খ থেকে গ্রহণ করা।

মতনের সাথে সম্পৃক্ত চারটি শর্তঃ

১. মুরসাল মতন অপর কোনো সহী সনদে বর্ণিত হওয়া।

২. মুরসাল মতন অপর তাবে'ঈ থেকে মুরসাল বর্ণিত হওয়া।

৩. মুরসাল মতনের স্বপক্ষে কোনো সাহাবীর বাণী থাকা।

৪. সাধারণ আলেমের ফতোয়া মুরসাল মোতাবেক হওয়া।

খ) مُعَلَّقٌ (মুয়াল্লাক্ব): معلق এর আভিধানিক অর্থ ঝুলন্ত। কোনো বস্তু উপর থেকে ঝুলে নিচ থেকে মাটি স্পর্শ না করলে 'মু'আল্লাক' বলা

হয়। যে হাদীস - এর সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ওনাদের পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়েছে তাকে 'মুয়াল্লাক' বলে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। মু'আল্লাকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ "সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবিকে অনুল্লেখ করা হলে মু'আল্লাক বলা হয়, সকল রাবি অনুল্লেখ থাকলেও মু'আল্লাক"।

কোন কোন গ্রন্থকার কোন কোন হাদীস - এর পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক বলে। কখনও কখনও তা'লীক রূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে।

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার কিতাবে এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনার সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারী উনারা এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

মু'আল্লাকের হুকুমঃ মু'আল্লাক একপ্রকার দুর্বল হাদীস।

৩) مُدَلَّسٌ (মুদাল্লাস): مدلس শব্দটি **تدليس** থেকে গৃহীত, যার ধাতু **دُلسة** অর্থ অন্ধকার। যে হাদীস - এর রাবী নিজের প্রকৃত শায়খ (উস্তাদ) উনার নাম না করে উনার উপরস্থ শায়খ উনার নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই এটা উপরস্থ শায়খ উনার নিকট শুনেছেন অথচ তিনি নিজে এটা শুনেননি (বরং ওনার প্রকৃত উস্তাদ উনার নিকটই এটা শুনেছেন) সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস বলে। এরূপ করাকে তাদলীস বলে। আর যিনি এরূপ করেছেন উনাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। যে পর্যন্ত না তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী হতেই তাদ্লীস করেন বলে সাব্যস্ত হয় অথবা তিনি এটা আপন শায়খ উনার নিকট শুনেছেন বলে পরিস্কারভাবে বলে দেন।

৪) مُضْطَرَبٌ (মুদ্বতারাব): যে হাদীস - এর মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসকে হাদীসে মুদ্বতারাব বলে। যে পর্যন্ত না এটার কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয় সে পর্যন্ত এটা সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। (অর্থাৎ এটাকে দলীল তথা প্রমাণে ব্যবহার করা চলবে না)।

৫) مُدْرَجٌ (মুদরাজ): مدْرَج কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ প্রবেশকৃত বস্তু। এক বস্তুকে অপর বস্তুর মাঝে প্রবেশ করানো হলে বলা হয়ঃ **أدرجت الشيء في الشيء**'আমি এক বস্তুকে অপর বস্তুর মাঝে প্রবেশ

করিয়েছি’।[171] ইদরাজ ক্রিয়া বিশেষ্য, অর্থ প্রবেশ করানো। যে হাদীস - এর মধ্যে রাবী উনার নিজের অথবা অপর কারো উক্তি ভ্রুক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুদ্রাজ বলে এবং এরূপ করাকে ইদ্রাজ বলে। ইদ্রাজ হারাম - যদি না এটা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মুদ্রাজ বলে সহজে বুঝা যায়। মুদরাজের উদাহরণ দিয়েছেনঃ

أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو قَطَنٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ، أنا أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شَبَابَةُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

এখানে দু’টি সনদে একটি হাদীস রয়েছে। শু‘বার দু’জন ছাত্রঃ আবু কাতান ও শাবাবাহ থেকে সনদ ভাগ হয়েছে। শু‘বার শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ, তার শায়খ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তিনি

[171] তাজুল ‘আরূস: (২/৩৯-৪০)

বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা অজু পূর্ণ কর, টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুন"।[172]

এ সনদে হাদীসের পুরো অংশ মারফূ' হিসেবে বর্ণিত, অথচ পুরো অংশ মারফূ' নয়, প্রথমাংশ মাওকুফ ও শেষাংশ মারফূ'। এতে ইদরাজ হয়েছে হাদীসের শুরুতে। মারফূ' অংশ «ويل للأعقاب من النار» 'টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুন'। মাওকুফ অংশ «أسبغوا الوضوء» 'তোমরা অজু পূর্ণ কর'। এ অংশ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাণী। মারফূ' ও মাওকুফ অংশ পৃথক করা হয়নি বিধায় মুদরাজ।

৬) مُسْنَدٌ (মুসনাদ): مسْنَدُ কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ সম্পৃক্ত ও মিলিত বস্তু। إسناد ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য থেকে উদ্গত। إسناد الشيء إلى الشيء অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা। এ থেকে রাবী বা গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত হাদীসকে 'মুসনাদ' বলা হয়।

কেউ বলেনঃ سند ধাতু থেকে مسند উদ্গত। سند শব্দের অর্থ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঁচু ভূমি। রাবি বা গ্রন্থকার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদকে নিয়ে যান,

[172] "আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল-মুদরাজু ফিন নাকলি": (৫৮) ও (৫৯)الفصل للوصل المدرج في النقل

তখন তিনি সনদকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন, তাই তার বর্ণিত হাদীসকে মুসনাদ বলা হয়।

রাবীকে বলা হয় مسنِد "بكسر النون" আর গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবিদের দীর্ঘ পরম্পরাকে বলা হয় সনদ। আরবদের প্রবাদ فلان سنَد 'অমুক ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য' থেকেও مسْنَدُ উদ্‌গত হতে পারে। مسْنَدُ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় যে, "রাবি থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হাদীস মুসনাদ, যার সনদে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ছেদ বা ইনকিতা' নেই"। এটাই অধিকাংশ আলেমের সংজ্ঞা। এখানে رَاوِيهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস লিপিবদ্ধকারী গ্রন্থকার, যেমন বুখারী, মুসলিম প্রমুখগণ, সনদের যে কোনো রাবী নয়।

মুসনাদের দু'টি শর্তঃ

১. মারফূঃ মুসনাদ হওয়ার জন্য হাদীসটি মারফূ' তথা হাদীসের মূল বক্তব্য (মতন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হওয়া জরুরি। অতএব মাওকুফ ও মাকতু' মুসনাদ নয়। কারণ, 'মাওকুফে'র শেষ প্রান্ত সাহাবী, মাকতু'র শেষ প্রান্ত তাবে'ঈ।

২. মুত্তাসিলঃ মুসনাদ হওয়ার জন্য সনদ মুত্তাসিল হওয়া জরুরী। অতএব মুরসাল, মুনকাতি', মু'দ্বাল, মু'আল্লাক ও মুদাল্লাস মুসনাদ নয়। কারণ, এগুলোর সনদ মুত্তাসিল নয়। যে মারফূ' হাদীস - এর কারো মতে যে কোন রকম হাদীস - এর সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল সে হাদীসকে হাদীসে মুসনাদ বলে।

৭) مَحْفُوْظٌ وَ شَاذٌ (মাহফুয ও শায): شاذ শব্দটি **شذوذ** থেকে গৃহীত, যার অর্থ একাকী, বিচ্ছিন্ন, দলছুট ও নীতি মুক্ত।

মূলতঃ কোন সিক্বাহ রাবী ওনার হাদীস অপর কোন সিক্বাহ রাবী বা রাবীগণ ওনাদের হাদীস - এর বিরোধী হলে যে হাদীস - এর রাবীর যব্ত গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যার হাদীস - এর সমর্থন পাওয়া অথবা যার হাদীস - এর শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয় উনার হাদীসটিকে হাদীসে মাহফুয এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে হাদীসে শায বলে এবং এরূপ হওয়াকে শুযূয বলে। হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ শাযের সংজ্ঞায় বলেনঃ

"مخالفة المقبول لمن هو أولى منه" (النزهة:صـ98)

"মাকবুল রাবীর তার চেয়ে উত্তম রাবীর বিরোধিতা করা শায"।[173]

---

[173] আন-নুযহাহ: (পৃ.৯৮)

এখানে মাকবুল দ্বারা উদ্দেশ্য সহি ও হাসান হাদীসের রাবী, আর উত্তম দ্বারা উদ্দেশ্য এক বা একাধিক সেকাহ রাবি। অর্থাৎ মাকবুল রাবী একাধিক মাকবুল কিংবা অধিক সেকাহ রাবীর বিরোধিতা করলে তার হাদীস শায।

সাধারনতঃ হাদীস - এর পক্ষে শুযূয একটি মারাত্মক দোষ। শায হাদীস সহীহ রূপে গণ্য নয়।

'শায' এর হুকুমঃ শায শাহেদ ও মুতাবে' হওয়ার উপযুক্ত নয়।

৮) مَعْرُوْفٌ وَ مُنْكَرٌ (মা'রূফ ও মুনকার): مُنْكَرُ কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ প্রত্যাখ্যাত, অস্বীকৃত ও অপরিচিত।

'মুনকার' এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ "মুনকার সে ফার্‌দ হাদীস, যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে, যার একা আদালত গ্রহণযোগ্য নয়"। উদাহরণত ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেনঃ

قال ابن ماجة القزويني –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُوا

الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَب، وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ

এ সনদে ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস আল-মাদানি দুর্বল, যার একলা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[174] অতএব মুনকার। হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেনঃ "দুর্বল রাবী যদি সেকাহ রাবীর বিরোধিতা করে, তাহলে সেকাহ রাবীর হাদীসকে মারূফ ও দুর্বল রাবির হাদীসকে মুনকার বলা হয়..."। অতএব হাফেয মুনকারের জন্য দু'টি শর্তারোপ করেনঃ

১. রাবীর দুর্বল হওয়া এবং

২. অধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করা। এ দু'শর্ত যুক্ত হাদীস মুনকার।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, কোন যঈফ রাবীর হাদীস অপর কোন যঈফ রাবীর হাদীস - এর বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম যঈফ রাবীর হাদীসকে হাদীসে মা'রূফ এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে হাদীসে মুনকার বলে এবং এরূপ হওয়াকে নাকারাৎ বলে। নাকারাৎ হাদীস - এর পক্ষে একটা বড় দোষ।

---

[174] ইব্‌ন মাজাহ: (৩৩৩০), সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ: (৬৬৮৭)

৯) مُعَلَّلٌ (মুয়াল্লাল): علة এর আভিধানিক অর্থ রোগ, **عَلَّ يَعِلُّ** থেকে **مُعلَّلٌ** অর্থ অসুস্থ ব্যক্তি। এ থেকে দোষণীয় ইল্লতযুক্ত হাদীসকে মু'আল্লাল বলা হয়, কারণ মু'আল্লাল হাদীসও অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অক্ষম, সহি হাদীসের ন্যায় দলিল হতে পারে না।
সুতরাং, যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি রয়েছে যাকে কোন বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরতে পারেন না, সে হাদীসকে হাদীসে মুয়াল্লাল বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লত বলে।

ইল্লত হাদীসের পক্ষে একটা মারাত্মক দোষ। মুয়াল্লাল হাদীস সহীহ্ হতে পারে না।

১০) مُطَابِعٌ وَ شَاهِدٌ (মুতাবি' ও শাহিদ): এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস শরীফ পাওয়া যায় তাহলে এই দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীস শরীফটির মুতাবি বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবায়াত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে প্রথম ব্যক্তির হাদীস - এর শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবায়াত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীস শরীফটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রাবীদের যোগ্যতা অনুসারে হাদীসের শ্রেণীবিভাগ

রাবীদের যোগ্যতা অনুসারে হাদীসের প্রকারভেদ নিম্নরূপঃ-

১. সহীহ (صحيح) ২. হাসান (حسن) ৩.জয়ীফ হাদীস এবং মওজু (موضوع) বা জাল হাদীস।

সহীহ (صحيح) হাদীসঃ صحيح শব্দটি আরবী। বহুবচনে صحاح। এর আভিধানিক অর্থ সুস্থ। সাধারণত মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য 'সহীহ' ব্যবহৃত হয়, যেমন হাদীসে এসেছেঃ " وَأَنْتَ صَحِيحٌ " 'তুমি সুস্থাবস্থায়' এ থেকেই সনদ ও মতন দোষমুক্ত হলে হাদীসকে সহিহ বলা হয়।

যে মুত্তাসিল সনদের রাবীগণ প্রত্যেকেই উত্তম শ্রেণীর আদিল ও জাবিতরূপে পরিচিত অর্থাৎ সেকাহ হওয়ার শর্তাবলী তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান, মূল হাদীসটি সুক্ষ্ম দোষ ত্রুটি অথবা শা'জ বা দল ছাড়া হতে মুক্ত এরূপ হাদীসকে 'সহীহ হাদীস' বলে।

অন্যভাবে বলা যায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ধারাবাহিক রয়েছে, সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকরূপে উল্লেখিত হয়েছে,বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত সেকাহ যাদের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাদের সংখ্যা কোন স্তরেই মাত্র একজন হয়নি,

এরূপ হাদীসকে হাদীসে সহীহ বলে। অর্থাৎ যে মুত্তাসিল হাদীস - এর সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি শুযুয ও ইল্লত হতে দোষমুক্ত সে হাদীসকে হাদীসে সহীহ্ বলে। অর্থাৎ যে হাদীসটি মুনকাতে নয় মু'দাল নয়, মুয়াল্লাক নয়, মুদাল্লাস নয়, কারো কারো মতে মুরসাল'ও নয়, মুবহাম অথবা প্রসিদ্ধ যঈফ রাবীর হাদীস নয়, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দরুণ অনেক ভুল করেন এমন মুগাফ্ফার বারীর হাদীস শরীফ নয় এবং হাদীসটি শায্ ও মুয়াল্লাল'ও নয় - একমাত্র সে হাদীসকেই হাদীসে সহীহ্ বলে।

'সহীহ'-র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেনঃ

هو ما نقله العدل تام الضبط متصل السند غيرمعلل ولا شاذ

"যে হাদীস মুত্তাসিল সনদ তথা অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, রাবী বা বর্ণনাকারী আদিল ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হয়, এবং সনদটি শায কিংবা মুআল্লাল নয়; এমন হাদীস কে সহীহ বলে।

সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন- "যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিক রূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনা

কারকদের সংযোজনে পরম্পরাপূর্ণ ও যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নেই, তাই 'হাদীসে সহীহ'।

বস্তুতঃ কোন সহীহ হাদীসই কুরআন বিরোধী নয়ঃ তাবিয়ী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাসির বলেন, সুন্নাত বা হাদীস কুরআনের ওপর ফায়সালা দানকারী, কিন্তু হাদীসের ওপর কুরআন সিদ্ধান্ত দানকারী নয়। এ উক্তিটির ব্যাখ্যায় ইমাম বাইহাকী বলেন, কুরআনের ব্যাপারে হাদীস ব্যাখ্যাদানকারী পর্যায়ে পড়ে। তাই হাদীসের কোন তথ্যই কুরআনের বিরোধীতা করে না। এটাকে আরও ভেঙ্গে আল্লাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, "কুরআন হাদীসের মুখাপেক্ষী" এ কথাটির ভাবার্থ এটা যে, হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যাকারী এবং তার সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলীকে বিশদভাবে বর্ননাকারী। এ অর্থই হচ্ছে হাদীস কুরআরেন উপর সিদ্ধান্ত দানকারী উক্তির কিন্তু কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যাদানকারী নয় এবং তা হাদীসের উপর ফায়সালা দানকারীও নয়। কারন, হাদীস তো নিজেই বিস্তারিত। যার ব্যাখ্যায় কুরআনের প্রয়োজনই হয় না।

আল্লামা আবু উবাইদ বলেন, কোন জিনিসকে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের হালাল ও হারাম করার ব্যাপারে কোন পার্থক্যই নেই। আর রাসূলও এমন কোন বিধান দিতেন না যার বিপরীত বিধান কুরআন

দিতে পারে বরং সহীহ হাদীসই হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী এবং কুরআনী-বিধিনিষেধ ও আইন কানুনের বিশ্লেষনকারী।

তাই কোন সহীহ হাদীসই যে কুরআনের বিরোধী হতে পারে না তার প্রমান পাওয়া যায় বিখ্যাত এক তাবিয়ী সায়ীদ ইবনে যুবাইরের বর্ননায়। তিনি বলেন, "আমি মনে করি না যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্নীত এমন হাদীস বর্ননা করছি যাতে তুমি কুরআনের দোহাই দিয়ে আপত্তি করতে পার? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার থেকে কুরআনের বেশি জ্ঞানী ছিলেন[175]।"

হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছেঃ

১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া।

২. রাবীর আদিল হওয়া।

৩. রাবীর দ্বাবিত হওয়া।

৪. শায না হওয়া।

৫. মু'আল্লাল না হওয়া।

---

[175] রাহে আমাল – আল্লামা জলীল আহসান নদভী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং - ৩৭

প্রথম শর্তঃ اتصال السند বা সনদ মুত্তাসিল হওয়াঃ সনদ মুত্তাসিল হওয়ার অর্থ, হাদীসের সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক রাবী (বর্ণনাকারী) তার শায়খ (শিক্ষক) থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন প্রমাণিত হওয়া। যেমন গ্রন্থকার মুহাদ্দিস বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (প্রথম উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (দ্বিতীয় উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (তৃতীয় উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (চতুর্থ উস্তাদ)। এভাবে প্রত্যেক রাবী স্বীয় শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে নিশ্চিত করলে সনদ মুত্তাসিল। শায়খের অনুমতি গ্রহণ করা, শায়খকে হাদীস শুনিয়ে সম্মতি নেওয়াকে সরাসরি শ্রবণ করা বলা হয়।

দ্বিতীয় শর্তঃ عدالة الراوى বা রাবীর 'আদলঃ সহীহ হাদীসের দ্বিতীয় শর্ত রাবীর 'আদল' হওয়া। عدل 'আদ্‌ল' শব্দের অর্থ সোজা ও বক্রতাহীন রাস্তা, যেমন বলা হয় طريق عدل 'সোজা রাস্তা'। পাপ পরিহারকারী ও সুস্থরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায় ও সোজা রাস্তার অনুসরণ করে, তাই তাকে 'আদ্‌ল' বা 'আদিল' বলা হয়। عادل কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। হাদীসের পরিভাষায় দীনদারী ও সুস্থরুচিকে عدالة বলা হয়।

‘আদিল’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ মুসলিম, বিবেকী, সাবালক, দীন বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ও সুস্থ রুচির অধিকারী ব্যক্তিকে উসুলে হাদীসের পরিভাষায় ‘আদিল’ বলা হয়। নিম্নে প্রত্যেকটি শর্ত প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলোঃ

মুসলিমঃ রাবীর ‘আদিল হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া জরুরী। অতএব কাফের ‘আদিল’ নয়, তার হাদীস সহীহ নয়। কাফের কুফরী অবস্থায় হাদীস শ্রবণ করে যদি মুসলিম হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। কারণ সে সংবাদ দেওয়ার সময় আদিল, যদিও গ্রহণ করার সময় আদিল ছিল না। যেমন জুবাইর ইব্‌ন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পড়তে শুনেছি”। তিনি শুনেছেন কাফের অবস্থায়, আর বর্ণনা করেছেন মুসলিম অবস্থায়। (বুখারী ও মুসলিম)

সাবালিগঃ রাবীর আদিল হওয়ার জন্য সাবালিগ হওয়া জরুরি। কেউ শৈশবে হাদীস শ্রবণ করে যদি সাবালিগ হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য, সাবালিগ হওয়ার পূর্বে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কতক সাহাবীর ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়, যেমন

ইব্ন আব্বাস, ইব্ন যুবায়ের ও নুমান ইব্ন বাশির প্রমুখ, তাদের হাদীস শৈশাবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবেকবানঃ রাবীর আদিল হওয়ার জন্য বিবেক সম্পন্ন হওয়া জরুরি। বিবেকহীন ও পাগল ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। পাগল দু'প্রকার: স্থায়ী পাগল ও অস্থায়ী পাগল। স্থায়ী পাগলের হাদীস কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। অস্থায়ী পাগলের মধ্যে যদি সুস্থাবস্থায় সহিহর অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য, তবে শ্রবণ করা ও বর্ণনা করা উভয় অবস্থায় সুস্থ থাকা জরুরি।

দীনদারীঃ রাবীর 'আদিল হওয়ার জন্য দীনদার হওয়া জরুরি, তাই পাপের উপর অটল ব্যক্তি আদিল নয়। পাপ হলেই 'আদল বিনষ্ট হবে না, কারণ মুসলিম নিষ্পাপ নয়, তবে বারবার পাপ করা কিংবা কবিরা গুনায় লিপ্ত থাকা 'আদল পরিপন্থী। দীনের অপব্যাখ্যাকারী, তাতে সন্দেহ পোষণকারী ও বিদ'আতির হাদীস গ্রহণ করা সম্পর্কে আহলে ইলমগণ বিভিন্ন শর্তারোপ করেছেন।

সুস্থ রুচিবোধঃ রাবীর 'আদল হওয়ার জন্য সুস্থ রুচিবোধ সম্পন্ন হওয়া জরুরি। সুস্থ রুচিবোধের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই।

প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট প্রথা, সে সমাজের জন্য মাপকাঠি, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নানা প্রকার হয়। সাধারণত সৌন্দর্য বিকাশ ও আভিজাত্য প্রকাশকারী কর্মসমূহ সম্পাদন করা এবং তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্নকারী কর্মসমূহ পরিত্যাগ করাকে সুস্থ রুচিবোধের পরিচায়ক বলা হয়। হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ 'আদল' এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, 'আদল' ব্যক্তির মধ্যে এমন যোগ্যতা, যা তাকে তাকওয়া ও রুচিবোধ আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করে"। অতএব ফাসেক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী 'আদিল' নয়, যদিও সে সত্যবাদী। জামাত ত্যাগকারী 'আদিল' নয়, যদিও সে সত্যবাদী, সুতরাং তাদের বর্ণনাকৃত হাদীস সহীহ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ [الحجرات: ٦

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে"। ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ যাচাই ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না, পক্ষান্তরে আদিল ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ বলেন,

الطلاق : ٢] وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ٢

“আর তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু’জন সাক্ষী বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে।” এ আয়াতে আল্লাহ ‘আদিল’ ব্যক্তিদের সাক্ষীরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সারাংশঃ ‘আদিল’ ব্যক্তির মধ্যে দু’টি গুণ থাকা জরুরি: দীনদারী ও সঠিক রুচিবোধ। এ দু’টি গুণকে ‘আদালত’ বলা হয়। কখনো ‘আদিল’ ব্যক্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষ্য ‘আদ্‌ল’ শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমনঃ **يرويه عدل** এখানে ‘আদ্‌ল’ অর্থ ‘আদিল’। অত্র গ্রন্থে আমরা আদিল, আদালত ও আদ্‌ল শব্দগুলো অধিক ব্যবহার করব, তাই পাঠকবর্গ ভালো করে স্মরণ রাখুন।

তৃতীয় শর্তঃ ضبط الراوى রাবীর যবত বা সংরক্ষণঃ সহীহ হাদীসের দ্বিতীয় শর্ত রাবীর ‘যবত’। **ضبط** ক্রিয়াবিশেষ্য, আভিধানিক অর্থ নিয়ন্ত্রণ। এ থেকে যিনি শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন, তাকে **ضابط** বলা হয়। ‘যাবিত’ কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকারী। **ضبط** এর পারিভাষিক অর্থ: শায়খ থেকে শ্রবণ করা হাদীস হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়াই **ضبط**।

ضبط দু’প্রকারঃ স্মৃতি শক্তির জাবত ও খাতায় লিখে জাবত। সাহাবী ও প্রথম যুগের তাবেয়ীগণ স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করতেন, পরবর্তীতে লেখার ব্যাপক প্রচলন হয়। তখন থেকে স্মৃতি শক্তি

অপেক্ষা লেখার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, তবে লিখিত পাণ্ডুলিপি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করা জরুরি।

চতুর্থ শর্তঃ عدم الشذوذ বা 'শায'- না হওয়াঃ 'মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য রাবি যদি তাদের চেয়ে উত্তম বা অধিক নির্ভরযোগ্য রাবিদের বিপরীত বর্ণনা করে, তাহলে তাদের বর্ণনাকে শায বলা হয়'। সুতরাং কোন হাদীস সহী হতে হলে এমন না হওয়া। মকবুল অর্থ গ্রহণযোগ্য রাবি, যার একা বর্ণিত হাদীস ন্যূনতম পক্ষে 'হাসানে'-র মর্যাদা রাখে। মকবুলের চেয়ে উত্তম রাবিকে সেকাহ বলা হয়, যার একা বর্ণিত হাদীস 'সহিহ'-র মর্যাদা রাখে।

পঞ্চম শর্তঃ عدم العلة কোন ধরনের ইল্লত না থাকাঃ

ইল্লত দ্বারা উদ্দেশ্য সুপ্ত ও গোপন ইল্লত বা ত্রুটি, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ব্যতীত যা কেউ বলতে পারে না। সনদ ও মতন উভয় স্থানে দোষণীয় ইল্লত হতে পারে।

সহীহ হাদীসের উদাহরণঃ

حدثنا الحميدي (عبد الله بن الزبير) قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إنما

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا
-يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

হুমায়দী (রহঃ) .... ‘আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য। বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইমাম বুখারী থেকে রাসুল (সাঃ) পর্যন্ত ৬ জন রাবী রয়েছে। যথাঃ

১. হুমাইদি (আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের)

২. সুফিয়ান

৩. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী

৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আত তাইমী

৫. আলকামাহ ইবনে ওয়াক্কাস আল লাইসি

৬. সাহাবী উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)

উপরোক্ত প্রত্যেক রাবী নিজ শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেছেন যা হাদীসটির সনদে স্পষ্ট উল্লেখ রছেছে। তাই সনদটি মুত্তাসিল। প্রত্যেক রাবী আদিল ও পূর্ণরুপে জাবিত ছিলেন। তাছাড়া বর্ণিত হাদীসটি শায বা মুয়াল্লাল নয়। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতে সর্বপ্রথম পেশ করেছেন। এতে সহিহ হাদীসের পাঁচটি শর্ত পূর্ণরুপে বিদ্যমান রয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে এটি একটি সহিহ হাদীস।

সহির বিভিন্ন মান বা স্তরসমূহঃ সকল রাবীর দ্বাবত ও আদালত সমান নয়, তাই সকল সহি হাদীসের মান সমান নয়। দ্বাবত ও আদালতের তফাতের কারণে সহী হাদীস সাত ভাগে ভাগ হয়ঃ

১. বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস।

২. শুধু বুখারীতে বর্ণিত হাদীস।

৩. শুধু মুসলিমে বর্ণিত হাদীস।

৪. বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীস।

৫. শুধু বুখারীর শর্ত মোতাবেক হাদীস।

৬. শুধু মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীস।

৭. অন্যান্য মুহাদ্দিসের শর্ত মোতাবেক সহি।

উল্লেখ্য, সহি ইব্‌ন খুযাইমাহ সহি ইব্‌ন হিব্বান অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। (তথ্যসূত্রঃ তাহক্বীক – বুলুগুল মারাম, মিন আদিল্লাতিল আহকাম, পৃষ্ঠা নং – ২৩)। বর্ণনাকারীর গুণ বিচার করে সহীহ হাদীসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) সহীহ লিজাতিহী (صَحِيْحُ لِذَاتِهِ): যে হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্ব শক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শা'য ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিযাতিহী বলে। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

এটা খবরে ওয়াহিদের এমন এক প্রকার হাদীস যার রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার পর্যন্ত পৌঁছেছে। যার রাবী প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং ন্যায় পরায়ন। مُعَلَّلٌ (মুয়াল্লাল) তথা কোন গোপন দোষত্রুটি থেকে মুক্ত এবং شَاذٌّ (শায) তথা অন্য রাবীর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা থেকে মুক্ত। যেমনঃ

حَدَّثَنَا حضَرَتْ اِلْحُمَيْدِىُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا .... اِنَّمَا اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.......

অর্থঃ "হুমাইদী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, [রাসূল (সাঃ) তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারী, মিশকাত)][176]।

প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞাঃ

আল্লামা জুরজানী (রঃ) বলেন, যে হাদীসের শব্দ দূর্বলতা থেকে এবং অর্থ আয়াতের পরিপন্থী হওয়া থেকে মুক্ত কিংবা খবরে মুতাওয়াতির বা ইজমাকে সহীহ লি যতিহী বলা হয়। মুফতি আমিমুল ইহসান বলেন, সহীহ লি যাতিহী ঐ খবরে ওয়াহেদকে বলা হয় যার বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ সংরক্ষণের অধিকারী এবং যা মুআল্লাল বা শায নয়।

আল্লামা হাফিয বিন আসকালানী (রঃ) এই সহীহ লি যাতিহীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, যে খবরের বর্ণনাকারী ন্যায়নিষ্ঠাবান, পূর্ণ সংরক্ষণের অধিকারী, যে সনদের রাবী পরম্পরায় ধারাবাহিকতা বিদ্যমান যে খবর মুয়াল্লাল (বাঃ) শায নয় এরুপ খবর হল সহীহ লি যাতিহী।

[176] বুখারী, মিশকাত

হাফিয ইবন আসকালানীর সংজ্ঞা এখানে সহীহ লি যাতিহীর চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা হলঃ

১। আদল বা ন্যায়নিষ্ঠাবান হওয়াঃ বর্ণনাকারীর ভিতর খোদাভীরুতা এবং সৌজন্যবোধ থাকবে। এখানে তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল শিরক, ফাসিকী ও বিদআত থেকে নিজেকে হিফাযত করা। নিজেকে মিথ্যা বলা, মদ্যপান থেকে বিরত রাখার নাম।

২। পূর্ণ যবতের অধিকারীঃ এখানে বর্ণনাকারীকে পূর্ণ যবতের অধিকারী হতে হবে যাতে করে যে কোন কিছু সে সহজে মুখস্ত করতে পারে। এই গুণাবলী না থাকার ফলে তা সহীহ লি যাতিহীর মধ্যে গণ্য হবে না। যবত দুই প্রকার যা হলঃ

ক। স্মৃতিপটে সংরক্ষণঃ যে শ্রবণশক্তি কোন হাদীস শ্রবণমাত্র অন্তরে ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং যখন তা জানতে চাওয়া হবে হুবহু মুখস্ত বর্ণনা করবে।

খ। লিখিতভাবে সংরক্ষণঃ যদি শায়খের কাছে থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করার পর যদি তা নিজের কাছে লিখে রাখে আর তা প্রয়োজন মত বর্ণনা করা হল লিখিতভাবে সংরক্ষণ।

৩। সনদের ধারাবাহিকতাঃ যে খবরের রাবীগণের ধারাবাহিকতা এমনভাবে বিদ্যমান যে এর কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েন নাই এবং এমন অবস্থা যে প্রত্যেক রাবী তার পূর্ববর্তী রাবী হতে বর্ণনা শুনেছেন এবং তা সনদ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। হাদীস মুআল্লাল বা শায না হওয়াঃ মুআল্লাল ঐ সকল হাদীসসমূহকে বলা হয় যার ভিতর সত্যিকারভাবে কোন ধরনের অসুস্থতা আছে। এক হাদীস অন্য হাদীসের ভিতর অনুপ্রবশের দরুন হাদীস উলট-পালট হয়ে যেতে পারে যার ফলে অর্থ বের করা দুরুহ হতে পারে। হাদীস মুআল্লাল দুইভাবে হতে পারে যা হল সনদের ভিত্তিতে এবং মতনের ভিত্তিতে। শায হচ্ছে ঐ সকল হাদীসসমূহ যেখানে নির্ভরযোগ্য রাবী অপর একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত হবেন যিনি যবত ও আদলের গুণে অপরের চেয়ে অধিক হবে। এভাবে দুই নির্ভরযোগ্য রাবী পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করলে, কম নির্ভরযোগ্য রাবী শায এবং অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী মাহফুয হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণঃ ইমাম বুখারী একটি রিওয়য়াতে বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ হাদীস রিওয়য়াত করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে মালিক ইবন শিহাব খবর দিয়েছেন, তিনি

মুহাম্মদ ইবন জুবায়রবিন মুতাউম থেকে এবং তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মাগরিবের সময় সূরা তুর পাঠ করতে শুনেছি। এই হাদীসটি মুত্তাসিল সনদ বর্ণিত এবং এই হাদীসটি শায বা মুয়াল্লাল নয়।

হুকুমঃ হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে এর উপর আমল করা ওয়াজিব। উসূলবিদ্গণ ও ফকীহগণের মতে খবরে সহীহ শরীয়াতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

২) সহীহ লিগাইরিহী (صَحِيْحُ لِغَيْرِهِ): এটি মূলত হাসান লিযাতিহী। যদি হাসান হাদীসের সনদ সংখ্যা অধিক হয় তাহলে এর দ্বারা হাসান বর্ণনাকারীর মধ্যে যে ঘাটতি ছিল তার পূরণ হয়ে যায়। এরুপ অধিক সনদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলে। এটা হাসান লিযাতিহী হাদীস- এর অনুরূপ।

অর্থাৎ সহীহ হাদীস-এর কোন রাবীর মধ্যে স্মরণ শক্তি কিছুটা কম থাকে। তবে সেই অভাব বা ত্রুটিটুকু অন্যান্য উপায়ে এবং অধিক রিওয়ায়েত দ্বারা পুরণ হয়ে যায়। মোট কথা, তার সমর্থনে বহু রিওয়ায়েত বর্ণিত থাকায় তার ত্রুটির ক্ষতিপুরণ হয়ে গেছে। এরূপ হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলে। যে খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারী ন্যায়-নিষ্ঠাবান কিন্তু ঐ বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের নয় এবং হাদীস পূর্ণভাবে সংরক্ষণেও সক্ষম নয় তবে ঐ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে তা এত অধিক শক্তিশালী ও জোড়দার সম্পন্ন যে, এর ত্রুটি তাতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং হাদীসটিকে সহীহের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এরূপ হাদীসকে সহীহ লি গায়রিহি বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ত্বাহান বলেন, সহীহ লিগাইরিহী প্রকৃতপক্ষে ঐ হাসান লিযাতিহী হাদীসকে বলা হয় যা অনুরুপ আরও একটি হাদীস আরও শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত। তবে যেহেতু এটি সনদ হিসেবে নয়, বরং অন্য একটি রিওয়য়াতের কারণে সহীহ মানে উন্নীত হয়েছে যার ফলে একে সহীহ লিগায়রিহি বলা হয়। আব্দুল হক দেহলভী (রঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, যদি রাবীর ভিতর কোন দোষ-ত্রুটি না থাকে এবং তা যদি বহু সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে ঐ হাদীস হল হাসান লিগায়রিহী।

উদাহরণঃ আবূ কুরায়ব (রহঃ) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كِلاَهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثُ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحَّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ وَأَبِي مُوسَى.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর না হলে আমি প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। [সহীহ আত্ তিরমিজি :: মিসওয়াক করা বা দাঁত মাজা অনূচ্ছেদ, অধ্যায় ১ :: হাদীস ২২][177]

আবু ‘ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি যাইদ ইবনু খালিদ হতে তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

---

[177] সহিহ আত্ তিরমিজি :: মিসওয়াক করা বা দাঁত মাজা অনূচ্ছেদ, অধ্যায় ১ :: হাদীস ২২

আবু ‘ঈসা বলেনঃ আবু হুরাইরাহ্ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর নিকট হতে আবু সালাম হতে বর্ণিত উভয় হাদীসই সহীহ্। কেননা এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেমতে যাইদ ইবনু খালিদের নিকট হতে আবু সালাম হতে বর্ণিত হাদীসটি বেশি সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্র সিদ্দীক, ‘আলী, ‘আয়িশাহ্, ইবনু ‘আব্বাস, হুযাইফা, যায়িদ ইবনু খালিদ, আনাস, ‘আবদুল্লাহ্ইবনু ‘আমর, উম্মি হাবীবা, ইবনু উমার, আবু উমামা, আবু আইয়ুব, তাম্মাম ইবনু ‘আব্বাস, ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু হানযালা, উম্মি সালামা, ওয়াসিলা ও আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

Abu Hurairah narrated that : Allah's Messenger said: "If it were not that it would be difficult on my nation, then I would have ordered them to use the Siwak for each prayer." (Sahih) - Grade: Sahih (Darussalam) [Jami at-Tirmidhi :: What Has Been Related About Siwak, Part 1 :: Hadith 22][178]

উল্লিখিত হাদীসটির সনদ দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম তিরমিযী (রঃ) তাকে সহীহ বলেছেন তা অন্যান্য সনদে স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা বিদূরিত হয়েছে।

---

[178] Jami at-Tirmidhi :: What Has Been Related About Siwak, Part 1 :: Hadith 22

হুকুমঃ এই ধরনের হাদীসের উপর আমল করা অত্যাবশ্যকীয়। তবে তা পরস্পর বিরোধী হাদীস নিষ্পত্তি হওয়াতে তার স্থান ২য়।

হাসান (حسن): حَسَنٌ এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর। 'হাসান' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যে হাদীসের সনদগুলো প্রসিদ্ধ, তবে সহী হাদীসের রাবীদের ন্যায় প্রসিদ্ধ নয়, তাই হাসান"। হাফেয ইব্ন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ হাসানের সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولاشاذ، هو الصحيح لذاته. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. النزهة: (صـ91)

"আদিল ও পরিপূর্ণ দ্বাবত সম্পন্ন রাবির মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত, ইল্লত ও শায থেকে মুক্ত খবরে ওয়াহেদকে সহি লি-যাতিহি বলা হয়। অতঃপর তিনি বলেন: যদি দ্বাবত দুর্বল হয়, তাহলে হাসান লি-যাতিহি"। [আন-নুযহাহ: (৯১)][179]। শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ "যে হাদীস দু'সনদে বর্ণিত, যার সনদে মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট কোনো রাবি নেই এবং যা সহী হাদীসের বিপরীত শায

[179] আন-নুযহাহ: (৯১)

নয়, তিরমিযীর পরিভাষায় তাই হাসান। সুতরাং, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে সকল গুণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি স্মরণ শক্তির কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই হাদীসকে 'হাদীসে হাসান' বলে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, যে হাদীস - এর রাবীর যত গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে সে হাদীসকে হাদীসে হাসান বলে। (ফক্বীহ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনারা সাধারণত এই দুই প্রকার হাদীস হতেই আইন প্রণয়ণে সাহায্য গ্রহণ করেন)।

যঈফ (ضعيف): ضعيف এর আভিধানিক অর্থ দুর্বল। 'যে হাদীসের মধ্যে হাসান হাদীসের শর্তগুলি অবিদ্যমান দেখা যায়, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন, যে আলেম হাদীসের সহীহ-যঈফ ও নাসেখ-মানসূখ জানেন্ না, তাকে আলেমই বলা চলে না। (মারেফাতু উলুমুল হাদীস গ্রন্থের বরাতে সহীহ তারগীব তারহীবের ভূমিকা- পৃঃ- ১৩)[180]।

'যঈফ' এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় যে, "যেসব হাদীস হাসান হাদীসের স্তর থেকে নিচু তাই য'ঈফ বা দুর্বল হাদীস, তার অনেক প্রকার রয়েছে"। অর্থাৎ -

---

[180] মারেফাতু উলুমুল হাদীস গ্রন্থের বরাতে সহীহ তারগীব তারহীবের ভূমিকা- পৃঃ- ১৩

১- রাবীর বিশ্বস্ততার ঘাটতি বা

২- তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা বা স্মৃতির ঘাটতি, বা

৩- সনদের মধ্যে কোন একজন রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে শোনেননি বলে প্রমানিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, বা

৪- অন্যান্য প্রমানিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া, অথবা

৫- সূক্ষ্ম কোন সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি থাকা ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয় কোন হাদীসের মধ্যে থাকলে হাদীসটি যঈফ বলে গণ্য। কোন হাদীসকে 'যঈফ' বলে গণ্য করার অর্থ হল, হাদীসটি রাসুল (সাঃ) এর কথা নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। বিদ্বানগণ যঈফ হাদীসের বিভিন্ন প্রকার বর্ননা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, দুর্বল হাদীস ৪৯ প্রকার। হাফেয ইরাকী ৪২ প্রকার বলেছেন। আবার কেউ কেউ ১২৯ প্রকার বলেছেন। যঈফ হাদীস যত প্রকারেরই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত এর কোন বাস্তব সম্মত গ্রহনযোগ্যতা আসে নি। তাই যঈফ হাদীসের উপর আমল না করার জন্য হাদীস বিদ্বানগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন আর তাছাড়া শরীয়াতের বিধানাবলীতে তাকে প্রমান হিসেবে পেশ করা যাবে না আর এটাই

হাদীস বিদ্বানগণের অভিহিত[181]। সুতরাং হাদীসের দ্বারা কোন রাবী হাসান হাদীস - এর রাবীর গুণসম্পন্ন নয় সে হাদীসকে হাদীসে যঈফ বলে। (রাবীর যু'ফ বা দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যঈফ বলা হয়)।

মাউযু (موضوع) হাদীস বা বানোয়াট বা জাল হাদীসঃ মূলতঃ **'মাউজু' (موضوع)** শব্দটি আরবী। 'ওয়ায' শব্দ হতে গঠিত। 'ওয়াযা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। **موضوع** কর্মবাচক বিশেষ্য **وَضْع** ক্রিয়া বিশেষ্য থেকে উদ্‌গত, অর্থ বানোয়াট, তৈরিকৃত ও নির্মিত। 'মাওদু'র আরেক অর্থ **الشيء المحطوط** অর্থাৎ জমিনে পতিত বস্তু। যেমনঃ কোন বস্তুকে কোন স্থানে রাখা, স্থাপন করা, কারো মর্যাদাকে খাট করা, নির্ধারণ করা, নতুন করে কোন জিনিস বানানো, মিথ্যা উপাখ্যান করা ইত্যাদি। তবে হাদীস শাস্ত্রে 'ওয়াযা' বলা হয়, যা রাসূল (সাঃ) বলেননি, করেননি এবং সমর্থনও দেননি এমন কথা বা কাজকে রাসূল (সাঃ) এর দিকে মিথ্যা সম্বন্ধ করা। অতএব, যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃত ভাবে রাসুল (সাঃ) এর নামে বানোয়াট কথা সমাজে প্রচার করেছে অথবা, ইচ্ছাকৃত ভাবে হাদীসের সুত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করেছে বলে প্রমানিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে বানোয়াট বা মাউযু হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[181] ইত্তেবায় সুন্নাহ – মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ হারুন আযীযী নদভী, পৃষ্ঠা নং - ৪৭

মওযু বা জাল হাদীস হচ্ছে সেই হাদীস যে হাদীসের মধ্যে সনদের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অন্তত কোন এক স্তরে একজন রাবী এমন আছে যাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করা যায়। রাসূল (সাঃ) যে কথা বলেননি সে কথাকে তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ। এর পরকালীন পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَكْذِبُوا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

অর্থঃ- আলী ইবনুল জা'দ (রহঃ)... 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বলেছেনঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (ইলম বা জ্ঞান অধ্যায় :: সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদীস ১০৮)[182]। রাসূল (সাঃ) আরও ইরশাদ করেছেনঃ

" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

"যে আমার উপর মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"। [মুসলিম। আন-নুযহাহ্ঃ (পৃষ্ঠা নং - ১২১-১২২)][183]

---

[182] ইলম বা জ্ঞান অধ্যায় :: সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদীস ১০৮

[183] মুসলিম। আন-নুযহাহ্ঃ (পৃষ্ঠা নং - ১২১-১২২)

নিচে কতিপয় মুহাদ্দিসীনের ‘মাউজু’ বা জাল হাদীসের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো। যেমনঃ

১. ইমাম নববী (রহঃ) (মৃ:৬৭৬ হিঃ) বলেনঃ

الموضوع : هو المختلق المصنوع

‘মাওজু’ বলা হয় যা নতুন করে সৃষ্ট, বানানো। (আত-তাকরীব মা‘আ তাদরীবির রাবীঃ ২৩৯)[184]

২. শায়েখ নুরুদ্দীন আত্তার (রহঃ) এভাবেই সংজ্ঞা দিয়েছেন স্বীয় গ্রন্থে – মানহাজুন নাকদ ফি উলুমিল হাদীস ১/৩০১। এছাড়া – লিসানুল মুহাদ্দেসীন ৪/২১৬ এর মধ্যে এভাবেই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

৩. শায়েখ জামালুদ্দিন কাসেমী (রহঃ) বলেনঃ

الموضوع : هو الكذب المختلق المصنوع

‘মাওজু’ বলা হয়, যা মিথ্যা, নতুন করে সৃষ্ট ও বানানো। (কাওয়ায়েদুত তাহদীস ১/২৭)[185]।

---

[184] আত-তাকরীব মা‘আ তাদরীবির রাবীঃ ২৩৯

[185] কাওয়ায়েদুত তাহদীস ১/২৭

৪. হাফেজ সাখাভী (রহঃ) (মৃত: ৯০২হি:) বলেন,

الموضوع: هوالمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

'মাউজু' বলা হয়, যা রাসূল (সাঃ) এর নামে মিথ্যা-মিথ্যি চালিয়ে দেয়া হয়েছে। (গায়াহ ফি শারহিল হিদায়াঃ ১/১৮)[186]

৫. শায়েখ তাহের জাযায়েরী (রহঃ) (মৃঃ) বলেনঃ

الموضوع: هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم – سواء كان عمدا أوخطأ

'মাউজু' বলা হয়, ঐ হাদীস কে যা রাসূল (সাঃ) এর নামে মিথ্যা রচনা করা হয়েছে, তা ইচ্ছা কৃত হোক বা ভুল বসত। (তাওজিহুন নজরঃ ২/৫৭৪)[187]।

৬. শায়েখ হা্মযা মালিবারী (রহঃ) বলেনঃ

المضوع: هوما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا من قول أو فعل أوتقرير.

علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد : 70/1

---

[186] গায়াহ ফি শারহিল হিদায়াঃ ১/১৮

[187] তাওজিহুন নজরঃ ২/৫৭৪

'মাউজু' বলা হয়, ঐ কথা, কাজ বা সমর্থনকে যা রাসূল (সাঃ) এর নামে মিথ্যা রচনা করে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

মূলতঃ এ কারনেই মুসলিম সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّى، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»

"যে আমার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করল, অথচ দেখা যাচ্ছে তা মিথ্যা, তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন"।
অপর হাদীসে তিনি ইরশাদ করেনঃ

«وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"আর আমার উপর যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।

(৬) ড. মাহমুদ তাহহান তাঁর বিখ্যাত বই তাইসিরু মুস্তাসিল হাদীস নামক গ্রন্থে বলেনঃ

المضوع: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

'মাউজু' বলা হয় ঐ মিথ্যা, নতুন সৃষ্ট বা বানানো কথাকে যা রাসূলের (সাঃ) নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। (তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃষ্ঠা নং – ৮৯)[188]। তাছাড়া এ ব্যাপারে অন্যদের বক্তব্যও তথৈবচ। সারকথা, রাসূল (সাঃ) যা করেননি, বলেননি, বা সমর্থনও দেননি এমন বিষয়কে রাসূল (সাঃ) এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে এগুলোই 'মাউজু' বা জাল হাদীস। শায়েখ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আবু শুহবাহ (রহঃ) বলেনঃ

الموضوع من حيث مادته و نصه نوعان

1- أن يضع الواضع كلاما من عند نفسه , ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي , أو التابعي

2- أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين أو الحكماء , أو الصوفية , أو ما يروي في الإ سراإيليات , فينسبه ' إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ليروج وينال القبول,

সূতরাং যে কথা, কাজ বা মৌন সমথর্ন রাসূল (সাঃ) এর নামে মিথ্যা মিথ্যি চালিয়ে দেয়া হয়েছে তাকেই 'মাউজু' বা জাল হাদীস বলা হয়। তাছাড়া হাদীস বিশারদগণের যাঁরাই 'মাউজু' বা জাল হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁরা এমনই বলেছেন - যা রাসূল (সাঃ)

---

[188] তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃষ্ঠা নং – ৮৯

বলেননি, করেননি এবং সমর্থনও দেননি এমন কথা বা কাজকে রাসূল সা. য়ের নামে চালিয়ে দেয়াকে ‘মাউজু’ বলা হয়।

যঈফ ও জাল হাদীস এর সূত্রপাত

হিজরী চল্লিশ সন হলো সুন্নাতের অনাবিল বিশুদ্ধতা এবং এর মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ও জাল হাদীস রচনার একটি চিহ্নিত সীমারেখা। এরপর সুন্নতে চললো সংযোজন; সুন্নতকে করা হলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার এবং অভ্যন্তরীন বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধ্যম। অর্থাৎ হিজরী চল্লিশ সন পর্যন্ত সুন্নত ছিল পবিত্র। তারপর এ দুর্ঘটনাটি ঘটল তখন, যখন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যকার বিরোধ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করলো। রক্তক্ষয় হলো প্রচুর, অনেক লোক প্রাণ হারালো, মুসলমানরা হয়ে পড়লো বিভক্তবিভিন্ন দলে। বেশিরভাগ লোকই ছিলো হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর বিপক্ষে। তারপর উদ্ভব হলো খারিজীদের। তারা প্রথমে ছিল হযরত আলী (রাঃ) এর একান্ত সমর্থক। তারপর তারা তাকে বর্জন করলো এবং দোষারোপ করতে থাকলো হযরত আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয়কে। হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাৎ এবং ও মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খিলাফত গ্রহণের পর আল-ই-বায়ত খিলাফততাদের প্রাপ্য বলে দাবী করতে থাকলো। তারা উমাইয়্যা বংশের আনুগত্য স্বীকার

করলো না। এ রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে মুসলমানগণ বহু বড় বড় ও ছোট ছোট দলেবিভক্ত হয়ে পড়লো। প্রতিটি দলই নিজ নিজ দলের পক্ষে কুর'আন ও হাদীসকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগলো। এটা অতীব সত্য কথা যে, প্রতিটি দল যা দাবী করবে, তার অনুকূলে কুর'আন ও সুন্নত থাকবে না। সুতরাং কোন কোন দল কুর'আনের অর্থকে বাদ দিয়ে বিরূপ বা বিকৃত ব্যাখ্যা শুরু করে দিল। আর সুন্নত যে অর্থ বহন করে, তা গ্রহণ না করে অপর অর্থ গ্রহণ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে এমনও কোন কোন দল ছিল, যারা তাদের দলীয় সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে হাদীস বর্ণনা শুরু করলো। তাদের পক্ষে অতি কঠিন ঠেকলো কুর'আনের বেলায় অনুরূপ কিছু করার; কারণ কুর'আন অতি সুরক্ষিত। মুসলমানদের বক্ষে বক্ষে কুর'আন, মুখে মুখে তিলাওয়াত। এখান থেকেই শুরু হলো জাল হাদীস রচনার আর বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে জাল হাদীসের সংমিশ্রণ।জাল হাদীস রচনা কারীরা প্রথমে যে গুপ্ত পথ রচনা করল, তা হলো বিভিন্ন ব্যক্তির ফযীলত সম্পর্কে। তাদের ইমাম ও দল- উপদলের শীর্ষ স্থানীয় লোকদের ফযীলত সম্পর্কে তার বহু জাল হাদীস রচনা করলো। বলা হয়ে থাকে শিয়ারাই প্রথমে এর সূত্রপাত করলো। ইবনে আবদুল হাদীদ 'শরহে নাহজুল বালাগাহ তে অনুরূপ কথা লিখেছেন – "তোমরা জেনে রেখ, ফযীলত সম্পর্কে যত মিথ্যা হাদীস রচিত হয়েছে, এর মূল হলো শিয়াগণ।"

ইরাক হলো জাল হাদীস রচনার আড্ডা খানা। হাদীসের ইমামগণও এর প্রতি ইংগিত করেছেন। ইমাম যুহরী (রাঃ) বলেছেনঃ "আমাদের নিকট হতে হাদীস বের হয়ে যেত এক বিঘত তারপর ইরাক হতে ফিরে আসত আমাদের নিকট এক হাত হয়ে।"

ইমাম মালেক (রাঃ) বলতেন "ইরাক হলো জাল হাদীসের টাকশাল।" যঈফ ও জাল হাদীস সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পর্যালোচনা মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী জাহান্নামী। সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া জাল বা জঈফ হাদীস আমল করার জন্য বর্ণনা করা যাবে না। তবে বর্জন করার জন্য জঈফ ও জাল হাদীস জানা দরকার। জঈফ হাদীস রাসূলের সূন্নাহর ব্যাপারে কিছু অনুমান-ধারণার সৃষ্টি করে মাত্র। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِيّاكُمْ وَالظّنّ فَإِنّ الظّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيث

তোমরা ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক কারণ ধারণা-অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। (সহীহুল বুখারী: ৬০৬৬, ৬৭২৪,

সহিহ মুসলিম: ৬৪৩০)[189]। আর জাল বা মিথ্যা হাদীস যা স্পষ্ট রাসূলের কথা নয়।

সুতরাং হাদীস যাচাই করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। (সহীহ মুসলিম)[190]।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
مِينَ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِ

হে মু’মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য যেন অনুতপ্ত না হও। (হুজরাত, ৪৯/৬)[191]।

---

[189] সহীহুল বুখারী: ৬০৬৬, ৬৭২৪, সহিহ মুসলিম: ৬৪৩০

[190] সহীহ মুসলিম

[191] হুজরাত, ৪৯/৬

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إنّ كَذِبًا عَلَيّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمّدًا، فَلْيَتَبَوّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار

"নিশ্চয় আমার উপর মিথ্যা বলা, কারো উপর মিথ্যা বলার মত নয়, যে আমার উপর মিথ্যা বলল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়"। বুখারী: ১২৯১

لاَ تَكْذِبُوا عَلَيّ، فَإِنّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيّ فَلْيَلِجِ النّارَ

তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না কারণ যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে জাহান্নামে যাবে। (সহীহুল বুখারীঃ ১০৬)[192]।

مَنْ كَذَبَ عَلَيّ فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ

যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (বুখারী, হাদীস: ১০৭)[193]।

مَنْ تَعَمّدَ عَلَىّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ

---

[192] সহীহুল বুখারীঃ ১০৬

[193] বুখারী, হাদীস: ১০৭

যে ব্যাক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।' (বুখারী, হাঃ ১০৯)[194]।

قفقالَ أنَسٌ إنّهُ لَيَمْنَعُنِي أنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أنّ النّبِيّ (صلى الله عليه وسلم
قالَ " مَنْ تَعَمّدَ عَلَىّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। [বুখারীঃ ১০৮, মুসলিম][195]।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلّ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ

সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিনা দলিলে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম লোকদেরকে হিদায়েত করেন না। আনআম, ৬/১৪৪

[194] বুখারী, হাঃ ১০৯

[195] বুখারীঃ ১০৮, মুসলিম

রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস মানুষ বর্ণনা করছে, সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ কোনটি রাসূলের হাদীস আর কোনটি রাসূলের হাদীস নয়, তা পৃথক করেছেন। তাই মিথ্যা ও দুর্বল হাদীস ত্যাগ করে সহীহ ও হাসান হাদীসগুলো আমরা মানব।

যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি

১. সালাতের যাবতীয় আহকাম সহীহ দলীল ভিত্তিক হ'তে হবে।কারণ এটা ইবাদতে তাওক্বীফী যাতে দলীল বিহীন মনগড়া কোন কিছু করার সুযোগ নেই। প্রমাণহীন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পন্ডিত বা ফক্বীহ বলেছেন তা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তা'আলা তাই পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

'সুতরাং তোমরা যদি না জান তাহ'লে স্পষ্ট দলীলসহ আহ'লে যিকিরদের জিজ্ঞেস কর' (সূরা নাহল ৪৩-৪৪)[196]। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সর্বদাদলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহবান

[196] সূরা নাহল ৪৩-৪৪

জানাতেন[197]। ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামও দলীলের ভিত্তিতে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন,

لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ

‘ঐ ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যে জানে না আমরাউহা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি’[198]।

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتَ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِيْ الْحَائِطَ

[197] সূরা ইউসুফ ১০৮; নাজম ৩-৪; সূরা হা-ক্কাহ ৪৪-৪৬; সহীহ বুখারী হা/৫৭৬৫, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৫৮, ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; আহমাদ ইবনু শু‘আইব আবু আব্দির রহমানআন-নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ আল-কুবরা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১১/১৯৯১), হা/১১১৭৪, ৬/৩৪৩ পৃঃ; আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আবুমুহাম্মাদ আদ-দারেমী, সুনানুদ দারেমী (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হিঃ), হা/২০২; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯, ১/১২৩পৃঃ; সহীহ বুখারী হা/১৪৬৫, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৮, ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬২

[198] ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুআক্কেঈন আন রাবিবল আলামীন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আলইলমিয়াহ, ১৯৯৯৩/ ১৪১৪), ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুররায়েক্ব ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৯৩; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিফাতুসালাতিন নাবী (সাঃ) মিনাত তাকবীরি ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৪৬

'যখন তুমি আমার কোন কথা হাদীসের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীসের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুড়ে মারবে'[199]।

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হিঃ) সহ অন্যান্য ইমামদের বক্তব্যও একই [200]।

২. জাল ও যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সকল প্রকার আমল নিঃসঙ্কোচে নিঃশর্তভাবে বর্জন করতে হবে। কারণ জাল ও যঈফ হাদীস দ্বারা কোনশারঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। জাল হাদীসের উপর আমল করা পরিষ্কার হারাম[201]। সে কারণ সাহাবায়ে কেরাম যঈফ ও জাল হাদীসের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। আস্থাহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক শ্রেণীর লোকের বর্ণনাতারা গ্রহণ করতেন না। প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

---

[199] আল-খুলাসাফী সবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফীআহ কামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (কায়রো: আল-মাতবাআতুস সালাফিয়াহ, ১৩৪৫ হিঃ), পৃঃ ২৭

[200] শারহু মুখতাসার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ; ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২৮

[201] সূরা আন'আম ১৪৪; আ'রাফ ৩৩; হুজুরাত ৬; সহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও৬০৬৪, ২/৮৯; ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম (দেওবন্দ: আছাহহুল মাতাবে'১৯৮৬), হা/৬৫৩৬, ২/৩১৬; মিশকাত হা/৫০২৮, পৃঃ ৪২৭)

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) - এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীস ছেড়ে কেবল সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরা। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ঘোষণা করেন,

إِذَا صَحّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

'যখন হাদীস সহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব'[202]।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,

إِنّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الصّحِيْحَ وَالسّقِيْمَ وَالنّاسِخَ والْمَنْسُوْخَ مِنَ الْحَدِيْثِ لاَيُسَمّى عَالِمًا

'নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীসের সহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না'। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন[203]।

ইমাম মালেক, শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যও অনুরূপ[204]। মুহাদ্দিস যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

---

[202] আব্দুল ওয়াহহাব শা'রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০

[203] আলবানী, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম, মা'রেফাতু উলূমিল হাদীস, পৃঃ ৬০

[204] সহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ, 'যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৩; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮০/১৪০০), পৃঃ ২৩৭

‘হাদীস মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম’[205]।

অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা অন্য যেই হোন শরী‘আত সম্পর্কে কোন বক্তব্যপেশ করলে তা অবশ্যই সহীহ দলীলভিত্তিক হ’তে হবে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন ... ‘যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি’ শীর্ষক বই – মুযাফফর বিন মুহসিন, আছ ছিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী)[206]।

৩. প্রচলিত কোন আমল শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে ভুল প্রমাণিত হ’লে সাথে সাথে তা বর্জন করতে হবে এবং সঠিকটা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামী করা যাবে না। পূর্বপুরুষরা এবং বড় বড় আলেমগণ করেগেছেন, এখনো সমাজে চালু আছে, বেশীর ভাগ আলেম বলছেন এ সমস্ত জাহেলী কথা বলা যাবে না।

---

[205] মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত (বৈরুত : দারুল এহইয়াইত তুরাছআল-আরাবী, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ৭; ড. ওমর ইবনু হাসান ফালাতাহ, আল-ওয়ায‘উ ফিলহাদীস (দিমাষ্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৩

[206] ‘যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি’ শীর্ষক বই – মুযাফফর বিন মুহসিন, আছ ছিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী

ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত। মানুষ মাত্রই ভুল করবে, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বেনয়। তবে ভুল করার পর যে সংশোধন করে নেয় সেই সর্বোত্তম। আর যে সংশোধন করেনা সে শয়তানের বন্ধু।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর উত্তম ভুলকারী সে-ই যে তওবাকারী' [207]। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ও ভুল করেছেন এবং সংশোধন করে নিয়েছেন[208]। সাহো সিজদার বিধানও এখান থেকেই চালু হয়েছে। অনুরূপ চার খলীফাসহ অন্যান্য সাহাবীদেরও ভুল হয়েছে[209]। তাছাড়া অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সাঃ) কোন বিধানকে রহিত করেছেন এবং তারস্থলে অন্যটি চালু করেছেন (সূরা বাক্বারাহ : ১০৬)। তখন সেটাই সকল সাহাবী গ্রহণ করেছেন।

অতএব বড় বড় আলেমের ভুল হয় না এই ধারণা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই সংশোধনের ক্ষেত্রে কখনো গোঁড়ামী করা যাবে না। কারণ ভুল

---

[207] সহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, ২/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/২৩৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩২, ৫/১০৪ পৃঃ

[208] মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১২২৯; মিশকাত হা/১০১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৫১, ৩/২৫পৃঃ

[209] ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্বেঈন ২/২৭০-২৭২

সংশোধন না করে বাপ-দাদা বা বড় আলেমদের দোহাই দেওয়া অমুসলিমদের স্বভাব (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ১৭০; সূরা লোকমান, আয়াত ২১)[210]।

৪. খুঁটিনাটি বলে কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবে না: ইসলামের কোন বিধানই খুঁটিনাটি নয়। অনুরূপ কোন সুন্নাতই ছোট নয়। এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেরিয়ে এসে রাসূল (সাঃ) – এর যে কোন সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞাকরা ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা অমার্জনীয় অপরাধ। সেই সুন্নাত যতই সাধারণ বা হালকা হোক না কেন। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণ এই অবহেলাকে মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা বারা ইবনু আযেব (রাঃ) - কে ঘুমানোর দো'আ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার এক অংশে তিনি বলেন, '(হে আল্লাহ!) আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন'। আর বারা (রাঃ) বলেন, 'এবং আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন'।

উক্ত কথা শুনে রাসূল (সাঃ) তার হাত দ্বারা বারার বুকে আঘাত করে বলেন, বরং 'আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম যাকে

---

210 সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ১৭০; সূরা লোকমান, আয়াত ২১

আপনি প্রেরণ করেছেন’[211]। এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘নবীর’ স্থানে ‘রাসূল’ শব্দটিকে বরদাশত করলেন না। জনৈক সাহাবী সালাতের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি করলে তিনি তাকে ডেকে বলেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না। তুমি কি দেখ না কিভাবে সালাত আদায় করছ? [212]।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সালাতের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতে শুরু করেছেন। এমতাবস্থায় দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে সম্মুখে একটু বেড়ে গেছে তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! হয় তোমরা কাতার সোজা করবে না হয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের চেহারা সমূহকে ভিন্নরূপ করে দিবেন’[213]।

নবী (সাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে সালাত আদায় করতে দেখে তিনি ডান হাতটাকে বাম

---

[211] وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ قَالَ فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِيْ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ آمَنْتُ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ – তিরমিযী হা/৩৩৯৪, ২/১৭৬-১৭৭, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘ঘুমানোর জন্য বিছানায় গিয়ে দো‘আ
পড়া’অনুচ্ছেদ; সহীহ বুখারী হা/৬৩১১, ‘দো‘আ সমূহ’অধ্যায়-৮৩, অনুচ্ছেদ-৬; সহীহ মুসলিম হা/৭০৫৭

[212] আহমাদ হা/৯৭৯০, সনদ সহীহ, মিশকাত হা/৮১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৫

[213] فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ خَرَجَ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ /৭০০১, ১/৮২ পৃঃ, ‘সালাতে কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১৭

হাতের উপর করে দেন[214]। অতএব সালাতের যে কোন আহকামকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। বরং সেগুলো পালনে বাহ্যিকভাবে যেমন নানাবিধ উপকার রয়েছে তেমনি অঢেল নেকীও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে রয়েছে ধৈর্যের যুগ। সে সময় যে ব্যক্তি সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে তোমাদের সময়ের ৫০ জন শহীদের নেকী পাবে’[215]। বর্তমানে যুগের প্রত্যেক সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তির জন্যই এই সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি (কাতারের মধ্যে দু’জনের) ফাঁক বন্ধ করবে আল্লাহ তা‘আলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন’। ২৩ যে ব্যক্তি সালাতে স্বশব্দে আমীন বলবে এবং তা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলেযাবে তা পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে[216]। সবচেয়ে বড় বিষয় হ’ল, এই সুন্নাতগুলো সমাজে চালু করতে শত শত হকবপন্থী আলেমের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। ফাঁসির

---

[214] عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى - মুসনাদে আহমাদ হা/১৫১৩১; সহীহ আবু দাঊদ হা/৭৫৫, সনদ হাসান

[215] إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيدًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ مِنْكُمْ - তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১০২৪০; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল হাদীস আছ-ছহীহাহ ওয়াশাইয়ুন মিন ফিক্বহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৪৯৪; সনদ সহীহ, সহীহুল জামে‘ হা/২২৩৪

[216] مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ – তাবারাণী, আওসাত্ব হা/৫৭৯৭; সনদ সহীহ, সিলসিলা সহীহাহ হা/১৮৯২

কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে, অন্ধ কারাগারে জীবন দিতে হয়েছে, দীপান্তরে কালা পানির ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। যেমন বুকের উপর হাত বাঁধা, জোরে আমীন বলা, রাফঊল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি। আর সেই সুন্নাত সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কত বড় অন্যায় তা ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

৫. সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে গিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই যে কতজন লোক তা করছে, কোন মাযহাবে চালু আছে, কোন ইমাম কী বলেছেন বা আমল করেছেন কিংবা কোন দেশের লোক করছে আর কোন দেশের লোক করছে না। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রেরিত সংবিধান চিরন্তন। যা নিজস্ব গতিতে চলমান। এই মহা সত্যকেই সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে একাকী হ'লেও। ইবরাহীম (আঃ) নানা যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে একাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি বিশ্ব ইতিহাসে মহা সম্মানিত হয়েছেন (নাহল ১২০; বাক্বারাহ ১২৪)।

সমগ্র জগতের বিদ্রোহী মানুষরা তার সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সংখ্যা কোন কাজে আসেনি। মূলকথা হ'ল- ওহীর বিধান সংখ্যা, দেশ, অঞ্চল, বয়স, সময়, মেধা কোন কিছুকে তোয়াক্কা করে না। অনেকে বলতে চায় চার ইমামের পরে মুহাদ্দিসগণের জন্ম।

সুতরাং ইমামদের কথাই গ্রহণযোগ্য। অথচ সাহাবীরা সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতে বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৬/৭ বছরের বাচ্চাকে দিয়ে সালাত পড়িয়ে নিয়েছেন [217]।

ওমর (রাঃ) কনিষ্ঠ সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর নিকট থেকে বাড়ীতে তিনবার সালাম দেওয়া সংক্রান্ত হাদীসের পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ করেন। কারণ তিনি এই হাদীস জানতেন না[218]।

অতএব মহা সত্যের উপর কোন কিছুর প্রাধান্য নেই। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই হল জামা'আত যদি তুমি একাকী হও'[219]। অতএব হক পন্থী ব্যক্তি একাকী হ'লেও সেটাই জান্নাতী দল।

৬. কোন দল বা মাযহাবী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কৌশল করে কিংবা অপব্যাখ্যা করে ইলাহী বিধানকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে নাঃ উক্ত জঘন্য নীতির জয়জয়কার চলছে সহস্র বছর ধরে। এক শ্রেণীর মানুষ অণু পরিমাণ জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর জ্ঞানের উপর প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এই অপকৌশলের যে কী শাস্তি

---

[217] সহীহ বুখারী, তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ, হা/৭৮০ ও ৭৮২; সহীহ মুসলিম হা/৯৪০, ৯৪২ ১/১৭৬

[218] সহীহ মুসলিম হা/৫৬২৬, ২/২১০ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়, 'অনুমতি' অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/৪৬৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৬২ ৯/১৯ পৃঃ

[219] اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ – ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাস্ক ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ সহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রঃ, ১/৬১ পৃঃ; ইমাম লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ ১/১০৮ পৃঃ

তা তারা ভুলে গেছে। মূল শরী'আত কে উপেক্ষা করে দলীয় সিদ্ধান্ত ও মাযহাবী নীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য থাকলে বানী ইসরাঈলদের মত তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসা স্বাভাবিক।

দাঊদ (আঃ) - এর সময় তারা মহা সত্যকে না মেনে মিথ্যা কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার কারণেই তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল এবং একই দিনে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল[220]। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা করেমানুষকে যারা বিভ্রান্ত করবে তাদের পরিণাম এমনই হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হ'তে পারে আবার বিপক্ষেও দলীল হ'তে পারে'[221]।

সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জানা উচিত যে, শারঈ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি যাই করি এবং যে উদ্দেশ্যেই করি অন্তরের খবর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবই জানেন[222]। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকেই আমাকে বলে বা প্রশ্ন করে যে, আমরা পূর্ব থেকে যে নিয়ম অনুসরন করে আসছি তা কি ভুল ছিল? এর উত্তরে বলব যে, হা অবশ্যই ভুল ছিল। কারন এটি পূর্ব থেকে চলে আসে নি বরং ভারতীয় উপমহাদেশে কতিপয় মাযহাবপন্থীরাই কেবল এইসব জাল

[220] সূরা বাক্বারাহ ৬৫; মায়েদা ৬০

[221] সহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১

[222] মুলক ১৩; আলে ইমরান ১১৯

ও যঈফ হাদীস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যার কারনে রাসূল (সা:) এর সঠিক নিয়ম অনুযায়ী এখন যাবতীয় সহীহ হাদীস কার্যক্রম গবেষনা করা হচ্ছে বিধায় সঠিকটাকে ভুল মনে হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাই পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেছেন: “তোমরা সেই লোকদের মত হয়ে যেয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমান আসার পরেও বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ করেছে এবং করছে এবং এই শ্রেনীর লোকদের জন্য আছে মহা শাস্তি তার রবের পক্ষ থেকে।” অতএব, আল্লাহ আমাদের সঠিক বিষয় বুঝার তৌফিক দান করুন, আমীন।

হাদীস জাল করার কারণ ও উদ্দেশ্য

ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী ইসলামের মূলোচ্ছেদ করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। মুসলামন নাম ও বেশ ধারনের ছদ্মাবরণে কতিপয় লোক জাল করনের মতো ঘৃণ্য ও হীন পন্থা বেছে নেয়। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে জালকারীদেরকে ৬টি স্তরে ভাগ করা যায়। এই ছয় শ্রেণীর লোক স্ব স্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হাদীস জালকরণে প্রবৃত্ত হয়[223]।

[223] যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন (১ম, ২য় ও তৃতীয় খন্ড একত্রে) – মূলঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), অনুবাদ – অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, পৃষ্ঠা নং – ৪৫, কাঁটাবন বুক কর্ণার।

নিম্নে হাদীস জাল করার কারন ও উদ্দেশ্য সমূহ আলোচনা করা হলোঃ-

১) মুনাফিকরা এবং কাফিররা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম ছদ্মবেশে জাল হাদীস প্রচার করতো।

২) আলেমদের মধ্যে যারা নিজেরা যত বেশি হাদীস সংগ্রহ করেছে বলে দাবি করতে পারতো, সে তত বেশি সন্মান পেত। তাই সন্মানের লোভে অনেক আলেম, পীর, দরবেশ মিথ্যা হাদীস প্রচার করে গেছে।

"এই হাদীসটির ইস্‌নাদ আমার কাছে একদম মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে এসে পৌঁছেছে"— এই ধরনের দাবী করতে পারাটা একটা বিরাট গৌরবের ব্যাপার ছিল, এখনও আছে।

৩) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আগেকার রাজা-বাদশা, শাসকরা আলেমদের ব্যবহার করে মিথ্যা হাদীস প্রচার করতো। জনতাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হাদীসের চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর কিছু ছিল না।

৪) ধর্মের প্রতি মানুষকে আরও অনুপ্রাণিত করার জন্য নানা চমকপ্রদ, অলৌকিক ঘটনায় ভরপুর জাল হাদীস প্রচার করা হত, যেগুলো শুনে সাধারণ মানুষ ভক্তিতে গদগদ হয়ে যেত।

৬) ধর্মীয় উপাসনালয় এবং বিশেষ স্থানগুলোতে মানুষের আনাগোনা বাড়ানো এবং তা থেকে ব্যবসায়িক লাভের জন্য জাল হাদীস ব্যবহার করে সেসব স্থানের অলৌকিকতা, বিশেষ ফজিলত প্রচার করা হত। সাধারণ মানুষ তখন ঝাঁকে ঝাঁকে সেই সব অলৌকিক, প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়ে তাদের বিপুল পরিমাণের অর্থনৈতিক লাভ করে দিয়ে আসতো।

৭) জিন্দিকগণ পারসিক জিনদের ধর্মাবলম্বী একদল লোক বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত, কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভাবে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় থাকত। এ সমস্ত লোকেরা ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাহীন করার জন্য রাসুলের (সাঃ) নামে অযৌক্তিক হাজার হাজার হাদীস প্রচলন করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের অনিষ্ট সাধন। তাছাড়া সাধারন মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতঃ ইসলামের সৌন্দর্য নষ্ট করা ও অগ্রগতি ব্যবত করাই তাদের উদ্দেশ্য। এরা ইসলাম বিদ্বেষী চরম শত্রু[224]। হাম্মাদ বিন যায়েদ বলেনঃ যিনদীকরা রাসূল (সাঃ) এর নামে ১৪ হাজার হাদীস জাল করে। আবদুল করীম ইবনে আবুল আওযা নামে এক যিনদীককে মাহদীর খেলাফত আমলে বসরার আমীর মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আল আব্বাসী ১৬০ হিজরী সনে

---

[224] যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন – মূলঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), অনুবাদঃ অধ্যাপক মাওলান মোঃ আব্দুল আযীয। পৃষ্ঠা নং - ৪৫

যিনদীক হওয়ার কারনে হত্যা করেন। হত্যা করার সময় সে বলেঃ “আমি তোমাদের মধ্যে চার (৪) হাজার হাদীস জাল করি যেগুলোর মাধ্যমে আমি হালালকে হারাম মনে করি আর হারামকে হালাল মনে করি।”

যিনদীক গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – বনী তামীমের কিনইয়ান ইবনে সাময়ান আন-নাহদী। খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসরী তাকে হত্যা করে আগুনে জ্বালিয়ে দেন। মুহাম্মদ বিন সায়ীদ ইবনে হাসান আল আসাদী নামীয় যিনদীককে আবু জাফর আল মানসুর হত্যা করেন। সে প্রায় চার হাজার জাল করে।

৮) অতি পরহেজগারগণ নিজেদেরকে সূফি প্রমানের লক্ষে জাল হাদীস তৈরি করত।

৯) সদুদ্দেশ্যে

১০) তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)- এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে।

১১) যুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য।

১২) মুকাল্লিদগণঃ ভিবিন্ন ইমামদের অনুসারীরা নিজেদের ইমামের শ্রেষ্টত্ব প্রমানের জন্য জাল হাদীস রচনা করে।

১৩) মুসাহেবগণঃ রাজা-বাদশা ও আমীর উমরাহদের মুসাহেবগণ নিজেদের প্রভুকে খুশি করার জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করত।

১৪) বক্তাগণ।

১৫) অসতর্কতা ও অন্ধভক্তি।

১৬) সুফিগণ।

ইতিহাসের কিছু বিখ্যাত হাদীস জালকারী—

খলিফা মাহদী আব্বাসীর শাসনামলে আব্দুল কারিম বিন আল আরযাকে যখন শাস্তি স্বরূপ হত্যা করার জন্য আনা হয় তখন সে প্রায় চার হাজার হাদীস জাল করার কথা স্বীকার করেছিল।

আবু আসমা নুহ বিন আবি মারিয়াম কু'রআনের প্রতিটি সূরার নানা ধরণের ফজিলত নিয়ে শত শত জাল হাদীস প্রচার করেছে, যখন সে লক্ষ করেছিল মানুষ কু'রআনের প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল না। যেমন, সূরা ইয়াসিন কু'রআনের দশ ভাগের একভাগ, অমুক সূরা পড়লে কু'রআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি। [কিতাব আল মাউজুয়াত – ইবন জাওযি, পৃষ্ঠা ১৪][225]।

---

[225] কিতাব আল মাউজুয়াত – ইবন জাওযি, পৃষ্ঠা ১৪

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ নানা ধরণের ভালো কাজের বিভিন্ন ধরণের ফজিলত নিয়ে অনেক হাদীস জাল করেছে। সে একজন ইহুদী ছিল মুসলমান হবার আগে। [আল মাউজুয়াত][226]

আবু দাউদ নাখী একজন অত্যন্ত নিবাদিত প্রাণ ধার্মিক ছিলেন। তিনি রাতের বেশিরভাগ সময় নামায পরতেন এবং প্রায়ই দিনে রোজা রাখতেন। তিনিও নানা ধরণের বানানো হাদীস প্রচার করেছেন মানুষকে ধর্মীয় কাজে মাত্রাতিরিক্ত মগ্ন রাখার জন্য। [আল মাউজুয়াত - ৪১][227] এছাড়াও জাল হাদীসের পরিচয়ের ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ সূক্ষাতিসূক্ষ্ম আলোচনা পর্যালোচনা করার পর তাদেরকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করার জন্যে তাদের নামের বর্ণিত হাদীসের একটি বিরাট তালিকা তৈরী করেন। যার ফলে আমাদের নবীর অনুসৃত বাণীগুলো ভেজাল ও ভাইরাসে আক্রান্ত হতে রক্ষা পায়।

যাদের হাদীস গ্রহণ করা যাবে নাঃ-

১. রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী।

২. সাধারণ কথা বার্তায় যারা মিথ্যা কথা বলে।

---

[226] আল মাউজুয়াত

[227] আল মাউজুয়াত - ৪১

৩. বিদয়াতী প্রবৃত্তির অনুসারী।

৪. জিন্দিক, পারসিক, অমনোযোগী ও অসতর্ক ব্যাক্তিবর্গ এবং যাদের মধ্যে আদালত, যাত ও ফাহাম (ন্যায় পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা) ইত্যাদি গুণাবলীর অনুপস্থিতি থাকবে।

হাদীস জালকারীদের কয়েকজন/মুহাদ্দিসগনের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে আধিক পরিচিত যারাঃ

১. আবান্ যাফার আন-নুমাইরীঃ এই ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) - এর নামে তিন শতাধিক হাদীস ছড়িয়েছেন।

২. ইবরাহীম ইবনে যায়িদ আল-আসলামীঃ এ ব্যক্তি ইমাম মালিক (রহঃ) - এর নামে বহু হাদীস ছড়িয়েছেন।

৩. আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ আ-জুওয়ায়বারীঃ সে সিয়াদের কাররামিয়া সম্প্রদায়ের নামে হজার হাজার হাদীস বর্ণনা করে।

৪. জাবির ইবনে ইয়াজিদ আল-যুফিঃ তাঁর সম্পর্কে সুফিয়ান বলেন, আমি জাবিরকে বলতে শুনেছি সে প্রায় ত্রিশ হাজার জাল হাদীস বর্ণনা করেছে।

৫. মহাম্মদ ইবনে সুজা আছ-ছালজীঃ সে সৃষ্ট বস্তুর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সাদৃশ্যমূলক বিষয়ে বহু হাদীস তৈরী করে মহাদ্দীসদের নামে ছড়িয়েছে।

৬. নুহ ইবনে আবি মারিয়ামঃ সে কুরআনের নানাবিধ ফজীলত ও বিভিন্ন সূরার সাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিষয়ক বহু হাদীস তৈরী করে ছড়িয়েছে।

* ইমাম আন-নাসাঈ (রহঃ) বলেন- জাল হাদীস রচনার সাথে জড়িত মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভকারী ব্যক্তি চারজনঃ

১. মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহইয়া

২. বাগদাদে আল-ওয়াকিদী

৩. খুরাসানে মুকাতিল

৪. শামে মুহাম্মদ ইবনে সাইদ আল-মাসলুব।

জাল হাদীসের লক্ষণঃ -

১. স্বীকারোক্তি

২. যে সকল হাদীসের প্রত্যক্ষ শর্তের বিপরীত কোন কিছু বর্ণিত হয় তা জাল হাদীস। যেমন বেগুন সকল রোগের ঔষধ।

৩. জীবনে একবারও হাদীস জাল করেছে বা জেনে শুনে জাল হাদীস প্রচার করেছে এমন ব্যাক্তির বর্ণিত হাদীস।

৪. যে হাদীসের বর্ণনা মূলের বিপরীত। যেমন- সূর্য তাপে তপ্ত জ্বলে, স্নান করলে কুষ্ঠ রোগ হয়।

৫. খাজা-খিজির সম্মন্ধে বর্ণিত সকল হাদীস।

৬. যে হাদীসে কোন জঘন্য ভাবের সমাবেশ আছে।

৭. যে হাদীসের ভাষা অশোভনীয়।

৮. যে হাদীসে এমন ঘটনা উল্লেখ আছে যে,তা ঘটে থাকলে বহুলোক জানার কথা ছিল,অথচ মাত্র একজন রাবী তা বর্ণনা করেছে।

৯. যে হাদীসে অনর্থক মুল্যহীন কথা আছে।

১০. যা কুরআন, সহীহ হাদীস ও কাতয়ী ইজমার বিপরীত।

১১. যে সকল হাদীসে সামান্য কাজের জন্য বড় বড় সওয়াব এবং সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর দন্ডের ওয়াদা করা হয়েছে।

কয়েকটি মাওযু হাদীস বা জাল হাদীসের উদাহরনঃ

১) "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব (ক্ষুধা) গ্রাস করবে না।" হাদীসটি দুর্বল। সূত্রঃ হাদীসটি হারিস ইবনু আবী উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১৭৮), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ" গ্রন্থে (৬৭৪), ইবনু লাল তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১১৬), ইবনু বিশরান "আল- আমালী" গ্রন্থে (২০/৩৮/১) বর্ণনা করেছেন আবূ শুযা' সূত্রে আবূ তায়বাহ হতে।

দুর্বল বলেছেনঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবূ হাতিম (রহঃ), ইবনু আবী হাতিম (রহঃ), দারা কুতুনী (রহঃ), ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)।

(ক) ইমাম মানাবী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটি মুনকার। (আত্-তায়সীর)

(খ) হাদীসটির রাবীদের সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেনঃ আবূ শুযাকে চেনা যায় না এবং আবূ তায়বাহ মাজহূল।

ইমাম যায়লাঈ (রহঃ) হাদীসটি দোষণীয় হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেনঃ-

(ক) এটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

(খ) হাদীসটির মতনে (ভাষায়) দুর্বোধ্যতা রয়েছে।

(গ) হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ দুর্বল।

(ঘ) এছাড়া ইযতিরাব রয়েছে।

২) "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকেয়াহ পাঠ করবে; তাকে কখনও অভাব গ্রাস করবে না। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে লা-উকসিমু বি-ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ পাঠ করবে; সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।"

হাদীসটি জাল। সূত্রঃ এটি দায়লামী, আহমাদ ইবনু উমার ইয়ামানী সূত্রে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) "যায়লুল আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (১৭৭) উল্লেখ করে বলেছেনঃ বর্ণনাকারী আহমাদ ইয়ামানী মিথ্যুক।

৩) “আমি সে সময়েও নবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন।”

নিম্নের হাদীসটিও এটির ন্যায়ঃ– “যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নবী ছিলাম।” হাদীস দু’ টি জাল।

হাদীসটি জাল বলেছেনঃ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এবং ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল মুহাদ্দিস।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) “বাকরীর প্রতিবাদ” গ্রন্থের মধ্যে (পৃষ্ঠাঃ ৯) বলেছেনঃ “কুর’আন ও হাদীসের মধ্যে এমন কি সুস্থ বিবেকেও এটির কোন ভিত্তি নেই। কোন মুহাদ্দিসই এটি উল্লেখ করেননি। এটির অর্থও বাতিল। কারণ আদম (আলাইহিস সালাম) কখনও পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন দেহ এবং রূহ এর মাঝে।”

৪) “চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।” হাদীসটি বাতিল। সূত্রঃ এটি যেসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ “আখবারু আসহাবান” (২/১০৬); “আল-ফাওয়াইদ” (২/২৪১); “আল-আরবা’য়ীন” (২/১৫১); “আত্-তারিখ” (৯/৩৬৪); “কিতাবুল রেহালা” (১/২); “আল-মাদখাল” (২৪১/৩২৪); “আল-মুনতাকা”

(১/২৮)। উপরের প্রত্যেকটি গ্রন্থে জাল হাদীসটি হাসান ইবনু আতিয়া সূত্রে "আবূ আতিকা" হতে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির বর্ণনাকারী "আবূ আতিকা" সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেনঃ এটি মুনকারূল হাদীস।

- ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।
- ইমাম উকায়লী (রহঃ) বলেনঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল।
- ইমাম আবূ হাতিম (রহঃ) বলেনঃ তিনি যাহেবুল হাদীস।
- ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) ও ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটি বাতিল।
- ইমাম সুলায়মানী (রহঃ) "আবূ আতিকাকে" হাদীস জালকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
- ইমাম সাখাবী (রহঃ) তার "মাকাসীদুল হাসানা" গ্রন্থে উপরোক্ত মত সমর্থন করেন।
- ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটিকে কঠোর ভাষায় ইনকার করেছেন।
- ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) "আল-লায়ালী " (১/১৯৩) গ্রন্থে বলেনঃ

হাদীসটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছেঃ—

১) একটির সনদে রয়েছেন ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আসকালনী। এ ইয়াকূব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেনঃ সে মিথ্যুক।

২) দ্বিতীয়টির সনদে রয়েছেন আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ যুওয়াইবারী। যুওয়াইবারী হাদীস জালকারী।

৫) "যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাকায়াত সালাত আদায় করবে; তা দ্বারা তার ৫০ বছরের গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। সূত্রঃ এটি ইবনু নাসর "কিয়ামুল্লাহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৩) মুহাম্মদ ইবনু গাযওয়ান দামেস্কীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইমাম ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) তার "আল-ইলাল" গ্রন্থে এ সূত্রেই (১/১৭৮) উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেনঃ—

ইমাম আবূ যুর'য়াহ (রহঃ) বলেনঃ তোমরা এ হাদীসটিকে পরিহার কর। কারণ এটি বানোয়াট হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুহাম্মদ ইবনু গাযওয়ান দামেস্কী মুনকারুল হাদীস।

৬) যে শুক্রবার আমার প্রতি ৮০ বার দুরুদ পাঠাবে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে

এই হাদীসটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণীত বলে দাবি করা হলেও এটি একটি জাল হাদীস। তাবলীগ জামাতের কিছু বইয়ে এই ধরণের হাদীস অনেক পাওয়া যায়, যেখানে দুরুদের নানা ধরণের মাত্রাতিরিক্ত সওয়াব, ফজিলত ইত্যাদি বর্ণনা করা থাকে। আল্লামা সাখায়ী একে দুর্বল এবং আলবানী একে জাল হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন।

এটি কু'রআনের পরিপন্থী কারণ আল্লাহ (ﷻ) স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেনঃ যে একটি ভালো কাজ নিয়ে আসবে, আল্লাহ তাকে তার দশ গুণ বেশি প্রতিদান দিবেন এবং যে একটি খারাপ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে তার সমান প্রতিদান ছাড়া কম-বেশি দেওয়া হবে না। কারো সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। [৬:১৬০]।

সুতরাং যখনি কোন হাদীস পাবেন যে, অমুক করলে ১০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, তমুক করলে ১০ বছর নফল নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে, ধরে নিতে পারেন সেগুলো হয় দুর্বল হাদীস, না হয় জাল হাদীস।

'মাউজু' (موضوع) বা হাদীস জাল করনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ইসলাম বিদ্বেষী চক্র কর্তৃক হাদীস জাল করনের যে ঘৃণ্য ও হীন চক্রান্ত শুরু হয় তা অবলোকন করে তৎকালীন প্রশাসক এবং

হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণ তৎপর হয়ে উঠেন। হাদীসকে এই অশুভ চক্র থেকে নির্ভুল রাখতে তাঁরা প্রশাসনিক ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের কঠোর প্রতিরোধের ফলে চক্রান্তকারী দল বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। অধিকন্তু তারা এমন কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ হাদীস জাল করার মতো দুঃসাহস করতে গেলে সহজেই ধরা পড়ে নাজেহাল হতে বাধ্য হয়।

যঈফ ও জাল হাদীস এবং মুসলিম সমাজে তার কুপ্রভাব

ইসলামী শরীয়তের দুটি মুল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐ দুটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হল আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত (আল-হাদীস)। (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬; আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম, সনদ হাসান)। যেহেতু উপরোক্ত দুটি উৎসই ইসলামী জীবন-যাপনের মূল হাতিয়ার এবং এর উপরেই মুসলমানদের হেদায়াত নির্ভরশীল, সেহেতু যুগ পরস্পরায় ইসলামের শত্রুরা এ দুটি মূল উৎসের মাঝেই ভেজাল ঢুকানোর চেষ্টা করেছে। কুরআন যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়েই লিখিত

আকারে সংরক্ষিত ছিল। কণ্ঠস্থ ছিল বহু সাহাবীর। কাজেই তারা কুরআনে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস ছিল এর কিছুটা ব্যতিক্রম। হাদীস তখন লিখিত আকারে ছিল না। ছিল বিভিন্ন সাহাবীর স্মৃতিপটে সংরক্ষিত। তাও আবার গচ্ছিত আকারে নয়। লিখিত আকারে খুব কমই সংরক্ষিত ছিল। এই সুযোগে ইসলামের চির শত্রুরা ও মুসলিম নামধারী বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল এই দ্বিতীয় উৎসের মধ্যে তাদের কালো হাত বসিয়েছে। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম এবং যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়তে রূপ দেওয়ার জন্য বহু হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম দিয়ে জাল করেছে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে এমন পণ্ডিতদেরও আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যারা ঐ সমস্ত যঈফ ও জাল হাদীসগুলিকে ছাটাই বাছাই করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, যখন কারো পক্ষে কুরআন মজীদে অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হয়নি, তখন কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণিত করতে শুরু করে এবং তিনি বলেননি এমন কথাও তাঁর নাম দিয়ে চালাতে শুরু করে। আর এর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা এমন আলেমদের আবির্ভাব ঘটালেন, যাঁরা মিথ্যা বর্ণনা অপসারণ করতে শুরু করেন এবং সহীহ হাদীস কোনটি তা স্পষ্ট করে দেন। আল্লাহ তায়ালা

এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিদের থেকে কোন যুগকেই শূন্য রাখেননি। তবে এ ধরনের ব্যক্তিত্বদের অস্তিত্ব সাম্প্রতিককালে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি বর্তমানে তাদের প্রাপ্তি পশ্চিমা ডলফিন প্রাপ্তির চেয়েও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। (সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যাঈফাহ ওয়াল মওযূআহ ১/৪১)[228]। ইমাম ইবনুল জাওযীর যুগেই যখন হাদীসের মহা পন্ডিতদের এরূপ অভাব দেখা দিয়েছিল, সেখানে বর্তমান যুগে এ অভাব আরও তীব্র হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? বাস্তব পরিস্থিতিও তাই। সারা বিশ্বে আজ যঈফ ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি। কি খতীব, কি ওয়ায়েয, কি প্রবন্ধকার, কি তথাকথিত মুহাদ্দিস সকলের মুখে শুধু যঈফ ও জাল হাদীস শুনা যায়। কিন্তু এগুলি থেকে সতর্ককারী রয়েছেন কজন? যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীসহ হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ছাড়া? তাদের লেখনীও আবার আরবীতে। যা বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য বুঝা কষ্টকর।

এই ঘোলাটে পরিস্থিতি অনুধাবন করেই আমরা উভয় বাংলার মানুষকে যঈফ ও জাল হাদীস থেকে সতর্ক করার জন্য কলম হাতে নিয়েছি। আমরা বাংলার মুমিন সমাজকে জানিয়ে দিতে চাই যে, হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হাদীসের অবস্থা না জেনে তা দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে না। আমরা আরও চাই

---

[228] সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যাঈফাহ ওয়াল মওযূআহ ১/৪১

বাংলার মানুষকে ঐ সমস্ত হাদীসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে, যেগুলিকে তারা অজ্ঞতা বশত: কিংবা ঐ রকম বই-কিতাব না থাকায় সহীহ হাদীস মনে করে আমল করে আসছে। অথচ তা নিতান্তই যঈফ বা জাল। বহুকাল আগে থেকেই হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এগুলোকে যঈফ ও জাল হাদীস বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বর্তমান যুগের হাদীস শাস্ত্রবিদগণও ওগুলোর যঈফ ও জাল হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যা রোপ করার কঠিন গোনাহ হতে রক্ষা করা।

আল্লাহ আমাদের সকলকে যঈফ ও জাল হাদীস চিনার ও তা থেকে সতর্ক থাকার সাথে সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

'মাউজু' (موضوع) বা জাল হাদীসের প্রকারভেদঃ এই **موضوع** **'মাউজু'** বা জাল হাদীস কয়েক ধরনের হয়, যথাঃ

১. কোন ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে কোন বাক্য বানিয়ে রাসূল (সাঃ) সাহাবী (صحابى) অথবা তাবেয়ী (تابعى) এর নামে চালিয়ে দেয়া।

২. কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি, সাহাবী (صحابى), তাবেয়ী (تابعى), ছুফিয়ায়ে কেরাম অথবা অন্য কারো কথা নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর নামে চালিয়ে

দেয়া যাতে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। (তথ্যসূত্রঃ আল – ইসরাইলিয়্যাত ওয়াল – মাউজূয়াত: ১৫)[229]।

مَوْضُوْعٌ (মাওযু): যে হাদীস - এর রাবী জীবনে কখনও রাসূল (সাঃ) ওনার নামে ইচ্ছা করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে- তার হাদীসকে হাদীসে মাওযু বলে। এরূপ ব্যক্তির কোন হাদীসই কখনও গ্রহণযোগ্য নয় - যদিও তিনি অতঃপর খালিস তওবা করেন। (অত্র গ্রন্থে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, ২৫২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

مَتْرُوْكٌ (মাতরূক): যে হাদীস - এর রাবী হাদীসের ব্যাপারে নয় বরং সাধারণ কাজ-কারবারে মিথ্যা কথা বলেন বলে খ্যাত হয়েছেন- তার হাদীসকে হাদীসে মাতরূক বলে। এরূপ ব্যক্তিরও সমস্ত হাদীস পরিত্যাজ্য।

مُبْهَمٌ (মুবহাম): مُبهَمٌ এর আভিধানিক অর্থঃ অস্পষ্ট। 'মুবহাম'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেনঃ "যে হাদীসের সনদে কোনো একজন রাবীকে উল্লেখ করা হয়নি তাই মুবহাম"। যেমন, **حدثني رجل، قال: حدثني خالد عن راشد ...** এ হাদীস মুবহাম, কারণ এখানে একজন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপ কোনো রাবী যদি বলেঃ **حدثني الثقة** 'আমাকে জনৈক সিকাহ

---

[229] আল – ইসরাইলিয়্যাত ওয়াল – মাউজূয়াত: ১৫

বলেছে’ তবুও তা মুবহাম। কারণ, ‘সিকাহ’ রাবী পরিচিত নয়। হয়তো তার নিকট সিকাহ, প্রকৃতপক্ষে সিকাহ নয়।

অনুরূপ কেউ যদি বলেঃ حدثني من أثق به ‘এমন ব্যক্তি আমাকে বলেছে, যার উপর আমি আস্থাশীল’, তবু হাদীস মুবহাম, কারণ মুবহাম ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো প্রশংসা গ্রহণীয় নয়। অনুরূপ কেউ যদি বলেঃ حدثني صاحب هذه الدار ‘আমাকে এ বাড়িওয়ালা বলেছে’, তবু হাদীস মুবহাব, যতক্ষণ না তার পরিচয় জানা যায়।

অর্থাৎ যে হাদীস - এর রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি- যাতে ওনার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, ওনার হাদীসকে হাদীসে মুবহাম বলে। এরূপ ব্যক্তি সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু না হলে ওনার হাদীস গ্রহণ করা যায় না।

মুবহাম হাদীসের হুকুমঃ মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মুবহাম রাবী সিকাহ না গায়রে সিকাহ জানা নেই, তবে তাবে‘ঈ বা তাবে তাবে‘ঈ মুবহাম হলে শাহেদ হওয়ার যোগ্য। কারণ, এ দুই তবকা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরবর্তী যুগে মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

مُحْكَمٌ (মুহকাম): মুহকাম আরবী ভাষায় আহকামা থেকে ইসমে মাফউল। এর অর্থ মযবূত। অর্থাৎ কোন হাদীস বিপরীতার্থক অপর কোন হাদীস থেকে নিরাপদ হলে তাকে মুহকাম হাদীস বলে। এরূপ বিপরীত অর্থ বোধক অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হলে এটাকে **مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ "মুখতালিফুল হাদীস"** বলে।

বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পারিভাষিক অর্থঃ পরিভাষার এমন হাদীসে মাকবূলকে মুহকাম বলা হয় যা অনুরুপ হাদীসের বিরোধিতা থেকে মুক্ত। অধিকাংশ হাদীস এই প্রকারের। হাদীসের ভিতর অতি নগণ্য সংখ্যক হাদীস পারস্পারিক বিরোধীতার অন্তর্ভূক্ত।

উদাহরণঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার করল সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামকে বানিয়ে নেয়।

মুখতালিফুল হাদীসঃ ইখতিলাফ থেকে ইসমে ফায়িল। ইত্তিকাফ এর বিপরীতার্থক শব্দ। অর্থাৎ, ঐসকল হাদীস যা আমাদের কাছে এভাবে এসেছে যে, তার অর্থ একটা আরেকটার বিপরীত অর্থাৎ, পারস্পারিক বিপরীতার্থক।

পারিভাষিক অর্থঃ পরিভাষায় ঐ হাদীসকে মুখতালিফুল হাদীস বলা হয় যা অনুরুপ হাদীসের সাথে পারস্পারিক দ্বন্দ্বযুক্ত। তবে উভয় হাদীসের ভিতর সমন্বয় সাধন সম্ভব। এমন সহীহ কিংবা হাসান হাদীস, যার সাথে সমমর্যাদাপূর্ণ অন্য কোন হাদীসের অর্থগত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞ আলিম ও সঠিক সমঝাদার ব্যক্তিদের পক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গ্রহণযোগ্যতার রুপ দেওয়া সম্ভব।

উদাহরণঃ সহীহুল বুখারীতে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রোগের ভিতর কোন সংক্রামক ব্যাধি বা কুলক্ষণ নেই।

আবার সহীহ মুসলিম এ উল্লেখ করা হয়েছে, "যে স্থানে কুষ্ঠু রোগ ছড়ায় সেই স্থান থেকে যেন লোকেরা দ্রুত পালিয়ে যায় যেভাবে বাঘ দেখলে দ্রুত পালায়"। এখন এই হাদীসে দুটি সহীহ। এর ভিতর কোনটির উপর আমল করবে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের ভিতর সন্দেহ থাকতে পার। এই প্রসঙ্গে হাফিয বিন আসকালানী (রঃ) যেভাবে তার সমাধান করেছেন তা নিম্নরূপঃ

সহীহুল বুখারীতে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, খোসা-পাচড়াযুক্ত উটটিকে আলাদা করা দরকার কারণ তা থেকে

অন্য সকল উটের তা সংক্রমিত হতে পারে? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে প্রথম উটটিকে কে সংক্রমিত করল?

এখন দুটি হাদীসে বলা হচ্ছে যে, রোগ কোনভাবেই সংক্রমিত হতে পারে না। কিন্তু এক হাদীসে বলা হচ্ছে যে, কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। যদি সে দূরে সরে না যায় তাহলে সে তা সংক্রমন বলে মনে করবে আর তাতে সে মন্তব্য করে বসবে যে, এটি সংক্রমনের জন্য হয়েছে যার ফলে তাকে সেই সময়ে ঐ এলাকা থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে।

বিপরীত ধর্মী হাদীসে সমন্বয় সাধন যখন দুটি হাদীসের ভিতর বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাবে সেই সময়ে তার সমাধান বের করার জন্য আলিম-ওলামাগণ বেশ কয়েকটি নীতি অবলম্বণ করেছেন যা হল নিম্নরূপঃ

১. যদি দুটি হাদীসের ভিতর সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলে দুটি হাদীসের উপর আমল করতে হবে।

২. যদি উভয় হাদীসের ভিতর যদি সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর না হয় তাহলে কয়েকটি পন্থা অবলম্বণ করা যেতে পারে যা হল নিম্নরূপঃ

ক. কোন হাদীসটি নাসীখ এবং কোন হাদীসটি মানসুখ তা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে যেটি নাসিখ হবে সেটার উপর আমল করতে হবে আর যেটি মানসুখ হবে সেটির উপর আমল করা যাবে না।

খ. যদি উভয় রিওয়য়াতের ভিতর যদি নাসিখ-মানসুখ বের না হয় তাহলে কোনটির প্রাধান্য বেশি তার কমপক্ষে ৫০টি কারণ দেখিয়ে সেটির উপর ভিত্তি করে যেকোন একটি হাদীসের গুরুত্বকে অধিক দিতে হবে।

গ. যদি উপরের দুটির একটি পন্থায়ও যদি সমাধান না হয় তাহলে দুটি হাদীসের উপর আমল করা বন্ধ রাখতে হবে যতক্ষণ না তার সঠিক সমাধান না আসে।

মুখতাফুল হাদীসের গ্রন্থাবলীঃ ইখতাফুল হাদীস (ইমাম শাফিঈ কর্তৃক প্রণীত), মুখতারিফুল হাদীস এবং মুশকিলুল আসার।

'ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে'–এ সংক্রান্ত সংশয় নিরসনঃ

ইবনুল আরাবী মালেকী (রহঃ) বলেনঃ দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না। ইমাম শাওকানী ও (রহঃ) একই মত দিয়েছেন। আর এটাই সঠিক।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) এর নিকট দুর্বল হাদীস-এর উপর আমল করার শর্তাবলীঃ হাফিয সাখাবী (রহঃ) বলেনঃ আমি আমার শাইখকে বার বার বলতে শুনেছি দুর্বল হাদীসের উপর ৩ টি শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবেঃ

১) হাদীস যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গৃহীত হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

২) যে আমলটির ফযীলত এসেছে সে আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে।

অতএব, যে আমলটির আসলেই কোন ভিত্তি নেই; এরূপ আমলের ক্ষেত্রে (দুর্বল হাদীস দ্বারা) ফযীলত বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩) কম দুর্বল হাদীসটির উপর আমল করার সময় এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে,তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উদ্ধৃতিতে বলতে হবে।

অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর আমল করার জন্য বলেছেন।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যাঃ

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে ফযীলতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে। এ ফযীলত অর্জনের বিষয়টি কোন আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন আমল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্য হতে কোনটি কম দুর্বল আর কোনটি বেশী দুর্বল তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম দুর্বল সেটির উপর আমল করআ যেতে পারে। কিন্তু কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল,কোনটি কম দুর্বল এবং বেশী দুর্বল তা পার্থক্য করার দায়িত্ব কার?

সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই এ বিষয়ের যারা পন্ডিত ও বিজ্ঞ তাদেরকেই তা করতে হবে ২ টি কারণেঃ

১) পৃথক না করলে য'য়ীফকে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার উপর আমল করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২) অনুরূপভাবে কম দুর্বলকে বেশী দুর্বল হতে পৃথক করতে হবে,যাতে কোন ব্যক্তি ফযীলতের ক্ষেত্রেও বেশী দুর্বল হাদীসের উপর আমল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে যে, যে কর্মটির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন আমলের জন্য ফযীলতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না।

উল্লেখ্য দুর্বল হাদীস দ্বারা আলেমদের ঐক্যমতে কোন আমলই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়।অতএব আমলই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আমল এবং ফযীলত উভয়টি যে হাদীসের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীস দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফযীলত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীসটি কম দুর্বল হয়।কারণ এক্ষেত্রে মূলটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে যে, কম দুর্বল হাদীসের উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে, তবে এই বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে পারে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্বল কথাটি বলেননি।

ফলে তার উপর আমল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস ভেবে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না,

তখন তার উপর কোন স্বার্থে আমল করবেন? এটি কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? এছাড়া সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর একচতুর্থাংশ হাদীসের উপরও কী আমরা আমল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের সমীপে রাখছি।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সমাজে বহু লোক জাল হাদীসের উপর আমল করছেন। অথচ যখন তাদেরকে বলা হচ্ছে,এসব হাদীসের উপর আমল করা না জায়েয।

কারণ এগুলো জাল (বানোয়াট) তখন তারা উত্তরে বলেছেন যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়।

অজ্ঞতা আমাদেরকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে; দুর্বল, খুবই দুর্বল ও জাল-এসবের মাঝে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করতেই রাজি নই। জাল হাদীস যে হাদীসই নয় বরং তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপ-তাও আমরা বুঝার চেষ্টা করি না।

অনেকে আবার বলেন যে,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস আবার কিভাবে জাল হয়? পাঠকবৃন্দ তারা ঠিকই বলেছেন। যেটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সেটি জাল হতে পারে না।যে কথাটি আপনাদের ও আমাদের মত

মানুষে তৈরী করে বলে দিচ্ছে যে,এটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেটিই জাল এবং সেটিই জাল হাদীস হিসেবে আমাদের সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। এরূপ জালগুলোকেই আমরা পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহর দিকে আহ্বান করছি।আরো একটু ভেবে দেখুন! মিথ্যা (ভন্ড) নবী সাজা যদি সম্ভব হয় এবং বাস্তবে তার প্রমাণ মিলে, তাহলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা হাদীস তৈরী করা কী এর চেয়ে বেশী সহজ নয়? এরূপ জাল হাদীসের প্রচলন বহু যুগ পূর্ব হতেই চলে আসছে। ফলে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ আলেমগণ সেই সব জাল-বানোয়াট এবং দুর্বল হাদীসগুলোকে একত্রিত করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাথে সাথে কেন জাল,কেন বেশী দুর্বল, কেন কম দুর্বল? এসবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অতএব আমাদেরকে একটু ভেবে দেখতে হবে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে কিনা? যদিও কোন কোন আলেম দুর্বল হাদীসের উপর শুধুমাত্র ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে আমল করা যাবে মর্মে মত পেশ করেছেন।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা যদি দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে মর্মে বর্ণিত ৩টি শর্ত একটু ভেবে দেখেন, তাহলে হয়তো আপনাদের নিকট “কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল না করাই যুক্তিযুক্ত” এ মতটিই স্পষ্ট হবে।

আরো একটি সমস্যা বর্তমান সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে,সেটি হচ্ছে ফযীলত সম্পন্ন আর ফযীলত বিহীন সর্বক্ষেত্রেই একই মন্ত্র পাঠ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যে কোন দুর্বল হাদীসের উপরই আমল করা যায়। ফযীলত কথাটি মুছে ফেলা হচ্ছে অথচ ফযীলত ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যে মিথ্যারোপ করা হবে,জাল হাদীস তৈরী করা হবে-তার প্রমাণ বহন করছে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ

১) রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিবে”। (বুখারী ও মুসলিম)

২) “যে ব্যক্তি আমার উদ্ধৃতিতে এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করল,ধারণা করা যাচ্ছে যে,সেটি মিথ্যা। সে ব্যক্তি মিথ্যুকদের একজন বা দু’ মিথ্যুকদের একজন”। (মুসলিম)

৩) “আমার উপর মিথ্যারোপ করা তোমাদের পরস্পরের মাঝে মিথ্যারোপের মত নয়।যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর

মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল”। (মুসলিম)

৪) “যে ব্যক্তি আমার উপর (নামে) এমন কথা বলল যা আমি বলিনি, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল”। (ইবনু হিব্বান,হাদীসটি হাসান পর্যায়ের)

২নং ও ৪নং হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ না করলেও হয় সে মিথ্যুক না হয় তার স্থান জাহান্নামে।

অতএব যে ব্যক্তি বলবেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস আবার মিথ্যা হয় কিভাবে?-এর উত্তর উক্ত বাণীগুলোর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।মিথ্যা হাদীস যদি তার উপর বানানোই না হতো তাহলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসগুলো উল্লেখ করে কঠিন শাস্তির কথা বলে সতর্ক করে দিতেন না।

মিথ্যুকদের দ্বারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্ধৃতিতে মিথ্যা হাদীস বর্ণিত হবে জেনেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত শাস্তির কথা বলেছেন। অন্যথায় তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীগুলো অর্থহীন হয়ে যেত।

এছাড়া যা কিছু শুনবেন আর তাই বর্ণনা করবেন এরূপ কাজ সহীহ হাদীস বিরোধী। কারণ রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে,সে যা কিছু শুনবে তাই বর্ণনা করে বেড়াবে"। (ইমাম মুসলিমসহ আরো অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

"ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে - "এ বিষয়ে শাইখ আলবানী (রহঃ) "সহীহ জামে' আস সাগীর" গ্রন্থের ভূমিকাতে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সার সংক্ষেপ সহ আরো কিছু বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

অনেকে এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে এ মর্মে কোন মতভেদ নেই। বাস্তবিক পক্ষে তা সঠিক নয় বরং এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যা "মুস্তালাহুল হাদীস" এর উপর রচিত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। যেমন শাইখ জামালুদ্দীন কাসেমী (রহঃ) তাঁর "কাওয়ায়েদুল হাদীস" (পৃঃ ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন, যারা কোন অবস্থাতেই দুর্বল হাদীসের উপর আমল করাকে বৈধ মনে করেননি। তাদের মধ্য রয়েছেন ইবনু মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ বাক্র আল-আরাবী ও আরো অনেকে। তাদের দলে ইবনু হাযমও রয়েছেন।

হাফিয ইবনু রজব "শারহুত- তিরমিযী" (ক্বাফ ২/ ১১২) গ্রন্থে বলেনঃ— ইমাম মুসলিম কতৃক তার সহীহ গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখকৃত বাণীগুলোর বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) এবং তারহীবের (ভীতিমূলক) বর্ণনাও করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ— আমি লোকদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা হচ্ছে এই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না, চাই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক।

যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা একাধিক আয়াতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কিভাবে বলা যায় দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবেঃ

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়"। (সূরা আন্ – নাজমঃ ২৮)

"তারা কেবল মাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে"। (আন্ – নাজমঃ ২৩)

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “তোমরা অনুমান করা হতে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা”। (হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। জেনে রাখুন! যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোনই দলীল নেই। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন ধরনের একটি দলীলও তাদের কোন আলেমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র একে অপর হতে কতিপয় মত বা উক্তি উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি তাদের আলেমদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ লক্ষনীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেনঃ “দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।”

অতঃপর তিনি মুহাক্কেক জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী হতে নকল করেছেন, তিনি বলেনঃ আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদীস দ্বারা শরীয়তের পাঁচটি আহকাম (ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না, যে পাঁচটির মধ্যের একটি হচ্ছে মুস্তাহাব।

লক্ষ্য করুন! ইবনুল হুমাম বলেন দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সকলের ঐক্যমতে ৫

টি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না,যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথায় দ্বন্দ স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) "আল- কায়েদাতুল জালীলাহ ফিত তাওয়াস্‌সুলে ওয়াল ওয়াসীলা" (পৃঃ ৮২) গ্রন্থে বলেছেনঃ "শরীয়তের মধ্যে য'ঈফ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও কতিপয় আলেম ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসকে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন যদি মূল আমলটি শার'ঈ সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওয়া আমলটির ফযীলতে বর্ণিত দুর্বল হাদীসটি মিথ্যা নয় বলে জানা যায়। আর এরূপ হলে সওয়াবটি সত্য বলা জায়েয হতে পারে।

কোন ইমামই বলেননি যে, য'ঈফ হাদীস দ্বারা কোন বস্তুকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করা জায়েয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।"

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ "ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শরীয়তের মধ্যে এ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর করেননি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমাদ

(রহঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি সহীহ নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়) তিনি ভুল করেছেন।”

অতএব আপনারা জেনেছেন যে, সকল ইমামের ঐক্যমতে কোন মুস্তাহাব য'ঈফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। যদিও কোন কোন ইমামের নিকট শর্তসাপেক্ষে ফযীলতভুক্ত য'ঈফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে, তবুও এরূপ মতকে গ্রহণ করা মোটেই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করাই ওয়াজিব। [তথ্যসূত্রঃ মূল - শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রহঃ) অনুবাদ - আবূ শিফা মুহাম্মদ আকমাল হুসাইন][230]।

যঈফ (ضعيف) হাদীস আমল করা প্রসঙ্গেঃ

দ্বিতীয় পর্যায়ের একদল ফিকহ্বিদ যারা ফাযীলাতের ক্ষেত্রে যঈফ ‘আমালের অনুমতি দিলেও তারা যঈফ হাদীস ‘আমালের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তারোপ করেছেন। যেমন-

(১) যে সব যঈফ হাদীসের উপর ‘আমাল করা হবে, তা যেন কোন মতেই আক্বীদা বা হুকুম সংক্রান্ত না হয়। যদি তা হয় তাহলে কোন ক্রমে যঈফ হাদীস ‘আমাল করা যাবে না।

[230] মূল - শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রহঃ) অনুবাদ - আবূ শিফা মুহাম্মদ আকমাল হুসাইন

(২) যদি কেউ নিতান্ত বাধ্য হয়ে যঈফ হাদীস 'আমাল করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐ 'আমালটা যেন কোন মতেই দেশ ও সমাজের প্রচলিত সহীহ হাদীসের 'আমালের বিরোধী না হয়। যদি হয় তাহলে 'আমাল করা যাবে না।

(৩) উক্ত যঈফ হাদীসের সনদ বা সূত্র যেন অত্যন্ত দুর্বল না হয়।

(৪) পরিশেষে যঈফ হাদীস 'আমালকারীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, হাদীসটি যঈফ বা সন্দেহযুক্ত। আর অন্যের নিকট বলার সময় তা যঈফ হিসাবেই উল্লেখ করতে হবে[231]। এ প্রসঙ্গে সত্য সন্ধানীদের নিকট আমার প্রশ্ন হলো, বর্তমান যারা ফাযীলাতের দোহাই দিয়ে হরহামেশা, যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন, কিংবা যঈফ হাদীসের 'আমাল ছাড়তে রাযি থাকেন না। তারা কি আদৌ ফিকহ্বিদদের উক্ত চারটি শর্তের তোয়াক্কা করেন? ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ইমাম মুসলিম বলেনঃ যঈফ হাদীস বর্ণনা করার সময় যঈফ জানা সত্ত্বেও যারা মানুষের সামনে হাদীসের ত্র"টি তুলে ধরে না, তারা গুনাহগার হবে। আর সাধারণ মুসলিমদের নিকট প্রতারক বলে গণ্য হবে। কারণ যারা যঈফ হাদীস শুনবে এবং সেগুলোর উপর 'আমাল করবে অথচ ঐসব হাদীস অধিকাংশ ভিত্তিহীন মিথ্যা বানোয়াট। ইমাম মুসলিম আরো

[231] ইমাম মহিউদ্দিন নাববীর সহীহ মুসলিমে শরাহ তাওজীহুন নজর কাওয়াছিদুত তাহাদীস

বলেন যে, পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত অসংখ্য নির্ভুল সহীহ হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকতে কোন ক্রমেই যঈফ হাদীস গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম বলেন, আমি মনে করি, যে সব লোক যঈফ হাদীস অখ্যাত সনদে বর্ণনা করেন বা তার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের উদ্দেশ্য হল নিজেকে অপরের নিকট অধিক হাদীস বয়ানকারী হিসাবে জাহির করানো বা মানুষের বাহবা কুঁড়ানো।

'ইল্মে হাদীসের ক্ষেত্রে যারা এ নীতিতে পা বাড়ায় হাদীস শাস্ত্রে তাদের কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম ও বক্তা (শাইখুল হাদীস) হিসাবে আখ্যায়িত না হয়ে বরং জাহিল মূর্খ হিসাবে আখ্যায়িত হবার যোগ্য। (সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা - ১ম খণ্ড, ৫০ পৃঃ, ই. ফা. বাং)[232] এখানে কেউ কেউ হয়তো বলতে চাইবেন যে, যঈফ হাদীস যদি 'আমালযোগ্যই না হবে তাহলে হাদীসের কিতাবে যঈফ হাদীস লিখা হল কেন? এরূপ প্রশ্নের জওয়াব ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণ অনেক সময় যঈফ রাবীদের বর্ণিত দুর্বল হাদীসকে সনাক্ত করার জন্য কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন বলেন, আমি যঈফ ও জাল হাদীস এজন্য

---

[232] সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা- ১ম খণ্ড, ৫০ পৃঃ, ই.ফা.বাং

লিপিবদ্ধ করি যাতে ভবিষ্যতে এগুলোকে কেউ পরিবর্তন করে সহীহ হাদীস বানাতে না পারে। (শরহু ইলালিত তিরমিযী ৮৪ পৃঃ, জামে তিরমিযী মুখবন্ধ ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ, অনুবাদ- আবদুন নূর সালাফী)[233]। আর জাল হাসিস আমল করার তো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৈফিক দান করুন।

যঈফ (ضعيف) হাদীসের উপর আমল কি গ্রহণযোগ্য?

অনেকে মনে করেন, যঈফ হাদীস ফযীলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। বরং ফযীলত ও আহকাম সর্ব ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীস বর্জনীয়। এটিই অধিকাংশ ইমামগণের চূরান্ত ফায়সালা। আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) এর 'কাওয়ায়েদুল হাদীস' এর পৃঃ ১১৩ -তে কতিপয় ইমামদের মতামত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়। ইমামগণ হলেনঃ

- ইমাম বুখারী,
- ইমাম মুসলিম,

---

[233] শরহু ইলালিত তিরমিযী ৮৪ পৃঃ, জামে তিরমিযী মুখবন্ধ ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ, অনুবাদ- আবদুন নূর সালাফী

- ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন,
- ইমাম ইবনুল আরাবী,
- ইমাম ইবনু হাযম,
- ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ সহ প্রমূখ মনিষীগণ।

যারা মনে করেন ফাজায়েলে ক্ষেত্রে জঈফ হাদীস আমল করা যায় তাদের কথার কোন দলিল নাই। তারা কেবল অনুমান ও ধারনা বসত এই কথা বলে থাকে যে জঈফ হাদীসও রাসুল (সাঃ) এর বানী হতে পারে। রাবী যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তবে কিভাবে সেটা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস হতে পারে? আল্লাহ বলেন, -'তারা কেবল অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন'। [সূরা আন নাজম ২৩]।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, -'তোমরা অনুমান করা হতে নিজেদের রক্ষা কর, কারন অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা'। [সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলীম]।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন, 'এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়'। [সূরা আন নাজম ২৭-২৮]

জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন প্রসঙ্গে ও ইমামদের অভিতমতঃ জাল ও যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সকল প্রকার আমল নিঃসঙ্কোচে নিঃশর্তভাবে বর্জন করতে হবে। কারণ জাল ও যঈফ হাদীস দ্বারা কোন শারঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। জাল হাদীসের উপর আমল করা পরিষ্কার হারাম। সে কারণ সাহাবায়ে কেরাম যঈফ ও জাল হাদীসের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। আস্থাহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন না।

প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীস ছেড়ে কেবল সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরা। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ঘোষণা করেন,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

‘যখন হাদীস সহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব’।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالنَّاسِخَ والْمَنْسُوْخَ مِنَ الْحَدِيْثِ لاَيُسَمَّى عَالِمًا.

‘নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীসের সহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না’। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন। ইমাম মালেক, শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।

মুহাদ্দিস যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ بِخَبْرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ

‘হাদীস মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম’। অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা অন্য যেই হোন শরী‘আত সম্পর্কে কোন বক্তব্য পেশ করলে তা অবশ্যই সহীহ দলীলভিত্তিক হ’তে হবে।

সহীহ হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লেখাতেন এবং মুখস্থ করাতেন। তিনি কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলতেন বা শেখাতেন সে সকল শিক্ষা অর্থাৎ হাদীস তিনি সাধারণত লিখতে নিষেধ করতেন। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা মুসলিমগণ মুখস্থ করতেন এবং বিক্ষিপ্ত চামড়ার টুকরো, মাটির পাত, পাথর, খেজুর গাছের বাকল ইত্যাদিতে লিখে নিতেন। এ অবস্থায় হাদীস লেখা

হলে ভুলবশত একজন মুসলিম কোনো হাদীসকে কুরআনের লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিশিয়ে ফেলতে পারেন এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর ইন্তেকালের পরে কুরআন নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কুরআনের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি মুসলিমদেরকে কুরআন মুখস্থ করতে ও লিখতে বলতেন। আর তাঁর বাণী ও কর্ম, অর্থাৎ হাদীস শুধমাত্র মুখস্থকরে বর্ণনা করতে ও মানুষদেরকে শেখাতে বলতেন। এক্ষেত্রে তিনি হাদীস মুখস্থ করা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে পরির্পর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কেউ তাঁর নামে মিথ্যা না বলে, বা এমন কথা তাঁর নামে না বলে যা তিনি বলেন নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا
حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ [متعمدا] فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"

"তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লিখবে না। যদি কেউ কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেলবে। তোমরা আমার হাদীস মৌখিকভাবে বর্ণনা কর, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (ইচ্ছা করে) মিথ্যা কথা বলবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দ হবে।" (মুসলিম, আস-সহীহ

৪/২২৯৮)[234]। মাদানী জীবনের শেষ দিকে তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন। বিশেষত বিদায় হজ্জের সময় তিনি হাদীস লেখার অনুমতি দেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর যুগে সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কোনো কোনো সাহাবী কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। অধিকাংশ সাহাবী তাঁর শিক্ষা, বাণী, কর্ম অত্যন্ত যতেœর সাথে মুখস্থ করতেন, পরস্পরে তা আলোচনা করতেন এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাদীস হুবহু মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৩৩-৩৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/৩২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৪-৮৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১/২৬৮, ২৭১, ৪৫৫; হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুসতাদরাক ১/১৬২, ১৬৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৩৮-১৩৯)[235]। অপরদিকে কোনো মানবীয় কথা যেন তাঁর নামে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তিনি বারংবার সতর্ক করেছেন। উপরের হাদীসে আমরা তা

---

[234] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৯৮

[235] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৩৩-৩৪; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/৩২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৪-৮৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১/২৬৮, ২৭১, ৪৫৫; হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুসতাদরাক ১/১৬২, ১৬৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৩৮-১৩৯

দেখেছি। 'আশারায়ে মুবাশশারাহ'-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ρ-এর সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি। (নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহু সাহীহ মুসলিম ১/৬৮, ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূ'আত ২৮-৫৬)[236]। উম্মাতের মধ্যে জালিয়াত ও জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। (মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২)[237]। যাচাই না করে কোনো হাদীস গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। (মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০)[238]। এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা সাধারণত হাদীস বলতেন না। কখনো হাদীস বললে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলতেন। অন্যের বলা হাদীস যাচাই বাছাই না করে গ্রহণ করতেন না। বর্ণনার নির্ভুলতা বা বিশুদ্ধতায় সন্দেহ হলে বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করে, অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে প্রশ্ন করে বা বর্ণনাকারীকে শপথ করিয়ে বর্ণনার

[236] নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহু সাহীহ মুসলিম ১/৬৮, ইবনুল জাউযী, আল-মাউযূ'আত ২৮-৫৬

[237] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২

[238] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০

বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। এরপরও সন্দেহ থাকলে তারা হাদীস গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতেন। সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বললে সনদ ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে। সাহাবীগণের কর্মপদ্ধিতর অনুসরণে তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করেছেন। যাচাই-বাছাইয়ে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদীসকে তারা 'সহীহ' বা 'হাসান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর অশুদ্ধ হাদীসকে যয়ীফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। যয়ীফ হাদীসের মধ্যে রয়েছে বানোয়াট বা জাল হাদীস।মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়ঃ

(১) 'আদালত': হাদীসের সকল রাবী (বর্ণনাকারী) পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত,

(২) 'যাবত': তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত,

(৩)'ইত্তিসাল': সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত,

(৪) ‘শুযূয মুক্তি’: হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং

(৫) ‘ইল্লাত মুক্তি’: হাদীসটির মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্র“টি নেই বলে প্রমাণিত।

প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক।

দ্বিতীয় শর্তে সামান্য দুর্বলতা থাকলে হাদীসটি ‘হাসান’ বলে গণ্য হতে পারে। (বিস্তারিত দেখুনঃ ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ: ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীস, পৃ: ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/২৫-৩১; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১/৬৩-৭৪; মাহমূদ তাহ্হান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৪-৩৬, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৬-১২৩)[239]।

এ সকল শর্তের অবর্তমানে হাদীসটি যয়ীফ বা দুর্বল অথবা বানোয়াট বা মাউযূ হাদীস বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

---

[239] বিস্তারিত দেখুন: ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ: ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীস, পৃ: ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/২৫-৩১; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১/৬৩-৭৪; মাহমূদ তাহ্হান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৪-৩৬, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৬-১২৩

আকীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেবলমাত্র সহীহ হাদীসের উপরেই নির্ভর করতে হবে। সকল যুগে সকল ইমাম ও আলিম এ বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন। তাঁরা সর্বদা সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেছেনঃ

أخذنا به ولم نَعْدُهُ إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে তাঁর উপরেই আমরা নির্ভর করব, তার বাইরে যাব না।" (ইবনু আব্দিল বার, আল ইনতিকা ফী ফাযাইলিল সালালাতিল আইম্মা, পৃষ্ঠা নং - ১৪৪)[240]। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তাঁর রচিত 'আল ফিকহুল আকবার' নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ

وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن

"কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই।" (মোল্লা আলী কারী, শরহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯২ ও ৩২৭)[241]। ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রাহঃ)

---

[240] ইবনু আব্দিল বার, আল ইনতিকা ফী ফাযাইলিল সালালাতিল আইম্মা, পৃষ্ঠা নং - ১৪৪

[241] মোল্লা আলী কারী, শরহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯২ ও ৩২৭

মাযহাবের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফার তাহাবী (৩২১ হিঃ) বলেনঃ

من الشرع والبيان حق. ... وكل ما جاء وجميع ما صح عن رسول الله فهو كما قال في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ...

"শরীয়ত এবং বিবরণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যাক কিছু সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে সবই হক্ক। ..... এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই বিশ্বাস করতে হবে।" (আবূ জাফার তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১০, ১৪)[242]।

হাদীসে কুদসী (الحديث القُدسي)

হাদীসের আর এক প্রকার রহিয়াছে, যাহাকে 'হাদীসে কুদসী' حديث قدسى বলা হয়। কুদসী'قدسى 'কুদস'قدس হতে গঠিত ইহার অর্থ الظهر পরিত্রতা, মাহনত্ব। আল্লাহর আর এক নাম 'কুদ্দুস'قدوس : মহান; পবিত্র। (তথ্যসূত্রঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং - ৪০)[243]। قُدُس শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্র। تقديس শব্দের অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

---

[242] আবূ জাফার তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১০, ১৪

[243] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং - ৪০

(وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ ٣٠) [البقرة: ٣٠]

"আমরা আপনার প্রশংসার তসবিহ পাঠ করি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি"। আল্লাহর এক নাম قُدُّوس অর্থ পবিত্র অথবা বরকতময় অথবা তিনি পবিত্র বৈপরীত্য, সমকক্ষ ও সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য থেকে। البيت المقدَّس অর্থ 'শির্ক থেকে পবিত্র ঘর'। হাদীসে কুদসী যেহেতু মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ প্রকার হাদীসকে হাদীসে কুদসী (الحديث القُدُسي) বলা হয়। এই ধরনের হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' বল হয় এজন্য যে, এর মূল কথা সরাসরিভাবে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত। হাদীসে কুদসী'র একটি উদাহরন দিলে এর বিষয়টির স্পষ্টতার প্রমান পাওয়া যায়।

যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে 'ইলহাম' কিংবা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিয়াছেন, নবী নিজ ভাষায় সে কথাটি বর্ণনা করেছেন। আর তা মূলতঃ কুরআন হতে পৃথক জিনিস।

কেননা কুরআনের কথা ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর নিকট হতে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। (তথ্যসূত্রঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং - ৪১)[244]। হাদীসে কুদসীকে আবার হাদীসে

[244] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং - ৪১

ইলাহী বা আসারে ইলাহীও বলা হয়। [তথ্যসূত্রঃ হাদীসে কুদসী – আল্লামা মোঃ মাদানী (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ১০][245]।

হাদীসের ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বের দাবীদার এই হাদীসে কুদসী। এ হাদীসের মূল বক্তব্য সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত।

কুদসী পদটি আরবী ‘কুদুস’ থেকে আগত, যার অর্থ হলো পবিত্রতা, মহানত্ম। যেমনঃ আলী ইবন খাশরাম (রঃ) .... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ.

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের তুমি নিজেকে ফারেগ করে নাও আমি তোমার হৃদয়কে অভাব মুক্ততা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব বন্ধ করে দিব। আর

---

[245] হাদীসে কুদসী – আল্লামা মোঃ মাদানী (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ১০

তা যদি না কর তবে তোমার দু’ হাত আমি ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব আর তোমার অভাব দূর করব না। এ হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী আবূ খালিদ ওয়ালিবী (রঃ) - এর নাম হল হুরমুয[246]।

সংজ্ঞাঃ যে হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে সেই হাদীসকেই ‘হাদীসে কুদসী’ (الحديث القُدُسي) বলে। আল্লাহ তা’য়ালা তার নবীকে ‘ইলহাম’ কিংবা স্বপ্ন যোগে এই মূল কথাগুলি জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা মোল্লা আল কারী হানাফী (রহঃ) ‘হাদীসে কুদসী’র সংজ্ঞা দান প্রসংগে বলেছেন – “হাদীসে কুদসী’ সে সব হাদীস যা শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পরম নির্ভরযোগ্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর নিকট থেকে বর্ণনা করেন কখনো জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে জেনে কখনো সরাসরি অহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্ন যোগে লাভ করেন, যে কোন প্রকারের ভাষার সাহায্যে এটা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের উপর অর্পিত হয়ে থাকে।” (তথ্যসূত্রঃ আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজাত ও সংকলন, পৃষ্ঠা নং - ৩৪)[247]। ডক্টর আদিব সালিহ লিখেছেনঃ হাদীসে কুদসী ঐ হাদীসকে বলে যা নবী করিম (সাঃ) আল্লাহর

[246] সহীহ আত্ তিরমিযী :: কিয়ামত অধ্যায়, অধ্যায় ৩৭ :: হাদীস ২৪৬৬, ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং – ৪১০৭ – আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন

[247] আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজাত ও সংকলন, পৃষ্ঠা নং - ৩৪

কালাম হিসাবে বর্ননা করেছেন। পরবর্তীতে তা বর্ননাকালে বর্ননাকারী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যস্থতায় বর্ননা করেছেন যার সূত্র পরস্পরা আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আল্লামা বাকী তার 'কুল্লিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট থেকে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ; আর 'হাদীসে কুদসীর'র শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও কথা, আল্লাহর নিকট হতে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন যোগ প্রাপ্ত।" আল্লামা তীবী বলেছেনঃ হাদীসে কুদসী হলো তাই যার মূলভাব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার। আল্লাহ ইলহাম বা স্বপ্নযোগে তা মহানবী (সাঃ) কে জানিয়ে দিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদীস (হাদীসে নববী) মহানবী (সাঃ) আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করেন নি এবং তাঁর থেকে বর্ননা করেন নি। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারিম ব্যতীত যে হাদীস তাঁর রবের পক্ষ থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন, অথবা জিবরীলের মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন তাই হাদীসে কুদসী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সংবাদ দিচ্ছেন, তাই এ প্রকারকে হাদীস বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় হিসেবে কুদসী বলে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, হাদীসে কুদসী ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য কি? তবুও কিছু

অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে, ছকের সাহায্য নিম্নে বিষয়টি আলোচনা করা হলোঃ-

কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য

কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য নির্নয় করতে যেয়ে প্রখ্যাত আলেমগণ যেসব মন্তব্য করেছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

আল্লামা আবুল বাকা তাঁহার 'কুল্লিয়াত' গ্রন্হে লিখেছেনঃ কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট হইতে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ; আর 'হাদীসে কুদসী'র শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু উহার অর্থ, ভাব ও কথা আল্লাহর নিকট হইতে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত[248]। আল্লামা তাইয়্যেবী-ও এই কথা সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কুরআনের শব্দ ও ভাষা লইয়া জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলে করীমের নিকট নাযিল হয়েছেন। আর 'হাদীসে কুদসী'র মূল কথা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাহা জানিয়ে দিয়েছেন। (এজন্যই হাদীসে কুদসী আল্লাহর কথারূপে পরিচিত হয়েছে) কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদীসকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার নামেও সে সবের বর্ণনা করেন নাই। নিম্নে কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্যসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ-

---

[248] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা নং - ৩৯

১. কুরআনুল কারিমের শব্দ ও অর্থ জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে জাগ্রত অবস্থায় নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ [الشعراء : ١٩٢، ١٩٥]

“আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়”। [সূরা শু‘আরা: (১৯২-১৯৫)][249]। তাই কুরআনুল কারিমের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়, তার শব্দ মুজিযা, হ্রাস ও বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

(إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩) [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাজতকারী”[250] অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

[249] সূরা শু‘আরা: (১৯২-১৯৫)

[250] সূরা হিজরঃ (৯)

(قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨) [الاسراء: ٨٨]

“বল, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’[251] হাদীসে কুদসীর এসব বৈশিষ্ট্য নেই, হাদীসে কুদসীর ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ।

২. সালাতে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ফরয, সক্ষম ব্যক্তির কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসী সালাতে পড়া নিষেধ, কুরআনের পরিবর্তে তার দ্বারা সালাত শুদ্ধ হবে না।

৩. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ইবাদত। প্রত্যেক শব্দের দশগুণ সাওয়াব। জমহুর আলেমের নিকট নাপাক ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়, যেমন তিলাওয়াত বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসী তিলাওয়াত করে ইবাদত আঞ্জাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তার সাওয়াব কুরআনের সমপরিমাণ নয় এবং

---

[251] সূরা আল-ইসরাঃ (৮৮)

নাপাক ব্যক্তির পক্ষে হাদীসে কুদসি স্পর্শ করা কিংবা তিলাওয়াত করা হারাম নয়।

৪. কুরআনুল কারিমের শব্দ, বাক্য ও ক্রম বিন্যাস আমাদের নিকট মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে পৌঁছেছে। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত দুই মলাটের মাঝে সংরক্ষিত। কুরআন অস্বীকারকারী কাফের, তার তিলাওয়াত ও শিক্ষার জন্য সনদ প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসী আমাদের নিকট পৌঁছেছে কখনও একক সংবাদের ভিত্তিতে আবার কখনও মুতাওয়াতির হিসেবে। মুতাওয়াতির না হলে প্রমাণিত নয় মনে করার কারণে তার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যায় না। তার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার জন্য সনদ দেখা প্রয়োজন। তবে হাদীসে কুদসীর বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে সেটা অস্বীকারকারীও কাফের হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহ ব্যতীত কারও সাথে কুরআন সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। কুরআনের একটি বাক্য কিংবা বাক্যাংশকে আয়াত বলা হয়। কয়েকটি আয়াতের সমষ্টিকে সূরা বলা হয়, যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ধারিত।

পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসী এরূপ নয়, বরং হাদীসে কুদসীকে: হাদীসে কুদসী, হাদীসে ইলাহী ও হাদীসে রাব্বানী বলা হয়। হাদীসে কুদসীকে কখনো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, কারণ তিনি স্বীয় রবের পক্ষ থেকে তা বলেছেন, তাই মুহাদ্দিসগণ হাদীসে কুদসীকে হাদীসে নববীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৬. হাদীসে কুদসী কুরআনের ন্যায় 'মুজিযা' নহে।

৭. হাদীসে কুদসী অমান্য করিলে লোক কাফির হয়ে যায় না - যেমন কাফির হয়ে যায় কুরআন অমান্য করিলে।

হাদীসে কুদসী যদিও রাসূল (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন যদিও রাসূল (সাঃ) তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ননা করেছেন, তবু হাদীসে কুদসী কুরআন বা কুরআনের সমতুল্য নয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হলো, হাদীসে কুদসীও এক প্রকার হাদীসই মাত্র। যেহেতু হাদীসে কুদসীতে আল্লাহর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, সে কারনে কেউ যদি এরূপ হাদীসকে কুরআনের সমতুল্য মনে করেন তবে তিনি মারাত্নক ভূল করবেন। কুরআন এবং হাদীসে উপরোক্ত যে সকল পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে তা স্পষ্ট প্রমানিত

হয়েছে। অতএব, বলা যায় যে, কুরআন ও হাদীসে কুদসীতে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে[252]।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম যে হাদীস প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত-

১. হাদীসে নব্বী - রাসূলে করীম (সাঃ) - এর হাদীস।

২. হাদীসে ইলাহী - আল্লাহ-হাদীস, আর এই হাদীসকেই হাদীসে কুদসী বলে।

হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নব্বীর পার্থক্য

শায়খ মুহাম্মদ আল-ফারুকী হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি লিখেছেন – "হাদীসে কুদসী তাই, যা নবী করীম (সাঃ) তার আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে বর্ণনা করেন। আর যা সেরূপ করেন না, তা হাদীসে নব্বী।"[253]।

নিম্নে হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নব্বীর পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ-

---

[252] সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী – আব্দুস শহীদ নাসিম, পৃষ্ঠা নং – ১৯

[253] হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পৃঃ ৩৬

১. হাদীসে কুদসী আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ওহীঃ স্পষ্ট ওহী, যেমন জিবরীলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস; অস্পষ্ট ওহী, যেমন ঘুম বা প্রত্যাদেশ যোগে প্রাপ্ত হাদীস।

পক্ষান্তরে হাদীসে নববী কতক ওহী ও কতক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ, তার ইজতিহাদ ওহী। কারণ, তার ইজতিহাদ ভুল হলে আল্লাহ সংশোধন করে দেন, ভুলের উপর তাকে স্থির রাখেন না।

২. হাদীসে কুদসী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন, কিন্তু হাদীসে নববী তিনি নিজের পক্ষ থেকে সরাসরি বলেন।

৩. হাদীসে কুদসীতে সাধারণত আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা, গুণগান, কুদরত, রহমত, মাগফেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাপ থেকে সতর্ককারী বিষয়ের আধিক্য থাকে।
পক্ষান্তরে হাদীসে নববীতে অধিকহারে মুসলিমের দীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ের বর্ণনা থাকে। (হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি, সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা – ১৩২)[254]।

---

[254] হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি, সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা – ১৩২

হাদীসে কুদসী'র উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ

হাদীসে কুদসীর উপর কতক লিখিত গ্রন্থসমূহের উদাহরন নিম্নে দেয়া হলোঃ-

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন আল-আরাবী আত-ত্বায়ি (মৃ.৬৩৮হি.), তাঁর রচিত গ্রন্থের নামঃ

مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار

২. আল্লামা নুরুদ্দীন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলতান (মৃঃ ১০১৪ হিঃ), যিনি 'মোল্লা আলী আল-কারী' নামে প্রসিদ্ধ, তিনি হাদীসের ছয় কিতাব থেকে চল্লিশটি হাদীসে কুদসী একসাথে জমা করেছেন এবং প্রত্যেক হাদীসের সূত্র উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত কিতাবের নামঃ

الأحاديث القدسية الأربعينية

৩. শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালেহ আল-মাদানী (মৃতঃ ১২০০হিঃ) হাদীসে কুদসীর উপর সর্ববৃহৎ কিতাব লিখেন, তার কিতাবের নামঃ

এতে তিনি (৮৬৪) টি হাদীসে কুদসী জমা করেন, যার অধিকাংশ তিনি ইমাম সুয়ূতি রচিত جمع الجوامع গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৪. لجنة القرآن الكريم والحديث بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একদল লেখক হাদীসের ছয় কিতাব ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে (৪০০) টি হাদীসে কুদসী বাছাই করেন, তাতে টিকা সংযোজন করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যুক্ত করেন, তাদের রচিত কিতাবের নাম: الأحاديث القدسية

৫. শায়খ মুস্তফা আদাবী (১৮৫)টি সহি ও হাসান হাদীসে কুদসী জমা করেন, তার কিতাবের নাম: الصحيح المسند من الأحاديث القدسية (তথ্যসূত্রঃ হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি, সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং – ১৩৯)[255]।

হাদীসে কুদসীর হুকুমঃ হাদীসে কুদসী হাদীসে নববীর ন্যায় সহী, হাসান ও দুর্বল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। অতএব হাদীসে কুদসী বলা কিংবা তার উপর আমল করার পূর্বে শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই করা জরুরি। (তথ্যসূত্রঃ ঐ)।

[255] হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি, সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং – ১৩৯

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বনঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নির্দোষ রাবীর হাদীস গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যে রাবী দোষী সাব্যস্ত হবে, তার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

আল্লাহ বলেনঃ

يا أَيُّها الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنْ جاَءَكُمْ فاَسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন খবর দিলে তা যাচাই কর।" (সূরা হুজুরাত-৬)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(منَ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكاَذِبِيْنَ)

"যে ব্যক্তি আমার থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করে যে, তার ধারণা হয় ওটা মিথ্যাও হতে পারে, তবে সে অন্যতম সেরা মিথ্যুক। (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

(كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّث بِكُلِّ ماَ سَمِعَ)

"একজন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই (পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে) বলে বেড়াবে।" (মুক্বাদ্দামা মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنْ النارِ)

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপরে মিথ্যা রোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলি দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ঢালাওভাবে হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে হাদীসটি সত্যিকার অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস কি-না। যে ব্যক্তি শোনামাত্রই বর্ণনা করে সে অন্যতম সেরা মিথ্যুক এবং জেনে বুঝে মিথ্যা রোপ করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, এ বাক্যগুলো থেকে হাদীসের সহীহ-যঈফ যাচাই কতটুক আবশ্যক তা সহজেই অনুমেয়[256]।

হাদীস বর্ণনায় সাহাবীদের সাবধানতার কয়েকটি নমুনা: রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে এমন দিক-নির্দেশনা পেয়ে হাদীস বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। এ রকম সাবধানতা বিশ্ববাসী অন্য কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে আদৌ দেখেনি। একটা হাদীস মুখ দিয়ে বের করাকে তারা অত্যন্ত কঠিন মনে করতেন।

---

[256] যঈফ ও জাল হাদীস এবং মুসলিম সমাজে তার কুপ্রভাব, সংকলন: আখতারুল আমান, জুবাইল দাওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, পো: ১৫৮০ সঊদী আরব।

হাদীস বর্ণনার সময় তারা ভয়ে থর থর করে কাঁপতেন; না জানি কোন ভুল করে ফেলেন, কোন কথা বৃদ্ধি করে ফেলেন; শেষে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। সেজন্য সাহাবাদের অনেকে রাসূলের (সাঃ) দীর্ঘ সময়ের সঙ্গী হওয়ার পরও খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যেমন- আবু বকর (রাঃ); অথচ সাহাবীদের মধ্যে তিনি রাসূল (সাঃ) কে সবচেয়ে বেশী সঙ্গ দিয়েছেন। আর যেসব সাহাবী হাদীস বর্ণনা করতেন তারা ঠিক যতটুকু শুনেছেন এবং তার যতটুকু মনে রাখতে পেরেছেন হুবহু ততটুকু বর্ণনা করতেন।

তারা নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পেরেছেন এবং হুবহু বর্ণনা করেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার পরও বর্ণনা শেষে বলতেন- 'অথবা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যেভাবে বলেছেন ঠিক ঐভাবে।' অথবা এই জাতীয় কোন বাক্য। নিম্নে সাহাবীদের হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের সাবধানতা সংক্রান্ত কিছু বাণী তুলে ধরলাম।

১. ইবনে সিরীন বলেন, "আনাস (রাঃ) খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। আর যখনি হাদীস বর্ণনা করতেন বর্ণনা শেষে বলতেন, "অথবা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যেভাবে বলেছেন ঠিক ঐভাবে।" [ইবনে মাজাহর ভূমিকা ১/১১, নং ২৪] প্রচণ্ড ভয় ও সাবধানতা রক্ষার্থে তিনি এ কথা বলতেন।

২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যদি ভুল হওয়ার আশংকা না করতাম তবে তোমাদেরকে এমন কিছু বিষয় জানাতাম যা আমি রাসূলের (সাঃ) কাছ থেকে শুনেছি অথবা তিনি বলেছেন। কিন্তু কিভাবে বলি আমি তো তাঁর মুখে শুনেছি, "যে ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।" [সুনানু দারেমী, ১/৬৭]

৩. শা'বী ও ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত: ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি বলতেন, "ঠিক এভাবে অথবা অনুরূপ", ঠিক এভাবে অথবা অনুরূপ"। (অর্থ্যাৎ তিনি ভয়ে একথা বলতেন।) [সুনানু দারেমী, ১/৭২]

৪. শা'বী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আমি ইবনে উমারের সাথে এক বছর উঠা-বসা করেছি। এ সময়ে আমি তার কাছ থেকে একটি হাদীসে রাসূল (সাঃ) ও শুনিনি।"[ইবনে মাজাহর ভূমিকা, ১/১১, নং২৬]

৫. আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা বলেন: " আমি রাসূলের (সাঃ) আনসারী সাহাবীদের মধ্যে ১২০ জনের সাক্ষাত পেয়েছি। তাদের যে কেউ যখনি কোন হাদীস বলতেন তখন কামনা করতেন যদি তার বদলে তার অন্য কোন সাথী হাদীসটা বলে দিতেন। তাদের কাউকে

যখন কোন ফতুয়া জিজ্ঞেস করা হত তখন তিনি কামনা করতেন যদি তার বদলে তার অন্য কোন সাথী ফতুয়াটা দিতেন।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- "তাদের কাউকে যখন কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি অন্য কারো কাছে পাঠাতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার অন্যজনের কাছে পাঠাতেন। এভাবে প্রশ্নকারী আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে আসতেন।"[ইবনে আব্দুল বার্রের "জামে বায়ানুল ইলম ওয়া ফাদলিহি" ২/১৬৩] সাহাবারা প্রশ্নকারীকে কষ্ট দেয়ার জন্য তা করতেন না। বরং ভুল ফতুয়া দিয়ে জাহান্নামবাসী হন কিনা এই ভয়ে তারা তা করতেন।

৬. আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ "আমরা যায়েদ বিন আরকামকে বললাম, আমাদেরকে হাদীসে রাসূল (সাঃ) শুনান। তিনি বললেন, আমাদের বয়স ভারী হয়েছে। আমরা ভুলে গেছি। আর রাসূল (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করা বড় কঠিন কাজ।" [ইবনে মাজাহর ভূমিকা, হাদীসে রাসূল (সাঃ) বর্ণনা থেকে বিরত থাকা শীর্ষক অধ্যায়]।

এই সমুদয় বাণী পড়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম- সাহাবীরা রাসূলের (সাঃ) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কি পরিমান সতর্কতা অবলম্বন করতেন । সাহাবীরা রাসূলের (সাঃ) নামে কথা বলতেই ভয় করতেন থাকতো তাঁর নামে মিথ্যা বলবেন বা রাসূলের বাণীকে

ওলট-পালট করবেন। কিভাবেই বা এহেন কাজ করবেন অথচ তারা ছিলেন সোনার মানুষ যাদের উপর স্বয়ং আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। "মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহন করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন..." [সূরা ফাতহ ৪৭:১৮] "আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি রাজি হয়েছেন। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা।" সূরা তওবা ৯:১০০]

প্রত্যেক সাহাবী নিজস্ব অনুভূতিতে এত সাবধানী হওয়ার পরও কোন সাহাবী যখন কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন প্রয়োজন অনুভব করলে শ্রোতা সাহাবীরা তার কাছ থেকে অন্য কোন সাহাবীর সমর্থন তলব করতেন। যেন অজান্তে, অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও কোন ভুল কথা প্রচার লাভ না করে এবং বর্ণনাকারীরা যেন আরো বেশী সাবধানী হন। যেমনটি ঘটেছে মুগীরা বিন শু'বার সাথে আবু বকরের (রাঃ)। হযরত ক্বাবিসা বিন যুওয়াইব বলেন, জনৈক (মৃতের) দাদী এসে আবু বকর (রাঃ) এর কাছে দাবী জানালেন তার নাতির উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে তার প্রাপ্য হক আদায় করে

দেয়ার জন্য। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন: আমি তো আল্লাহর কিতাবে ও রাসূলের সুন্নাহ তে দাদীর জন্য কোন অংশ দেখি না। আচ্ছা এখন যাও, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করব। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন মুগীরা বিন শু'বা বললেন, আমার উপস্থিতিতে রাসূল (সাঃ) জনৈক দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, তোমার পক্ষে কি আর কারো সমর্থন আছে? তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা দাঁড়িয়ে মুগীর বিন শু'বার অনুরূপ কথা ব্যক্ত করলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) দাদীকে তার হক বন্টন করে দিলেন।[সুনানু তিরমিজী, দাদীর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যা এসেছে শীর্ষক অধ্যায়, নং২২৪৭; আবু দাউদ, দাদীর উত্তরাধিকার শীর্ষক অধ্যায়, ২৮৯৪।] এখানে বলে রাখা ভাল আবু বকর (রাঃ) শু'বা (রাঃ) মিথ্যা বলেছেন এ রকম কোন আশংকার কারণে সাক্ষ্য তলব করেননি, বরং সাক্ষ্য তলব করেছেন অধিক সাবধানতা অবলম্বনে। কারণ অন্য বর্ণনায় এসেছে সাহাবীরা একে অপরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতেন না। যেহেতু তারা মিথ্যা বলতেন না।এ ধরনের সাক্ষ্য তলবের ঘটনা উমর (রাঃ) এর সাথেও ঘটেছে। হযরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একবার উমরের (রাঃ) বাড়িতে গিয়ে আমি তিনবার অনুমতি চাইলাম। কোন উত্তর না পেয়ে আমি ফিরে আসলাম। এরপর উমর (রাঃ) আমার জন্য লোক পাঠালেন। (আমি তার সাথে দেখা করার পর) তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ, আমার দরজাতে খানিক ক্ষণ

দাঁড়ানোটাকে যদি তুমি কষ্ট মনে কর, তবে জেনে রাখো তোমার দরজাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাকেও মানুষ কষ্টকর মনে করবে। আমি বললাম: কেন আমি তো তিনবার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি না পেয়ে চলে আসলাম। (আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে তো) আমাদেরকে এই আদেশ দেয়া হত। তিনি বললেন (উমর রাঃ) তুমি এ কথা কার কাছে শুনেছ? আমি বললাম, নবী করিম (সাঃ) এর কাছে। তিনি বললেন, আমরা যে কথা শুনি নাই সে কথা তুমি শুনলে কোথা থেকে। তোমাকে অবশ্যই সাক্ষী আনতে হবে, না হয় আমি তোমাকে শাস্তি দিব। আমি সেখান থেকে বের হয়ে মসজিদে সমবেত আনসারদের একটা দলের কাছে আসলাম। এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল: কেন, কেউ কি এ ব্যাপারে সন্দেহ করে। তখন উমর (রাঃ) যা বললেন আমি তাদেরকে তা জানালাম। তারা বললেন আমাদের একবারে ছোট্ট মানুষটি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তখন আবু সাঈদ খুদরী অথবা আবু মাসউদ আমার সাথে উমরের (রাঃ) কাছে গিয়ে বললেন: একবার রাসূল (সাঃ) সাদ বিন উবাদার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন আমি তার সাথে ছিলাম। নবীজি তার বাড়ীতে পৌঁছে সালাম দিলেন, কোন জবাব আসল না। দ্বিতীয়বার আবার সালাম দিলেন কোন জবাব এল না। তৃতীয়বার আবার সালাম দিলেন। কোন জবাব আসল না। এরপর তিনি বললেন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এই বলে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে সাদ এসে

হাজির। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি আপনার প্রতিটি সালাম শুনেছি এবং জবাব দিয়েছি। আমার কাছে ভাল লাগছিল আপনি আমাকে ও আমার পরিবারকে আরো সালাম দিতে থাকুন। তখন আবু মুসা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ছিলাম। তখন উমর (রাঃ) বললেন, অবশ্যই। কিন্তু আমি চূড়ান্ত নিশ্চিয়তা পেতে চেয়েছি।"

আবার কখনো কখনো বর্ণনাকারী সাহাবীর মুখস্ত শক্তি ঠিক আছে কিনা তা পরখ করে দেখার জন্য সাহাবীরা দুটি ভিন্ন সময়ে একই হাদীস তার কাছ থেকে জানতে চাইতেন। তিনি যদি উভয় সময়ে ঠিক একইভাবে হাদীসটা বর্ণনা করেন তখন প্রমাণিত হত যে হাদীসটা তার মুখস্ত আছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আমরের সাথে করেছিলেন।হযরত উরউয়া বিন যুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আয়েশা (রাঃ) বললেন; ভাগিনা, শুনেছি আব্দুল্লাহ বিন আমর আমাদের পথ দিয়ে হজ্জে যাচ্ছে। তার সাথে সাক্ষাত কর এবং তাকে হাদীস জিজ্ঞেস কর। কারণ তার কাছে নবুয়তী জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার আছে। উরউয়া বলেন, আমি তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলাম। তিনি রাসূল (সাঃ) থেকে অনেক কিছু বর্ণনা করলেন। এর মধ্যে একটা হাদীস এরকম বর্ণনা করেন যে, "আল্লাহ পাক সরাসরি ইলম উঠিয়ে নিবেন না। কিন্তু আলেমদের উঠিয়ে নিবেন। আলেমের মৃত্যুর সাথে ইলমেরও মৃত্যু

হবে। এরপর কতগুলো মুর্খ সর্দার বেঁচে থাকবে, তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে। এভাবে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" উরউয়া বলেন আমি যখন হাদীসটি আয়েশা (রাঃ) কে শুনালাম তিনি হাদীসটিকে বড় কঠিন মনে করলেন এবং মেনে নিতে পারছিলেন না। এমনকি (আমাকে) বললেন, তিনি (আব্দুল্লাহ বিন আমর) কি তোমাকে একথা বলেছেন যে, তিনি এ কথা রাসূল (সাঃ) থেকে শুনেছেন। পরের বছর যখন হজ্জের মওসুম এল তখন আয়েশা (রাঃ) উরউয়াকে বললেন: আব্দুল্লাহ বিন আমর তাশরীফ এনেছেন। তুমি তার সাথে সাক্ষাত করে আলাপ-সালাপ কর। আর এক ফাঁকে তাকে ইলম সংক্রান্ত ঐ হাদীসটির কথা জিজ্ঞেস করে নিও। (উরউয়া বলেন) আমি তার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং হাদীসটি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রথমবার যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঠিক সেভাবে বর্ণনা করলেন। উরউয়া বলেন, যখন আমি আয়েশা (রাঃ) কে তা জানালাম তখন তিনি বললেন: 'আমি মনে করি তিনি সত্য বলেছেন। দেখা যাচ্ছে – তিনি (ইবনে আমর) একটুও কম-বেশী করেননি[257]। এভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম হাদীস গ্রহন করতেন। যদিও সাহাবীদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি হাদীসকে বিকৃত করার দুঃসাহস দেখাবেন। তারপরেও অধিক সতর্কতা অবলম্বনে তারা তা করতেন।

---

[257] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭৭ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯৭৪

এছাড়াও সাহাবীদের মধ্যে যারা হাদীস যাচাই-বাছাইয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন তারা হলেন- হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), আলী বিন আবী তালেব (রাঃ), আনাস বিন মালেক (রাঃ), যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ।

সাহাবীদের পর থেকে হাদীস গ্রন্থায়িত হওয়া পর্যন্ত সময়ে হাদীস গ্রহনে আলেমদের সাবধানতা

সাহাবায়ে কেরামের প্রজন্ম ছিল উম্মতের সবচেয়ে উত্তম প্রজন্ম। দ্বীনদারী ও পরহেজগারী ছিল তাদের সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইসলামের বিজয় অভিযানের সাথে সাথে বিজিত অঞ্চলের লোকেরা ইসলামে প্রবেশ শুরু করল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ইসলাম গ্রহন করল যাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে মুসলিম হিসেবে জাহির করে ইসলামের ক্ষতি করা। যেমনটি করেছিল অগ্নি উপাসক "আব্দুলাহ বিন সাবা" ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। এ শ্রেণীর লোকেরা তাদের অশুভ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু কিছু বানোয়াট বাণী রাসূল (সাঃ) এর নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। আর এই ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য মুহাদ্দিসরা এক নতুন অস্ত্র গ্রহন করলেন। যখনি কোন ব্যক্তি বলত, রাসূল (সাঃ) হাদীসে এ কথা বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করা হত তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ। যদি সে কোন বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করতে পারত এবং তার

উল্লেখিত বর্ণনাকারীরা সত্যবাদী, দ্বীনদার ও সুন্নতের অনুসারী হতো তাহলে তার হাদীস গ্রহন করা হত। আর যদি তাকে বর্ণনাকারীরা মিথ্যাবাদী হত অথবা বিদআতী হত তখন তার হাদীস প্রত্যাখান করা হত। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, "সনদ হচ্ছে দ্বীনকে রক্ষাকারী। যদি সনদ জিজ্ঞেস করা না হত তাহলে যার যা ইচ্ছা সে ওটাকে দ্বীন বলে চালিয়ে দিত।" [সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, ১/১৫]

অন্যদিকে সময়ের ব্যবধানে রাসূল (সাঃ) ও পরবর্তীতে আগত মুহাদ্দিসদের মাঝখানে সেতু স্থাপনকারী রাবীদের (বর্ণনাকারী) সংখ্যা বেড়ে গেল। আর মানুষ মাত্রই সকলের মুখস্ত শক্তি সমান নয়। বরং কারো কারো মুখস্ত শক্তি অত্যন্ত দূর্বল। সেজন্য হাদীসের সাথে সনদ উল্লেখ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেন সংশ্লিষ্ট রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা যায়। তারা কি দ্বীনদার, না দ্বীনদার নয়। তাদের মুখস্ত শক্তি কি মজবুত, না দূর্বল। এ কারণে ওসমান (রাঃ) নিহত হওয়ার পর থেকে সনদ ছাড়া কোন হাদীস গ্রহন করা হত না। যার ফলে মুহাদ্দিসদেরকে যেমন রাসূলের (সাঃ) বাণীটা মুখস্ত করতে হত ঠিক তেমনি বর্ণনাকারীদের নাম ও ক্রমধারা মুখস্ত করতে হত। বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে সিরীন বলেন, "পূর্বে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের সিলসিলা) জিজ্ঞেস করা হত না। আর যখন থেকে ফিতনা শুরু হল (ওসমান (রাঃ) হত্যার পর) তখন থেকে মুহাদ্দিসরা বলা শুরু করলেন, 'তোমাদের

বর্ণনাকারীদের নাম বল।' তখন বর্ণনাকারীদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হত যদি তারা সুন্নতের অনুসারী হতেন তাদের হাদীস গ্রহন করা হত। আর যদি তারা বিদআতী হতেন তখন তাদের হাদীস গ্রহন করা হত না।" [সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১/১৫]

এভাবে হাদীসকে রক্ষা করার জন্য নতুন দুটি জ্ঞানের উদ্ভব হয়। একটিকে বলা হয় "ইলমুল রিজাল" (বর্ণনাকারীদের পরিচয় সংক্রান্ত) অন্যটিকে বলা হয় "আল জারহ ওয়াত তাদীল" (রাবীদের সমালোচনা বা তাদের গুণাবলী নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ)।

সনদ বলতে সেসব ব্যক্তিদের পরম্পরাকে বুঝানো হয় যাদের মাধ্যমে হাদীসটি রাসূল (সাঃ) থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বর্ণনাকারীর কাছে এসে পৌঁছেছে।" হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, এমনকি এরপরেও হাদীসের যত মৌলিক গ্রন্থ্ রচিত হয় সবগুলোতে হাদীসের সাথে সনদ উল্লেখ করা হয়। কোন পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন কোথায় আমরা তো অনুদিত সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম বা অন্য কোন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণনাকারীদের কোন সিলসিলা দেখি না; শুধু সাহাবীর নাম দেখি। জবাব হল, আপনারা যদি আরবীতে মূল কিতাবগুলো দেখতেন তাতে সনদ দেখতেন পেতেন। যেমন আপনি যদি সহীহ বোখারীর মূল আরবী কিতাবে প্রথম হাদীসটা খোলেন, দেখতে পাবেন সেখানে লেখা আছে-

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ.......

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর আলহুমাইদী আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ সুফিয়ান আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম তাইমী তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি "আলকামা বিন ওক্কাছ লাইছিকে" বলতে শুনেছেন এবং তিনি (আলকামা) বলেন, আমি উমর (রাঃ) কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "......." [সহীহ বুখারী, ১/৪]। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজীতে অনুদিত অধিকাংশ গ্রন্থগুলোতে এ দীর্ঘ সনদ উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র সাহাবীর নাম ও হাদীসের মূল কথাটা রাখা হয়েছে। যেন অনুদিত গ্রন্থের কলেবর বেড়ে না যায়। তার সাথে হয়তো প্রকাশকরা মনে করেন অনুবাদের পাঠকরা এ সনদ থেকে খুব বেশী উপকৃত হবেন না। কারণ অনুবাদের পাঠকের মূল উদ্দেশ্য থাকে রাসূলের বাণীটা জানা। আর যারা সনদ জানতে চায় তারা তো মূল কিতাব দেখতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি সনদ সহ অনুবাদ করাটাই শ্রেয় ছিল। যাতে অনুবাদের পাঠকরাও সনদের মাধ্যমে সুন্নাহকে হেফাযতের এ মহান বৈশিষ্ট্য জানতে পারতেন। যে

বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর রয়েছে। অন্য কোন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নবী পর্যন্ত তাদের ধর্ম গ্রন্থসমূহের একটা বর্ণনাসূত্রও বলতে পারবে না; যেখানে মুসলমানরা হাজার হাজার বর্ণনা সূত্র বলতে পারবে। এভাবে "ইলমুল রিজাল" ও "জারহ ওয়া তাদীলের" এদুটি অস্ত্রকে ব্যবহার করে মুহাদ্দিসে কেরাম কোন বাণী কি "হাদীস", নাকি "হাদীস নয়" তা নির্ণয় করতে পারতেন। যখন কেউ বিশেষ কোন মুহাদ্দিসের কাছ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন রাবী বিশ্লেষকরা দেখতেন- এই ব্যক্তির জন্ম কবে এবং সে যার কাছ থেকে হাদীসটা বর্ণনা করছে তার মৃত্যু কবে। যদি কোন অসামঞ্জস্যতা দেখতেন তখন প্রমাণ করে ফেলতেন যে এ ব্যক্তি আসলে হাদীসটা শুনেনি। অথবা কখনো দেখতেন এ ব্যক্তির অবস্থান কোথায় এবং সে কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমন করেছে। আর যার কাছ থেকে বর্ণনা করছেন তিনি কোন দেশে অবস্থান করেছেন এবং কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমন করেছেন। যদি দেখতেন এখানে কোন অসামঞ্জস্যতা আছে তখন স্পষ্ট হয়ে যেত যে এ ব্যক্তি হাদীসটা শুনেনি। অনুরূপভাবে রাবীর মুখস্ত শক্তিও পরীক্ষা করতেন। কতগুলো হাদীসকে ওলট-পালট করে দিয়ে রাবীকে জিজ্ঞেস করতেন- এ হাদীসগুলো ঠিক আছে কিনা? ঠিক না থাকলে কিভাবে ঠিক হবে? যেমনটি বাগদাদবাসী ইমাম বোখারীর সাথে করছিলেন। ইমাম বুখারী বাগদাদে আসলে তারা এক হাদীসের সনদকে আরেক হাদীসে লাগিয়ে একের পর এক একশটা হাদীস ইমাম বোখারীর

কাছে পেশ করেন। পেশ করা শেষে ইমামকে জিজ্ঞেস করেন 'হাদীসগুলো ঠিক আছে কিনা?'

ইমাম বুখারী এত বেশী ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন যে একবার মাত্র শুনে তাদের উল্লেখকৃত প্রতিটি হাদীস মুখস্ত করে ফেলেন। প্রথমে তারা যেভাবে উল্লেখ করেছে ঠিক সেভাবে হাদীসটি উল্লেখ করে বলতেন- 'আমরা এভাবে কোন হাদীস জানি না।' কিন্তু আমরা হাদীস জানি এইভাবে- তখন প্রত্যেক হাদীসের যে সনদ সে হাদীসের সে সনদটা দিয়ে হাদীসটা উল্লেখ করতেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে যারা অত্যন্ত পরহেযগার, মুত্তাকী ছিলেন তাদের একটা অংশ হাদীস গ্রন্থায়নের আগ পর্যন্ত "ইলমুল রিজাল" ও "জারহ ওয়াত তাদীল" এ দুটো বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দেন। তারা রাবীদের পরিচয়, তাদের জীবনী, তাদের দ্বীনদারী ও আখলাক ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে তথ্য নিতেন এবং সে আলোকে রাবীদের উপর সিদ্ধান্ত দিতেন। কোন ব্যক্তি যদি জীবনে একটা মিথ্যা কথা বর্ণনা করত তার কাছ থেকে আর কখনো হাদীস গ্রহন করা হতো না। কোন ব্যক্তি অতি দ্বীনদার, পরহেজগার হওয়ার পরও তার মুখস্ত শক্তিতে দূর্বলতা থাকার কারণে তার হাদীসের মান কমে যেত। এভাবে তাদের ছাত্ররা রাবীদের পরিচিতি ও গুণাগুণ তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে শুনে মুখস্ত করতেন। পরবর্তীতে এ দুটো বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থসমূহে রাবীর পরিচয়,

তিনি কোথায় কোথায় ভ্রমন করেছেন, কার কার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তার কাছ থেকে কে কে হাদীস শুনেছেন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকত। সাথে সাথে একথারও উল্লেখ থাকত তিনি কোন মানের ও কোন স্তরের রাবী। নিম্নে রাবীদের একটা স্তর বিন্যাস তুলে ধরলামঃ-

এ বিন্যাসটি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ ৮৫২হিঃ) উল্লেখ করেছেন। এ বিন্যাসে একেবারে প্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে- সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাবীদের, আর একেবারে শেষে রাখা হয়েছে মিথ্যাবাদীদের, যাদের একটি কথাও মুহাদ্দিসরা গ্রহন করেননি। (অবশ্য কোন কোন মুহাদ্দিস এ স্তর বিন্যাসে সামান্য ব্যতিক্রম করেছেন)। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার রাবীদের বারটি স্তর উল্লেখ করেন। সকল সাহাবী হলেন প্রথম মানের রাবী। দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের বলা হত- ছিকাহ ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য ২বার)। তৃতীয় স্তরের রাবীদের বলা হত- ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য ১বার)। চতুর্থ স্তরের রাবীদের বলা হত- সাদুক (সত্যবাদী), লা বা'স (কোন অসুবিধা নাই)। পঞ্চম স্তরের রাবীদের বলা হত- সাদুক সায়্যিউল হিফয (সত্যবাদী, কিন্তু মুখস্তে দূর্বল) ষষ্ঠ স্তরের রাবীদেরর বলা হত- মাকবুল (চলনসই)। সপ্তম স্তরের রাবীদের বলা হত- মাসতুর (তার গুণাগুণ অজ্ঞাত)। অষ্টম স্তরের রাবীদের বলা হত- যয়ীফ (দূর্বল)। নবম স্তরের রাবীদের বলা হত- মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)।

দশম স্তরের রাবীদের বলা হত- মাতরুক (পরিত্যাজ্য)। একাদশ স্তরের রাবীদের বলা হত- মুত্তাহাম বিল কাযিব (মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট)। দ্বাদশ স্তরের রাবীদের বলা হত- কাজ্জাব, (মিথ্যাবাদী) ওযি' (জালকারী)।

যুগে যুগে যেসব হাদীস বিশারদের কথা "জারহ ওয়া তাদীল" (রাবীর সমালোচনা) শাস্ত্রে গ্রহনযোগ্যতা পায় তাদেরকে আলেমসমাজ সময়কাল অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন।

যেমন- প্রথম স্তরে রয়েছেন সাহাবীরা। তারা হলেন- হযরত উমর (রাঃ), আলী বিন আবী তালেব (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), আনাস বিন মালেক (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ।

দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন- তাবেয়ীরা। তারা হলেন- সাঈদ বিন মুসায়্যিব (মৃ ৯৪হিঃ), সাঈদ বিন যুবায়ের (মৃ ৯৫হিঃ), উরউয়া বিন যুবাইর (মৃ ৯৪হিঃ), হাসান বসরী (মৃ ১১০হিঃ), আমের শাবী (মৃ ১০৩হিঃ) প্রমুখ।

তৃতীয় স্তরে রয়েছেন- তাবে তাবেয়ীরা। তারা হলেন- শুবা বিন হাজ্জাজ (মৃ ১৬০হিঃ), সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী (মৃ ১৬১হিঃ), আব্দুর রহমান বিন আমর আল আওযায়ী (মৃ ১৫৭হিঃ), মালেক বিন

আনাস (মৃ ১৭৯হিঃ), আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (মৃ ১৮১হিঃ), এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান (মৃ ১৯৮হিঃ) প্রমুখ।

চতুর্থ স্তরে রয়েছেন- তাবে তাবেয়ীদের আরেকটা স্তর। তারা হলেন- ওকী' বিন জাররাহ (মৃ ১৯৭হিঃ), আব্দুর রহমান বিন মাহদী (মৃ ১৯৮হিঃ), মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী (মৃ ২০৪হিঃ), এবং সাঈদ বিন মানসুর (মৃ ২২৮হিঃ) প্রমুখ।

পঞ্চম স্তরে রয়েছেন- তাবে তাবেয়ীদের পরের স্তর। তারা হলেন- আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ ২৪১হিঃ), আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর মাদিনী (মৃ ২৩৪হিঃ), ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (মৃ ২৩৩হিঃ), ইসহাক বিন রাহুইয়া (মৃ ২৩৮হিঃ), আবু বকর বিন আবি শায়বা (মৃ ২৩৫হিঃ), আব্দুর রহমান বিন ইব্রাহীম দিমাসকী (মৃ ২৪৫হিঃ) এবং আমর বিন আলী আল ফাল্লাস (মৃ ২৪৯হিঃ) প্রমুখ।

ষষ্ঠ স্তরে রয়েছেন- এদের পরের স্তর। তারা হলেন- মুহাম্মদ বিন ইসামাইল বোখারী (মৃ ২৫৬হিঃ), আবু যুরআ (মৃ ২৬৪হিঃ), আবু হাতিম রাজী (মৃ ২৭৭হিঃ), মুহাম্মদ বিন মুসলিম (মৃ ২৭০হিঃ), আবু যুরআ' দিমাসকী (মৃ ২৮১হিঃ), সালেহ বিন মুহাম্মদ (মৃ ২৯৩হিঃ), মুসা বিনা হারুন (মৃ ২৯৫হিঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আহমদ (মৃ ২৯০হিঃ) প্রমুখ।

সপ্তম স্তরে রয়েছেন- আহমাদ বিন শুয়াইব নাসাঈ (মৃ ৩৫৩হিঃ), আবু আরুবা হাররানী (মৃ ৩১৮হিঃ) এবং আলী বিন সাদ (মৃ ২৯৭হিঃ) প্রমুখ

হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত "ইলমুল রিজাল" (রাবী পরিচিতি) নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরছি-

১. হাইসাম বিন আদীর (মৃ ২০৭হিঃ) তাবাক্বাতু মান রাওয়া আনিন নাবী [নবীজি (সাঃ)] থেকে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের নানা স্তর)।

২. আবু হাতেমের (মৃ ২৭৭হিঃ) তাবাক্বাতুত তাবেয়ীন (তাবেয়ীদের বিভিন্ন স্তর)

৩. ইমাম মুসলিমের (মৃ ২৬১হিঃ) তাবাক্বাতুস সাহাবা ওয়াত তাবেয়ীন (সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন স্তর)

৪. ইবনে হায়্যানের (মৃ ৩৬৯হিঃ) তাবাক্বাতুল মুহাদ্দিসীন বি ইসবাহান (ইসবাহানের মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন স্তর)

৫. ইবনে সাদের (মৃ ২৩০ হিঃ) আত তাবাক্বাতুল কুবরা।

৬. আলী বিন হুসাইনের (মৃ ৪২৯ হি) তাবাকাতুর রিজাল (মহাপুরুষদের স্তরগুলো)

শুধুমাত্র সাহাবীদের নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১. আবু উবাইদের (মৃ ২০৭ হিঃ) আস সাবাহা (সাহাবা চরিত)

২. আলী বিন মাদিনী (মৃ ২৩৪ হিঃ) মান নাযালা মিলাস সাহাবা সায়েরাল বুলদান (সাহাবাদের যারা নানা দেশে অবস্থান করেছেন)

৩. আবু মানসুরের (মৃ ৩০১ হিঃ) আস সাহাবা (সাহাবা চরিত)

৪. আব্দুল্লাহ বিন আবু দাউদের (মৃ ৩১৬ হিঃ) আস সাহাবা (সাহাবা চরিত)

৫. মুহাম্মদ বিন মানদার (মৃ ৩৯৫ হিঃ) মারিফাতুস সাহাবা (সাহাবাদের পরিচয়)

৬. ইবনে আব্দুল বারের (মৃ ৪৬৩ হিঃ) আল ইসতিয়াব

৭. আবু নুআইমের (মৃ ৪৩০ হিঃ) মারিফাতুস সাহাবা (সাহাবাদের পরিচয়)

হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতাব্দি পর্যন্ত "জারহ ওয়া তাদীল" (রাবী সমালোচনা) বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলোকে আলেমরা তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রন্থগুলোর কিছু নমুনা নিম্নে আলাদাভাবে তুলে ধরলাম-

নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য উভয় ধরনের রাবীদের জীবনী নিয়ে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহঃ

১. লাইছ বিন সাদের (মৃ ১৭৫ হিঃ) "আল জামউ বায়নাছ ছিকাত" (নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য রাবীদের জীবনী)

২. ইবনে মুবারকের (মৃ ১৮১ হিঃ) "আত তারিখ" (এই গ্রন্থেও নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য উভয় ধরনের রাবীদের আলোচনা স্থান পায়)

৩. আবু নুআইম (মৃ ২১৮ হিঃ) "আত তারিখ" (এই গ্রন্থেও নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য উভয় ধরনের রাবীদের আলোচনা স্থান পায়)

৪. ইয়াকুব বিন সুফিয়ান ফাসাবীর (মৃ ২৭৭ হিঃ) "আল মারিফ ওয়াত তারিখ"

৫. আবু হাতেমের (মৃ ৩২৭ হিঃ) "আল জারহ ওয়াত তাদীল"

৬. খলিলীর (মৃ ৪৪৬ হিঃ) "আল ইরশাদ"

শুধুমাত্র দূর্বল রাবীদের জীবনী নিয়ে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহঃ

১. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান (মৃ ১৯৮ হিঃ) "আদ যুয়া'ফা" (এতে শুধু অনির্ভরযোগ্য বা দুর্বল রাবীদের আলোচনা স্থান পায়)

২. ইয়াহইয়া বিন মায়ীনের (মৃ ২৩৩ হিঃ) "আদ যুয়া'ফা" (এতে শুধুমাত্র দুর্বল রাবীদের আলোচনা স্থান পায়)

৩. ইবনে খুজাইমার (মৃ ৩১১ হিঃ) "আদ যুয়া'ফা"

৪. ইবনে আদীর (মৃ ৩৬৫ হিঃ) আল কামিল ফিদ যুয়া'ফা"

৫. হাকেমের (মৃ ৪০৫ হিঃ) "আদ যুয়া'ফা"

৬. খতীব বাগদাদীর (মৃ ৪৬৩ হিঃ) "আদ যুয়া'ফা" ইত্যাদি

শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীদের জীবনী নিয়ে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহঃ

১. আলী বিন মাদিনীর (মৃ ২৩৪ হিঃ) "আছ ছিকাত ও তাছাব্বিতুন"

২. আহমাদ আলইজলীর (মৃ ২৬১ হিঃ) "আছ ছিকাত"

৩. ইবনে হিব্বানের (মৃ ৩৫৪ হিঃ) "আছ ছিকাত"

৪. ইবনে হিব্বানের "মাশাহিরু উলামায়িল আমসার"

৫. ইবনে শাহীনের (মৃ ৩৮৫ হিঃ) "তারিখু আসমাইছ ছিকাত" ইত্যাদি।

এছাড়াও "ইলমুল রিজাল" ও "জারহ ওয়াত তাদীলের" উপর রয়েছে আরো অগনিত, অসংখ্য গ্রন্থ। যেগুলোর উল্লেখে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। "ইলমুল রিজাল" ও "জারহ ওয়াত তাদীল" এ দুটি ইলমকে পুঁজি করে হাদীস বিশারদরা হাদীসকে সম্পূর্ণ নির্ভেজালভাবে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলোকে সংকলিত করেই তারা ক্ষান্ত হননি, বরং যেগুলো হাদীস নামে সমাজে প্রচলিত আছে অথবা বিভিন্ন বই-পুস্তকে লেখা আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হাদীস নয় সে বানোয়াট কথাগুলোও তারা একত্র করে সংকলন বের করেছেন। যেন তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীর উম্মত বিভ্রান্ত না হয়, বিপথে না যায়। এ প্রবন্ধের প্রথম পর্বে "মাউজু হাদীস" বা বানোয়াট কথাগুলো নিয়ে সংকলিত অনেকগুলো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে পাঠক প্রবন্ধের সে অংশ দেখে নিতে পারেন।

এত ত্যাগ-কুরবানী এবং এ পরিমাণ সাবধানতা পৃথিবীর আর কোন জ্ঞানের গ্রন্থগুলো সংকলনে গৃহীত হয়েছে বলে আমার জানা নাই। যে এ্যরিস্টটল, সেক্সপিয়রের বাণী আমরা হর-হামেশা মুখে আওড়িয়ে থাকি যদি জিজ্ঞেস করা হয় এ্যরিস্টটল বা সেক্সপিয়র পর্যন্ত এ বাণীর একটা মাত্র বর্ণনাসূত্র আমাদেরকে দেন তো, কেউ কি দিতে পারবেন?! যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা গর্ব করি প্রাচীন বিজ্ঞানীদের বাণী বা থিওরীগুলো যে ঠিক ঐ বিজ্ঞানীর বাণী বা থিওরী তা কি বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে কেউ প্রমাণ করতে পারবেন? অনুরূপ কথা আমরা বলতে পারি জ্ঞানের প্রতিটি শাখার ক্ষেত্রে। অথচ কোন প্রকার বাক্য ব্যয় ব্যতিরেকে পৃথিবীর সকল ধর্মের সকল মতের মানুষ প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাণীকে সংশ্লিষ্ট প্রবক্তার বলে মনে করে। কোন দিন তো শুনা যায় নাই "মধ্যাকর্ষন শক্তির" প্রবক্তা নিউটন না অন্য কেউ এ নিয়ে মাতামাতি করতে।

অথচ হাদীসে রাসূল (সাঃ) স্বাব্যস্তকরণে যে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে তাতো দূরে থাক এসব বাণীগুলোর প্রবক্তা যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা সাব্যস্ত করার প্রয়োজনটুকু মনে করেননি ঐ সব জ্ঞানের গবেষকরা। যদি কেউ করে থাকে তবে সে জ্ঞানের ছাত্ররা আমাদেরকে লিখে জানাক। এমনকি পৃথিবীর অন্যসব ধর্মগ্রন্থগুলোরও কোন সনদ নাই। লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করা হচ্ছে- এটা অমুকের বাণী।

বাস্তবে সে বাণী সংরক্ষণ ও মিশ্রনমুক্ত রাখার কোন চেষ্টা আদৌ কোন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে নাই।

শুধুমাত্র ইঞ্জিলের কিছু সনদ আছে। তাও "পল" পর্যন্ত গিয়ে হারিয়ে গেছে। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর হাদীসে রাসূলের (সাঃ) একজন ছাত্রকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত বর্ণনা সূত্র আপনাকে শুনিয়ে দিবে।

আধুনিক প্রিন্টিং পদ্ধতিতে ছাপা হওয়া হাদীসের মূল আরবী গ্রন্থগুলোর প্রতিও যদি আপনি নজর দেন তাহলে দেখতে পাবেন গ্রন্থের শুরুতে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ছবি দেওয়া আছে। কত সালে কে পাণ্ডুলিপিটি তৈরী করেছেন তাও উল্লেখ আছে এবং এই গ্রন্থ যে ঐ লেখকের বা ঐ সংকলকের তাও প্রমাণ করা আছে সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থাকারদের উক্তি দিয়ে বা অন্য কোন আলামত দিয়ে।

উপসংহারঃ এ প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বলতে চাই- প্রিয় মুসলিম, নব্য জাহেলিয়াতের কবলে পড়ে, আদর্শিক বা তথ্য সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয়ে আপনি যেন বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খড়-কুটা না হন। নিজের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরুন।

নিজেকে ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত করে তুলুন। বাতিলের ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করুন এবং সঠিকভাবে তা জাতির সামনে তুলে ধরুন। আর অজানা বিষয়ে চুপ থাকুন। কারণ না জেনে ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে কথা বলা জঘন্য অপরাধ। ইসলামী শরীয়াতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا (36)

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আলোকপাত করো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও আত্মা প্রত্যেকটি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা ইসরা বা বনী ইসরাইল ১৭:৩৬] অন্য আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "(হে মুহাম্মদ) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এবং হারাম ঘোষণা করেছেন তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করাকে; যার পক্ষে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ

করেননি এবং তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন- 'না জেনে তাঁর নামে মিথ্যা বলাকে।" [সূরা আরাফ ৭:৩৩]।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ছাড়া ইসলাম নিয়ে কথা বলা মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যা বলা; যা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভূক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে ইলম দেয়ার পর সরাসরি ইলম উঠিয়ে নেবেন না, কিন্তু তিনি আলেমদেরকে তাদের ইলম সহ উঠিয়ে নেবেন; এরপর শুধু অজ্ঞ লোকেরা থাকবে, তাদের কাছে শরয়ী বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাওয়া হবে, তারা তাদের মন খোদ মত সিদ্ধান্ত দিবে। এভাবে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। [বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭৭, কুপ্রবৃত্তির তিরস্কার শীর্ষক অধ্যায়] আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

সহায়ক গ্রন্থসমূহের তালিকা

১। পবিত্র কুরআন মজীদ – তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

২। হাদীস সংকলনের ইতিহাস - মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী।

৩। হাদীসের পরিচয় – জিলহজ্জ্ব আলী, সুহৃদ প্রকাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৪। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি – সানাউল্লাহ নজীর আহমেদ, ইসলাম হাউজ।

৫। সনদ সহীহ হলেই কি হাদীস সহীহ হয়ে যায় – আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক।

৬। সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদসী – আব্দুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী।

৭। আল ইত্তেহাফাতুস্ সুন্নিয়া ফীল হাদীসিল কুদসিয়া - আল্লামা আব্দুর রউফ আল মানাভী

৮। শরহু ইলালিত তিরমিযী ৮৪ পৃঃ, জামে তিরমিযী মুখবন্ধ ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ, অনুবাদ- আবদুন নূর সালাফী

৯। শরহু ইলালিত তিরমিযী ৮৪ পৃঃ, জামে তিরমিযী মুখবন্ধ ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ, অনুবাদ- আবদুন নূর সালাফী

১০। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি - শায়খ ওমর ইব্‌ন মুহাম্মদ বাইকুনি রাহিমাহুল্লাহ্‌ (মূল আরবী)।

১১। ডঃ খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর - কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা।

১২। হাদীসের নামে জালিয়াতি - ডঃ আব্দুল্লাহ খন্দকার জাহাঙ্গীর, আস্‌ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া।

১৩। হাদীসের সনদ : মৌখিক বর্ননা বনাম পান্ডুলিপি নির্ভরতা - ডঃ খন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্স জার্নাল ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, জুন ২০০৬ ইং প্রকাশিত।

১৪। সহীহুল বুখারী – তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বংশাল, ঢাকা।

১৫। সহীহ মুসলিম – আহলে হাদীস লাইব্রেরী, বংশাল, ঢাকা।

১৬। হাফিয সাখাবী (রহঃ) - "আল-কাওলিল বাদী ফী ফাযলীস সালাতে আলাল হাবীবিশ শাফী" (হিন্দি ছাপা)

১৭। মূল - শাইখ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী (রহঃ) অনুবাদ - আবূ শিফা মুহাম্মদ আকমাল হুসাইন

১৮। যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি – মুযাফফর বিন মুহসিন, আছ ছিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী।

১৯। ডঃ মাহমুদ তাহহান - তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস (মূল আরবী)।

২০। "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" - কাযী ইয়াদ ইব্ন মুসা ইয়াহসুবি (মৃ.৫৪৪হি.)।

২১। "نُخْبَة الفِكَرِ في مصطلحِ أهلِ الأثر" - ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্

২২। "الْمُحَدِّث الفاصل بين الراوي والواعي" – লেখক - কাযী আবু মুহাম্মদ হাসান ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন খাল্লাদ রামাহুরমুযি (মৃ.৩৬০হি.)

২৩। হাদীসের প্রামাণিকতা – ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব, হাদীস ফাউন্ডেশান।

২৪। আরও অন্যান্য যে সকল আরবী গ্রন্থ, হাদীস ও বাংলা গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি তা ফুটনোটে উল্লেখ করেছি।